

ইসলামের ইতিহাস

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল
নবম-দশম শ্রেণির ইসলামের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকজনপে নির্ধারিত

ইসলামের ইতিহাস

দাখিল

[নবম-দশম শ্রেণির জন্য]

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

মোহাম্মদ আনোয়ার মাহমুদ

ও

ইশরাত জাহান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

প্রকাশকঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যগুলির বোর্ড,
৬৯-৭০, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০৯

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম এন্ড টেকস্ট বুক উইঁ কর্তৃক আশির দশকের শেষভাগে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন ও প্রকাশ করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল। জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনযুথী, আদর্শ ভিত্তিক এবং যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার দাখিল স্তরের জন্য যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করে পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দাখিল স্তরের জন্য নতুন শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে বিষয় বিশেষজ্ঞ লেখক কর্তৃক রচিত/সম্পাদিত নবম-দশম শ্রেণির ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সরকারের আর্থিক সহায়তায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তত্ত্ববধানে মুদ্রণ করে বিনামূল্যে বিতরণ করা হলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১১ সাল হতে সূজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির মাধ্যমে দাখিল পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে অনুশীলনীতে গতানুগতিক প্রশ্নমালার পরিবর্তে সূজনশীল প্রশ্নের নমুনা প্রশ্নমালা সংযোজন করা হয়েছে। নমুনা সূজনশীল প্রশ্নমালার আলোকে পঠন/পাঠন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আশা করা যায় নতুন আঙ্গিকে রচিত/সম্পাদিত পাঠ্যপুস্তক সময় উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তকটিতে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট লেখক/সম্পাদক ও পরিমার্জনকারীর চেষ্টা ও সর্তকতা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের নিকট সময়মতো পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তীতে পাঠ্যপুস্তকটি আরও মানসম্মত ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। এক্ষেত্রে গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

যাঁরা বইটি রচনা/সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, প্রকাশনায় মেধা ও অঙ্গীকৃত শ্রমদান করেছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত হল তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র		
অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	প্রাক-ইসলামি পটভূমি ও রাসুল(স.) এর মক্কা জীবন	
	(ক) প্রাক-ইসলামি পটভূমি ও আইয়াম-ই-জাহিলিয়া	
প্রথম পরিচ্ছেদ	প্রাক-ইসলামি আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমা	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ভূ-প্রকৃতি অনুসারে আরবের অধিবাসী	৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	প্রাচীন সভ্যতাসমূহ	৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	জাহিলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	১০
	(খ) হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মক্কা জীবন	
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	আবির্ভাব ও পরিচয়	১৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	নবুয়ত লাভ	২৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ	প্রকাশ্য ইসলাম প্রচার	২৬
অষ্টম পরিচ্ছেদ	মদিনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রাচার	৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়	হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মদিনা জীবন	
প্রথম পরিচ্ছেদ	মদিনার অধিবাসী ও সনদ	৪২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	মুদ্র ও শান্তি নীতি	৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ইহুদীদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সম্পর্ক	৫৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	হযরত মুহাম্মদ (স.) এর কৃতিত্ব ও সংস্কারসমূহ	৬৭
তৃতীয় অধ্যায়	শুলাফায়ে রাশেদিন	
প্রথম পরিচ্ছেদ	খলিফার পরিচয়, যোগ্যতা ও নির্বাচন	৭৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	হযরত আবু বকর সিন্দিক (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)	৮৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	হযরত উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)	১০০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)	১২৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ)	১৪২
চতুর্থ অধ্যায়	ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন	
প্রথম পরিচ্ছেদ	ভারতীয় উপমহাদেশের পরিচিতি ও সামগ্রিক অবস্থা	১৬১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	আরবদের সিন্ধু ও মুলতান অভিযান	১৬২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	সুলতান মাহমুদ	১৬৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	মুহম্মদ ঘুরী	১৭০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	কুতুবউদ্দীন আইবেক	১৭৪
পঞ্চম অধ্যায়	বাংলাদেশে ইসলাম	১৭৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

প্রাক-ইসলামি পটভূমি ও রাসুল (স.) এর মক্কা জীবন

(ক) প্রাক-ইসলামি পটভূমি ও আইয়াম-ই-জাহিলিয়া

প্রথম পরিচেদ

প্রাক-ইসলামি আরব উপদ্বিপের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমা

পরিত্র আরব ভূ-খণ্ড হচ্ছে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। ভৌগোলিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আরবভূমি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মিলন স্থলে অবস্থিত। এদেশের মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। তাই পরিত্র কুরআনে আরবের মক্কা নগরীকে “উম্মুল কুরা” (أُمُّ الْكُورَّا) বা আদিনগরী বলা হয়েছে।

ধারণা করা হয় যে, প্রাচীনকালে হিজাজ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তায়ামা প্রদেশের কাছে ‘আরাবা’ (الْعَرَبَةُ) নামক স্থান ছিল। সেই ‘আরাবা’ থেকেই কালক্রমে ‘আরব’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ‘ইয়ারাব’ (يَرَابُّ) থেকে আরব শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ইয়ারাব ছিল কাহতানের পুত্র সজ্জান। আর কাহতান ছিল দক্ষিণ আরবিয়দের পূর্ব পুরুষ। অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, হিজু ভাষায় প্রচলিত ‘আবহার’ (أَلْأَبْهَرُ) শব্দটি আরব শব্দের সমার্থক। ‘আরব’ এবং ‘আবহার’ দুটি শব্দের সমার্থক শব্দ হল ‘মরক্বুমি’। অপরদিকে পাচাত্য অঞ্চলের লোকগণ আরবিয়দের ‘সারাসিন’ হিসেবে অবহিত করত। সাহারা শব্দ থেকে উৎপন্ন ‘সারাসিন’ শব্দের অর্থ হলো ‘মরক্বুমি’। আবার ‘আরব’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বাণিজ্য। আরববাসীরা বাণী হ্রস্বায় পৃথিবীতে তাদের দেশের একপ নামকরণ হয়েছিল। আরবের অধিকাংশ স্থান মরক্বুম ছিল বলেও একপ নামকরণ করা হয়ে থাকতে পারে।

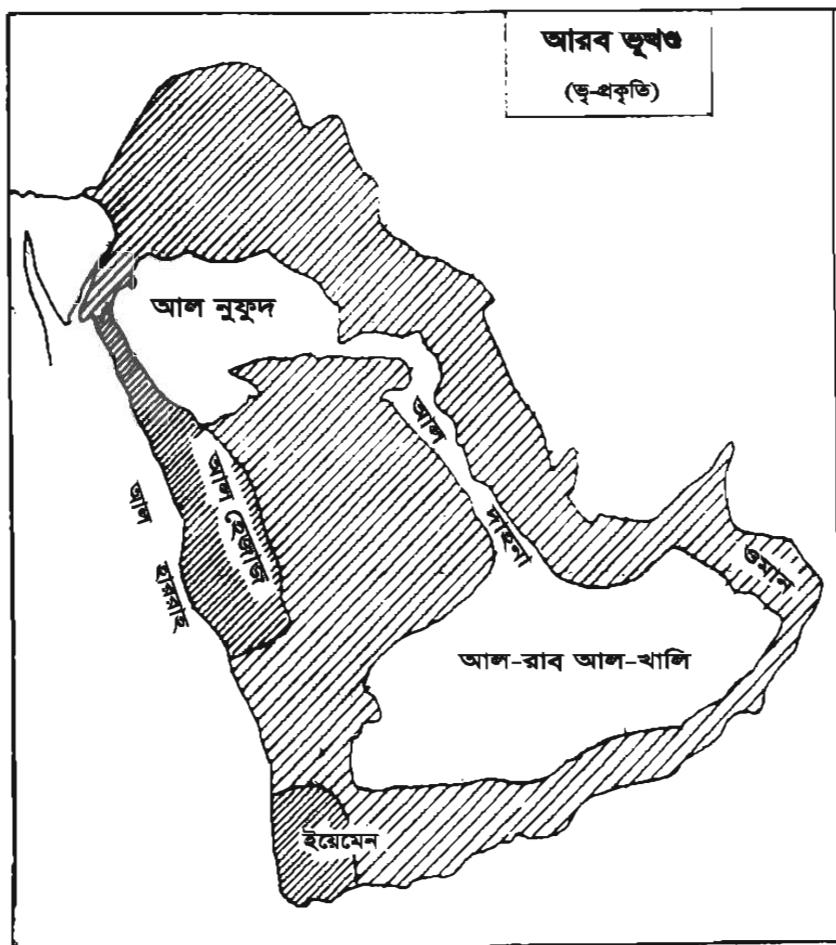
প্রাচীন আরবের ভূ-প্রকৃতি

পরিত্র আরব ভূ-খণ্ড পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বিপ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এ ভূ-খণ্ডের তিনদিকে সমুদ্র ও একদিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত। তাই এ ভূ-খণ্ডকে ‘জাজিরাতুল আরব’ (جَزِيرَةُ الْعَرَبِ) বা আরব উপদ্বিপ বলা হয়ে থাকে। এর পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে সোহিত সাগর, উত্তরে সিরিয়া মরক্বুমি এবং দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগর অবস্থিত।

তবে ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে আরবভূমি সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার মরক্ব অঞ্চলের অংশ ছিল। ধারণা করা হয়, আরবভূমি সাহারা ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সোহিত সাগরের তীরব্যাপী একটানা পর্বতমালাকে আরব অঞ্চলের মেরদন্ত বলা হয়ে থাকে। লক্ষণীয় যে, সমগ্র আরব ভূ-খণ্ড পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে অপেক্ষাকৃত ঢালু। পূর্বদিকে ওমান পর্বতমালা, দক্ষিণ অঞ্চল নিচু এবং কিয়দাংশ ঢালু, উত্তরের নজদ একটি উচ্চ মালভূমি। পাহাড় ও মালভূমি ছাড়া বাকি অংশ মরক্ব অঞ্চল এবং অনুর্বর ভূমি।

আরবের উত্তরাংশে রয়েছে নুফুদ (نُفُود) বা সাদা ও লালচে বালিযুক্ত অঞ্চল। কোথাও বা উচ্চ ঢিবি আবার কোথাও বা বাণিয়াড়িতে পরিণত হয়ে উভয় আরবের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আবৃত করে রয়েছে। এর প্রাচীন নাম হল আল-বাদিয়া (البادية)। উভয়ে নুফুদ থেকে দক্ষিণে আল-রাব-আল-খালি পর্যন্ত বিস্তৃত লাল বালিপূর্ণ আদ-দাহনা (الدَّاهِنَةُ) বা লালভূমি দক্ষিণ-পূর্বদিকে এক বিরাট বক্ররেখা বরাবর ৬০০ মাইলের বেশি বিস্তীর্ণ। পুরানো মানচিত্রে আদ-দাহনা সাধারণত ‘আল-রাব-আল-খালি’ (ফাঁকা অঞ্চল) নামে অভিহিত।

আব্দুল্লাহ আরব ভূ-খণ্ডের আয়তন ১০,২৭,০০০ বর্গমাইল (২৬,৫৮,৭৮১ বর্গ কিলোমিটার)। আয়তনে এটি ইউরোপের এক-চতুর্থাংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ। প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের এ স্রোতধারা উপরীপকে প্লাবিত করে কিছুটা তৃণময় ও মানুষের বাসোপযোগী করে তোলে।

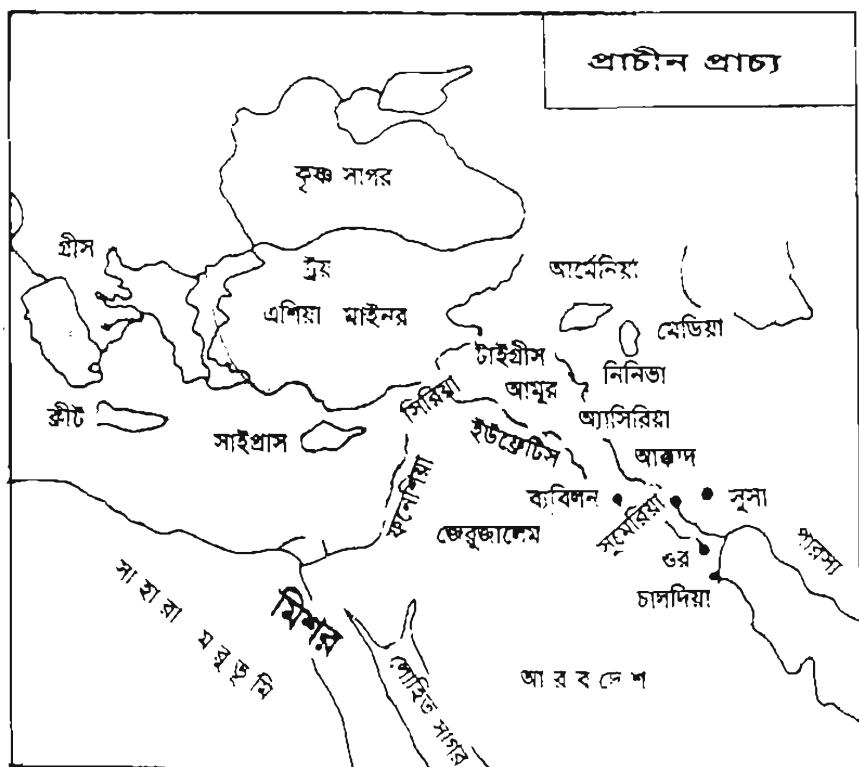


চিত্র ৪: প্রাচীন আরবদেশ

প্রাক-ইসলামি পটভূমি

তোগোলিক পরিচিতি : তোগোলিক পরিচিতির দৃষ্টিকোণ থেকে আরবকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যিক ভুগোলবিদের মতে এ ভাগগুলো হল- মুক্ত অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল ও উর্বর অঞ্চল। মুক্ত অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত আরবের উর্বর তৃণ অঞ্চল হিজাজ, নজদ, ইয়ামেন, হাজরামাউত এবং ওমান এ ক্ষেত্রটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইসলামের প্রাগকেন্দ্র হিজাজ আরবদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং মক্কা, মদিনা ও তামের এর তিনটি প্রধান শহর। দক্ষিণ আরবে অবস্থিত হাজরামাউত, ওমান ও ইয়ামেন অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের জন্য খুবই বিখ্যাত। অপরাদিকে মুক্ত অঞ্চল ছিল খরতাপে বিদক্ষ ও গুলামুণ্ড, বাসের অনুগ্যোগী উৎপন্ন এলাকা। কখনও কখনও মুক্ত অঞ্চলে বিষাক্ত লু-হাওয়া প্রবাহিত হয়।

আবহাওয়ায় আরব উপর্যুক্তি অত্যন্ত শূক্র ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রবেষ্টিত হলেও সেই জলরাশি এখানকার ভূমি সিক্ত করতে পারে না। কারণ, আরবভূমি অধিকাংশই আফ্রিকা ও এশিয়ার বৃষ্টিহীন বিপুল প্রান্তর। তাই তার আবহাওয়ায় অনাবৃষ্টির ক্ষক্ষতার প্রাধান্যই বেশি। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে স্বাভাবিক কারণেই জলবাহী মেঘ ওঠে, কিন্তু মুক্ত বালুবড় (সাইয়ুয়) তা বাতাসেই গুরে নেয়। ফলে সেই মেঘ যখন আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছায় তখন তাতে জলীয় বাস্প আর অবশিষ্ট থাকে না। ওমান, হাজরামাউত, হিজাজ প্রভৃতি উপকূলবর্তী অঞ্চল ও পানি বিধোত উপত্যকায় সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। চামের উপর্যোগী বৃষ্টিপাত হয় ইয়ামেন ও আসীর প্রদেশে। ইয়ামেনের আধুনিক রাজধানী সালা সমুদ্র হতে ৭০০ ফুট (২১৩.৩৬ মিটার) উচ্চে অবস্থিত এবং এটি আরবের অন্যতম সুন্দর ও সাম্মথ্যকর স্থান।



চিত্র ৪: প্রাচীন আচ্য

আরব উপনীপের বৈশিষ্ট্যঃ আরব উপনীপ একটি বিশাল ও বিস্তৃত মালভূমি। এ উপনীপের পশ্চিম প্রান্ত অন্যান্য অংশ বা অঞ্চল হতে অনেক উচু। এদেশের ভূখণ্ড পশ্চিম হতে পূর্বদিকে ক্রমান্বয়ে ঢালু ভূমি দ্বারা গঠিত। মধ্যআরবে কিছু পর্বতশৃঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়। এগুলো সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৪০০০ থেকে ৬০০০ ফুট উচু (যথাক্রমে ১২১৮ ও ১৮১৯ মিটার)। এ আরব ভূখণ্ডের জলবায়ু সর্বত্র উষ্ণ। এদেশে নাব্য নয় এমন সুন্দর কিছু সংখ্যক নদ-নদী রয়েছে। ভূমি অনুর্বর। কেবলমাত্র মরুদ্যান এবং উপকূলভাগ অগোক্ষাকৃত উর্বর।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আরব উপনীপ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মিলনকেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান থেকেও যেন সমগ্র বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন। আরব ভূখণ্ডের এক-ত্রৈয়াংশ মরুময়। উত্তর ভাগে ‘নুফুদ’ মরুভূমি এবং নুফুদ হতে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত ৬০০ মাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে আরবের বৃহত্তম মরুভূমি ‘আদ-দাহনা’ ('আল-রাব-আল-খালি')। এতদ্বারা এদেশের পশ্চিম দিকে রয়েছে আল-হারাহ নামক আর একটি সুন্দর মরুভূমি।

কতিপয় পর্বতমালা, কিছুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর নদ-নদী, স্থলসংখ্যক মরুদ্যান এবং এক বিশাল ও বিস্তৃত মরুভূমি বুকে নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে বিদ্যমান রয়েছে প্রাচীনকালের আরব উপনীপ বা আরবদেশটি। এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি গুরুত্বপূর্ণও বটে।

আরবের ফসলাদি ও প্রাকৃতিক সম্পদঃ খেজুর আরবদের প্রধান খাদ্য। খেজুর ছাড়া তাদের জীবন ধারণ করা ছিল কঠিকর। খেজুর গাছ আরব দেশে ‘বৃক্ষরাশি’ হিসেবে খ্যাত। স্থানীয় লোকজনের বহুবিধ প্রয়োজন ছাড়াও খেজুরের বীজ চূর্ণ করে উটের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খেজুর গাছের মিষ্ঠি রস আরব বেদুইনদের অন্যতম পানীয়। প্রত্যেক বেদুইনের স্পন্দ হল ‘দুটি কৃষ্ণ দ্রব্য’ (আল-আসওয়াদান) অর্থাৎ পানি ও খেজুর। হিজাজে প্রচুর পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হয়। ইয়ামেনের কয়েকটি মরুদ্যানে উৎপন্ন হয় গম। ঘোড়ার খাদ্য হিসেবে চাষ হয় বার্লি কয়েকটি অঞ্চলে ভূট্টা এবং ওমান ও আল-হাসায় ধান উৎপন্ন হয়। আরবিয় মরুদ্যানে উৎপন্ন অন্যান্য ফলের মধ্যে বেদানা, বাদাম, কমলালেবু, কাগজি লেবু, আখ, তরমুজ ও কলা উল্লেখযোগ্য।

আরবের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ দ্রব্যের সংস্কার পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে আরবের ইয়ামেন অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় আরবের কয়েকটি স্থানে খাঁটি সোনা পাওয়া যেত। আরবের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে পেট্রোল, স্বর্ণ, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি।

আরবের প্রাণীঃ আরবের জীবকুলের মধ্যে চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়ে, শিয়াল ও গিরগিটি উল্লেখযোগ্য। শিকারী পাখির মধ্যে ইগল, বাজপাখি ও পেঁচা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতি পরিচিত পাখির মধ্যে ঝুঁটিওয়ালা পাখি(হৃদহৃদ), বুলবুল, পায়রা ও আরবি সাহিত্যে আল-কাতা নামে পরিচিত এক ধরনের তিতির পাখি দেখতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, ঘোড়া, গাধা, সাধারণ কুকুর, শিকারী কুকুর, বিড়াল, ভেড়া, ছাগল প্রধান। দৈহিক সৌন্দর্য, কঠ সহিষ্ণুতা, বৃদ্ধি এবং মনিবের প্রতি মর্মস্পন্দিত আনুগত্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ও উত্তমভাবে প্রতিপালিত আরবিয় ঘোড়া এক অন্য দ্রষ্টান্ত। উটের সাহায্য ছাড়া মরু অঞ্চল কখনই মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারত না। উট ছিল যায়াবরদের ধারীসম। উন্নত মরুভূমিতে উট ছিল আরবদের একমাত্র যাতায়াতের বাহন। তাই উটকে ‘মরুভূমির জাহাজ’ বলা হয়। পবিত্র কুরআন শরীফে আরবদের জন্য এক বিশেষ অবদান হিসেবে উটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরবদের মধ্যে উটের ব্যবহার ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। যার যতো বেশি উট ছিল সে ছিল ততো বেশি ধনী। উট বেদুইনদের নিত্য সহচর ও পথের বন্ধ। উটের মাংস তাদের খাদ্য এবং দুষ্প্রিয় ছিল পুষ্টিকর পানীয়। উটের চামড়া দিয়ে তারা তাবু এবং পশম দিয়ে পোশাক তৈরী করত।

আরব জাতি ১ আরব উপনীপের আদিম অধিবাসীদের সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করা এখনও সম্ভব হয় নি। তবে স্বকায়তা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বৃষ্টি আরব জাতি প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত: যথা- বায়দা (الْبَيْدَاءُ) ও বাকিয়া (الْبَاقِيَةُ)। কুরআন শরীফে বর্ণিত প্রখ্যাত প্রাচীন বৎশ 'আদ', 'সামুদ', 'তামস' ও 'জাদীস' প্রভৃতি প্রাচীন আরব গোত্রগুলো প্রথম শ্রেণিভুক্ত ছিল। পরবর্তী জাতিগুলোর মধ্যে অভ্যুত্থানে প্রাচীন বায়দা গোত্রগুলো বিলুপ্ত হয়।

অধুনালুপ্ত বায়দা গোত্রের উত্তরাধিকারী বাকিয়া জাতি বর্তমান আরব জুখানের প্রধান অধিবাসী। এ বাকিয়া শ্রেণিভুক্ত আরবদের দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। "প্রকৃত আরব বা আরিবা" (عَارِبَةُ) ও 'আরবিকৃত আরব বা' (مُسْتَعْرِبَةُ)। সর্বাপেক্ষা আদিম ও নিঃশৈল রক্তের অধিকারী আরিবা গোত্র কাহতানের বংশোচ্চুত। দক্ষিণ আরবের ইয়ামেন অঞ্চলের অধিবাসী ছিল বলে তাঁরা ইয়ামেনীয় বা হিমারিয়া বলে পরিচিত ছিল। কাহতানের বংশের অভ্যুত্থান হতেই আরব জাতির প্রকৃত ইতিহাসের সূত্রগত হয়। উল্লেখ্য যে, রক্তের পৰিবর্তার জন্য আরিবা অধুনা ইয়ামেনীয়রা মুস্তারিবা গোত্রের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী ছিল এবং মদিনায় হিজরত করার পর প্রকৃতপক্ষে মাসুলুমাহ (স.) তাঁদের নিকট হতে সহযোগিতা লাভ করেন। ইসমাইল (আ.)-এর একজন বৎশধর আদনান মুস্তারিবা গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। হিজাজ, নজদ, পেত্রা, পালমিরা অঞ্চলে বসবাসকারী মুস্তারিবা গোত্রের নিয়ারী হতে হবরত মুহাম্মদ (স.) এর কুরাইশ বংশের উত্তর হয়। মুস্তারিবাগণ উত্তর আরবের হিজাজের অধিবাসী হিসেবে হিজাজি বা মুদারি নামেই সমধিক পরিচিত লাভ করেন।

উত্তর আরবগোত্র সাধারণতাবে নিয়ারি অথবা মুদারি নামে অভিহিত এবং সাধারণত তারা যায়াবরের জীবন যাপন করত। অগ্রদিকে দক্ষিণ আরব অথবা ইয়ামেনিয়া ছিল নাগরিক জীবনে অভ্যন্ত। কারণ, তারা সাবিয়ি ও হিমায়ারি রাজ্যের অধিবাসী ছিল। উত্তর আরবের লোকেরা কুরআন শরীফের ভাষা অর্থাৎ আরবিতে কথা বলত। দক্ষিণ আরবের লোকেরা প্রাচীন সেমেটিক ভাষা, সাবেয়ি ও হিমায়ারি ব্যবহার করত। কৃষ্টির দিক হতে বিচার করলে দক্ষিণ আরবের সভ্যতার উন্নেষ্ট হয় খ্রিস্টের জন্মের ১২শত বছর পূর্বে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত উত্তর আরব ইতিহাসে কোনো বলিষ্ঠ অধ্যায়ের সূচনা করতে পারেনি।

বিত্তীয় পরিচেছন জু-প্রকৃতি অনুসারে আরবের অধিবাসী

জু-প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আরবের অধিবাসীদের দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়- শহরের স্থায়ী বাসিন্দা ও মরুবাসী যায়াবর, যারা 'বেদুইন' নামে পরিচিত। এ দুশ্রেণির আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রার প্রণালী, ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। অনেক মরুবাসী আরব বেদুইন জীবন ত্যাগ করে শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। অগ্রদিকে দারিদ্র্যের কষাগ্রাত সহ্য করতে না পেরে কিছু সংখ্যক স্থায়ী বাসিন্দা বাধ্য হয়ে যায়াবর বৃত্তি গ্রহণ করে।

(ক) শহরবাসী : আরবের উর্বর তৃণ-অঞ্চলগুলো স্থায়ীভাবে বসবাসের উপযোগী বলে অস্থ্য জনপদ গড়ে উঠেছে। কৃবিকাৰ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা। বহির্বিশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার ফলে এরা ছিল মরুবাসী বেদুইনদের তুলনায় অধিকতর স্বচিসম্পন্ন ও মার্জিত।

(খ) মুক্তবাসী যায়াবর ৪ আরব অধিবাসীদের অধিকাংশই স্বাধীনচেতো, বেগরোয়া ও দুর্দর্শ মুক্তবাসী বেদুইন। সমাজের ধরাবাঁধা শৃঙ্খলে আবজ্ঞ হয়ে স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস করার পরিবর্তে বেদুইনগণ জীবনধারণের জন্য মুক্তভূমির সর্বত্র শুরু বেড়াত। তারা তৃপ্তির সংজ্ঞানে এক পশুচারণ হতে অন্য পশুচারণে গমন করত। তাদের গৃহ হচ্ছে তাবু, আহার্য উটের মাহস, পানীয় উট ও ছাগলের দুষ্ট, অধান জীবিকা লুটতরাজ্জ। শহরবাসী ও বেদুইনের মধ্যে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ ছিল নিভ্যনেমিতিক ঘটনা।

বেদুইন জীবন : মুক্তভূমির নিরবিচ্ছিন্ন শুক্ষ্মতা ও একদেয়েয়ি দুরস্ত আরব বেদুইনদের শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে অপরিসীম প্রভাব বিত্তার করে। অগতি ও পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে তারা পূর্ব পুরুষদের গ্রাতানীতি ও জীবনযাত্রার প্রণালী মনেপ্রাণে অনুসরণ করে। ইতিহাসের গতিধারা, রাজ্যের উর্ধ্বান-পতন যায়াবর বেদুইনদের সাবলীল ও স্বাধীন জীবন পদ্ধতিকে ব্যাহত করতে পারেন। পাদুকা ব্যবহারে তারা অভ্যন্তর নয়। দুরস্ত যায়াবর বেদুইনদের নিকট মুক্তভূমিই প্রথান বাসস্থান। বেদুইন সমাজের মূলভিত্তি গোত্রপথ। গোত্রের প্রধানকে ‘শাইখ’ (شیخ) বলা হত। গোত্রপতি বয়স, জ্ঞান-বৃদ্ধি, সাহস ও বীরত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। পারিবারিক প্রধানদের নিয়ে গঠিত কাউন্সিলের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন। সামরিক, বিচার সংকোষ ও জনকল্যাণকর ব্যাপারে শেখ এর বিশেষ কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তারু এবং গৃহস্থালির দ্রব্যাদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও পশুচারণ, তৃণভূমিতে পানি এবং যৎসামান্য ভূমি গোত্রের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হত। একই গোত্রের মধ্যে হত্যাকান সংঘটিত হলে কেউ অপরাধীকে সাহায্য করত না; কিন্তু অপর কোনো গোত্র যদি হত্যা করত তা হলে সমস্ত গোত্র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সংঘর্ষে শিষ্ট হত।

বেদুইনদের বৈশিষ্ট্য : আরব বেদুইনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, একদিকে তারা লুটতরাজ, জিষাংসা, পরদ্রব্য অপহরণ, যুদ্ধ-বিহারে শিষ্ট ছিল, অপরদিকে মহাদ্বের সুকুমার পুণ্যবলি ও তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যায়াবর বেদুইনদের স্বজনশ্রীতি ও গণতন্ত্রীতি সর্বজনবিদিত। গোত্রকেন্দ্রিক মুক্তবাসী বেদুইনদের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কওম-চেতনা (আসাবিয়াহ)। গোত্রশ্রীতি ও রক্ত সম্পর্কের উপর গঠিত এ কওম-চেতনা পরবর্তীকালে আরব জাতিগঠন এবং ইসলামের বিস্তৃতি সাধনে সহায়ক ছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গোত্র-মানসিকতা, অতিথিপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, পৌরুষত্ব প্রভৃতি তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রক্তের পবিত্রতা, পূর্বপুরুষদের আভিজ্ঞান্ত ও বীরত্ব, প্রাচীন আরবি কবিতা ও বাণিজ্য, আরবি অংশ ও তরবারি তাদের গর্বের বস্তু ছিল। আরব বেদুইনদের অতিথিপরায়ণতা সর্বজনবীকৃত। কারণ, অতিথি শত্রুকেও তাঁরা আদর আপ্যায়ন করতে দ্বিধা করেন।

অধিবাসীদের উপর ভৌগোলিক প্রভাব :

আরব উপস্থিতির বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ ভূখণ্ডের বৃষ্টিগাত্তহীন শুক্র ও উক্ত আবহাওয়া, বালুকায় ধূ-ধূ মুক্তভূমি ধৃতি প্রতিকূল ও ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে মুক্তবাসী বেদুইনগণ একদিকে ধ্যেমন রূপক, দৃঢ়সাহসী ও সৈনিক জাতিতে পরিষিত হয়েছে: অপরদিকে তারা ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হয়েছে। তাদের চরিত্রে কর্তৃতোতা, বৰ্ষবর্তা, নৃশংসতা এবং সাহসিকতার সমূহ ঘটেছে। মুক্তভূমির প্রচন্ড সাইয়াম বাড়, প্রথর উভাগ, রৌদ্রদক্ষ বালুকা, উন্মুক্ত শু হাওয়া, কল্প পর্বতমালা, কটকাকীর্ণ বৃক্ষাদি তাদেরকে সঞ্চারী করে তুলেছে। পশুচারণ ও পশুপালন তাদের প্রধান পেশা হলেও ধাদ্যের অভাব হলে তারা পশুবাহী কাফেলায় হামলা চালাত কিংবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় লুটতরাজ করত।

প্রাক-ইসলামি পটভূমি

আরবদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহ লেগেই থাকত। লুঠন তৎপরতা, রাহাজানি, খুন-খারাবি তাদের মধ্যে দুর্বীয় ছিল না। এ যুদ্ধাধৃতৈ সমাজব্যবস্থায় পুত্র সন্তানের কদর ছিল বেশী। কারণ গোত্রভিত্তিক কাঠামোতে পুরুষ সভ্যের সংখ্যাধিক্য গোত্রের শ্রেষ্ঠত্বেই প্রতিপন্থ করত। এ সময় কন্যা সন্তান ছিল সমাজের বোঝা। এ বোঝা নিরসন কল্পে তারা নারী ও কন্যা সন্তানের উপর বিকল্প হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধবিগ্রহে পরাজয়ের অর্থ ছিল নারীদের দাসত্ব। কন্যা সন্তান বৃদ্ধি মানে অনাহার বা অর্ধাহার, এ ছিল অধিকাংশ আরবের ধারণা।

‘মরকুমিতে রাত্রি ভীতিকর ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানবের আনাগোনা’— এ সাধারণ বিশ্বাস মরকুমির বিপদ হতে পথিককে রক্ষা করার জন্য আরবদের মধ্যে অতিথিপরায়ণতা বিকশিত হয়েছিল। মরকুমি অনুর্বর ও পর্বতাঞ্চলের আরব সমাজ গোত্রভিত্তিক ছিল। গোত্র-নিরাপত্তা ও বহিরাক্রমণের ভয় তাদেরকে গোত্রপ্রিয় করে তুলেছিল। এ গোত্রপ্রীতি তাদের মধ্যে জন্ম দেয় মনুষ্যত্ব, আত্মসংযম, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের। শেখের নিকট সকল নাগরিকের অধিকার সমান। এরপ পরিস্থিতিতে উন্নততর ধর্মে-কর্মে তাদের শিথিলতা পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। আরব ভূ-খণ্ডের অনুদার পরিবেশ, খাদ্য ও পানীয় জলের অভাব, নির্দিষ্ট চলাচলের পথ না থাকায় বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে আরববাসীরা সব সময় নিরাপদ থেকেছে।

ভৌগোলিক প্রভাবের কারণে শহরবাসী আরব ও মরকুমাসী বেদুইনদের মধ্যে আত্মসচেতনাবোধ ও কাব্যিক চেতনার উমেদ ঘটে। আরববাসীরা ছিল কাব্যের প্রতি অধিক মাত্রায় অনুরক্ত। গীতিকাব্য রচনা ও সাহিত্যচাচায় আরবদের অপূর্ব সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরব কবিগণ ভৌগোলিক পরিবেশে যে কাব্য রচনা করেন তা সংঘাত, অদম্য সাহসিকতা, বীরত্ব, গোত্রপ্রীতি ও প্রেম সম্পর্কিত।

মূলত আরব ভূ-খণ্ডের ভূ-প্রকৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং অধিবাসীদের চরিত্রে এমন বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তারা ইসলাম গ্রহণের অতি অল্পকালের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এমন একটি নতুন জাতি গড়ে তোলে, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

মানব সভ্যতার ইতিহাস উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। সভ্যতার ইতিহাস কখন থেকে শুরু হয়েছিল একথা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও সভ্যতার পতি স্থির থাকেন। ঐতিহাসিক আরনন্দ টয়েনবি পৃথিবীর ইতিহাসকে বিভিন্ন কৃষ্ণির ক্রমবিকাশের ফল বলে আখ্যায়িত করেছেন। একথা সত্য যে, আধুনিক সভ্যতাসহ পূর্ববর্তী প্রতিটি সভ্যতা তার পূর্বের সভ্যতার কাছে ঝঁঁগী। পূর্ববর্তী সভ্যতার আর্থ-সামাজিক প্রভাব পরবর্তী প্রতিটি সভ্যতার উপর ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। সভ্যতার উন্নয়নের মূল প্রধান কারণগুলো ছিল ক্রমবর্ধমান মানব সমাজের সামাজিকীকরণ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের

সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ। যেমনঃ কৃষিকার্য, সেচ ব্যবস্থা, যানবাহনের উন্নতি, রাষ্ট্রীয় বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রবর্তন, শিল্প, স্থাপত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা প্রভৃতি। ইউফ্রেটিস, টাইগ্রীস, নীল ও সিঙ্গুলনদের অববাহিকায় পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার নির্দর্শনগুলো বিদ্যমান রয়েছে। বলা বাহুল্য, মিসরীয় সভ্যতা ও মেসোপটেমীয় সভ্যতা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্ব প্রাচীন বলে স্বীকৃত। সুমেরীয়, কালদীয়, ব্যাবিলনীয়, আকাদীয় ও অ্যাসিরীয় কৃষির সমষ্টিয়েই মেসোপটেমীয় সভ্যতার' উন্নত হয়েছিল।

মিসরীয় সভ্যতা

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা পৃথিবীর ইতিহাসের সুসমৃদ্ধ সভ্যতা। এ সভ্যতার উন্নেশ হয় মিসরের নীলনদের অববাহিকায়। সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়গণ যে অবদান রেখেছেন সম্ভবত অপর কোনো জাতি এরূপ অবদান রাখতে সক্ষম হয় নি। প্রাচীন মিসরই ছিল বিশ্বের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রদূত।

মিসরের ভৌগোলিক অবস্থান : মিসরকে নীলনদের দান বলা হয়। কারণ মরুভূমিতে পরিণত হওয়া মিসর নীলনদের প্রভাবেই জুন হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। এ সময়ের মধ্যে নীলনদের উভয় তীর প্লাবিত হয়। প্লাবন শেষে পলিমাটিতে উভয় তীর দৈর্ঘ্যে ৬০০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল পর্যন্ত ভরে যায়। এরূপ সঞ্চিত পলি মাটির গুণে উভয় ভূ-ভাগ অত্যন্ত উর্বর হয়। ফলে শস্য, তুলা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় মিসর একটি সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এ তিনটি মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এবং ভূ-মধ্যসাগরের উপকূলে বিদ্যমান হওয়ার ফলে মিসরের ভৌগোলিক অবস্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মেসোপটেমীয় সভ্যতা

মিসরীয় সভ্যতায় সমসাময়িককালে ইরাক অঞ্চলের টাইগ্রীস (দেজলা) এবং ইউফ্রেটিস (ফেরাত) নদীর মধ্যবর্তী ভূমিতে সময়ের ব্যবধানে বেশ কয়েকটি নগর সভ্যতার উন্নেশ ঘটে। একত্রে এ সভ্যতাসমূহকে “মেসোপটেমীয় সভ্যতা” বলে। মেসোপটেমীয় সভ্যতার মধ্যে রয়েছে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয়, আকাদীয় ও কালদীয় সভ্যতা। মিসরীয় সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমীয় সভ্যতার পার্থক্য এই যে, প্রথমটি ছিল নীতি-ধর্মভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি আইনশাস্ত্রভিত্তিক।

ক. সুমেরীয় সভ্যতা :

সুমেরীয় সভ্যতা ছিল মেসোপটেমীয় সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা। এ সভ্যতার ধারক বাহক ছিল অসেমেটিক সুমেরীয়গণ। তাঁদের নামানুসারে তাদের সভ্যতাকে “সুমেরীয় সভ্যতা” বলা হয়। তাঁরা ছিল মূলত টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যস্থিত অববাহিকা অঞ্চলের অধিবাসী। তারা লিখন পদ্ধতি, আইন-কানুন, ধর্মীয় অনুভূতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চৰ্চা প্রথম শুরু করে।

খ. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা :

টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল “মেসোপটেমীয়া” নামে পরিচিত। মেসোপটেমীয়ার দক্ষিণে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উন্নেশ ঘটেছিল। সুমেরীয় রাজা তৃষ্ণীর মৃত্যুর পর সুমেরীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের উন্নত ঘটে। ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অন্দে সেমেটিক জাতির যে শাখাটি টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় গমন করে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করে কালক্রমে তারা অ-সেমেটিক সুমেরীয় জাতির সমষ্টিয়ে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলে।

বিশ্ব সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান : ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ছিল নিঃসন্দেহে উন্নত সভ্যতা। আধুনিক সভ্যতা প্রাচীনকালে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার কাছে বিশেষভাবে খুণী। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এমনকি প্রিকগণও সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনীয়দের কাছে খুণী। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের অবদান পরবর্তী শতাব্দীগুলোর অনুসন্ধিৎসু পদ্ধতিদের গবেষণা পরিচালনা করার পথ রচনা করে গেছে। তারা নিঃস্ব ও অন্যান্য জাতির পৌরাণিক কাহিনী কিংবা লৌকিক উপাখ্যান সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করে হিন্দু বাইবেলের পটভূমি রচনা করে গেছেন। তারা সমলোচনামূলক ও বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করে অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, দর্শন এবং অভিধান সংকলনের ভিত্তি রচনা করে গেছেন। তাঁরা মহাকাব্য, ধর্মীয় গীতি প্রবাদ ইত্যাদিরও প্রর্বতক ছিলেন। সভ্যতার ক্ষেত্রে তাদের এ সমস্ত কর্মকাণ্ড ক্রমে ক্রমে নিকট প্রাচ্য এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্ব সভ্যতার অংগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

হিন্দু সভ্যতা

প্রাচ্য এবং প্রাচীনের প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহের মধ্যে হিন্দু সভ্যতা একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। হিন্দুগণ সেমেটিক জাতির একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। তারা ছিল যাবাবর শ্রেণির লোক। আরবদেশ থেকে প্রথমে তারা প্যালেস্টাইন গমন করেন এবং তাদের আদিপুরুষ হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর নেতৃত্বে মেসোপটেমীয়ায় বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে তারা ফিনিসীয়, আরামীয় ও হিন্দু- এ তিনি ভাগে বিভক্ত হয়।

পারসিক (সাসানীয়) সভ্যতা

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনের প্রাক্কালে সাসানীয়া ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য মধ্য প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অন্দের পূর্বে আর্যদের যে শাখাটি পারস্য উপসাগরের দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে, তারা পারসিক এবং যে শাখাটি উত্তর-পশ্চিমের পর্বত সংকুল এলাকায় বসতি স্থাপন করে, তাঁরা মেদ নামে পরিচিত ছিল। সন্ত্রাট সাইরাসের অধীনে তারা খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ অন্দে কালদিয়া সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। এশিয়া মাইনরের লিডিয়া অধিকার করে সাইরাস আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেন।

সাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ক্যামবিসাস সিংহাসনে আরোহণের পর খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অন্দে মিসর জয় করেন। ক্যামবিসাসের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে কিছুকাল অরাজকতার পর খ্রিস্টপূর্ব ৫২১ অন্দে ডেরিয়াস (দারায়ুস) সিংহাসনে বসেন। অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন পারসিক সন্ত্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত্রাট। তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে ভারতের সিঙ্গু নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর শাসনামলে সন্ত্রাট আলেকজান্দার পারস্য সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির শীর্ষ চূড়ায় পৌছে। তাঁর উত্তরাধিকারী পরবর্তী সন্ত্রাট জারজেসের শাসনামলে সন্ত্রাট আলেকজান্দার পারস্য সাম্রাজ্য দখল করে নেন।

প্রিক সভ্যতা

ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিয়াটিক, ভূ-মধ্যসাগর ও এজিয়ান সাগর পরিবেষ্টিত এবং অসংখ্য দ্বীপাঞ্চল সম্বলিত গ্রীস ছিল প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। গ্রীসের এ ভৌগোলিক অবস্থা প্রাচীন গ্রীসে গড়ে উঠা সভ্যতাকে অন্যসব প্রাচীন সভ্যতা থেকে আলাদা করেছে। প্রিকবাসী তাদের দেশকে ‘হেলাস’ বলত এবং তারা যে সভ্যতা গড়ে তোলে তা ‘হেলেনিক সভ্যতা’ নামে পরিচিত। আলেকজান্দার, সঙ্গেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো, হিরোডোটাস, পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, ইউক্লিড প্রমুখ বিশ্ববিদ্যাত

ব্যক্তি গ্রীষ্মে জন্ম প্রাপ্ত করেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যিকদের অবদান অবিস্মরণীয়। বিশ্বজগৎ যখন সভ্যতার দিকে হাঁটি হাঁটি করছিল, যিক জাতি তখন জানের মশাল ঝালিয়ে চারদিক আলোকিত করছিল। প্রয়োজনীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রীস তার কৃতিত্ব সংযোজন করে। তাই বিশ্বসভ্যতা যিকদের কাছে বহু দিক দিয়ে থাগী।

রোমান সভ্যতা

বিশ্ব সভ্যতায় রোমানদের অবদান অপরিসীম। সভ্যতার ইতিহাসে যিকদের পরেই রোমানদের নাম স্মরণীয়। রোমানদের অবদানগুলো প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। এক-যিকদের জ্ঞানভান্ডারকে তারা সজীব রাখেন। দুই- নতুন উপাদান ধারা বিশ্ব সভ্যতাকে অস্থগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। রোমান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন রোম নগরীকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে ইতালির পশ্চিম-দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের উপকূলে রোম নগরী অবস্থিত ছিল। রোম নগরী সাতটি টিলার উপর ছড়িয়ে ছিল। এজন্য রোমকে 'সাতটি, পৰ্বতের নগরী' নামেও অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক লিঙ্গ বলেন, লোকস্মৃতি অবস্থারে নির্বাসিত দুই মাজাগুজ রোমুলাস ও রেমাস সিংহাসন পুনরাধিকার করে ৭৫৩ খ্রিস্টপূর্ব রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। রোমুলাসের নামানুসারে রোম নগরী নামকরণ করা হয়। সময় ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা, দক্ষিণ ইউরোপ, আফ্রিকার উভরাখগুলের সীমানা এবং নিকট থাচের একটি বিরাট অংশ নিয়ে রোমান সাম্রাজ্য গঠিত হয়।

স্ত্রাট কল্স্টান্টাইন গোটা রোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখেন। তাঁর পরেও ৩৯৫ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত এ অখণ্ডতা অস্ফুল থাকে। অতঃপর খিওড়োসিয়াস এবং তাঁর পুত্রের শাসনামলে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বিনষ্ট হয় এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে রোমান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। কল্স্টান্টাইন হতে পুরু করে একমাত্র স্ত্রাট জুলিয়ান ব্যতীত অন্যান্য সকল স্ত্রাটই খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। স্ত্রাট হিয়াল্লিয়াসের শাসনামল অবধি রোমানদের রাষ্ট্রিকাবা ছিল ল্যাটিন। তৎপর সেদেশে যিক ভাষাকে রাষ্ট্রিকাবা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় খিওড়োসিয়াসের পর প্রথম জাস্টিনিয়ন রোমান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রোমান সাম্রাজ্যের বিজ্ঞার এবং রোমান আইনের সংকলন ও প্রকাশনা ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশিত। ঐতিহাসিক মায়ার্স বলেন, “এ আইন বিশ্বের নিকট রোমান ধন্দন শ্রেষ্ঠ সম্পদ”। পরবর্তী প্রসিদ্ধ রোমান স্ত্রাট হিয়াল্লিয়াস মহানবি (স.) কর্তৃক প্রেরিত দুর্তকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জাপন করেন। রোমান স্ত্রাটদের মধ্যে অগাস্টাস ছিলেন আর একজন উল্লেখযোগ্য স্ত্রাট। রোমান সাম্রাজ্য পতনের প্রধান কারণ ছিল স্ত্রাটদের দুর্দ, বিদ্রোহ। মাত্রাতিপিক বিলাসিতা ও দাসথৰ্থা রোমের পতনকে তরার্থিত করে। রোম সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন স্বয়ং স্ত্রাট।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাহেলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

আইয়ামে জাহেলিয়ার পরিচয় :

মহানবি (স.) এর নবৃত্ত প্রাপ্তির পূর্ব যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়া (أَلْيَامُ الْجَاهِلِيَّةُ) বা অক্কার যুগ বলা হয়। আইয়াম অর্থ যুগ এবং জাহেলিয়া অর্থ অন্ধকার, কুসংস্কার, বর্বরতা, অজ্ঞতা। যে যুগে আরব দেশে কৃষি, সংস্কৃতি ও আল্লাহ ধন্দন ধর্মীয় অনভূতি লোপ পেয়েছিল সে যুগকেই অক্কার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে অক্কার যুগের সময়কাল স্বত্ত্বে ইসলামী চিক্কাবিদদের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে।

অনেকের মতে, হযরত আদম (আ) হতে হযরত মুহাম্মদ(স)-এর নবৃত্ত প্রাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কেই অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে। কিন্তু এ অভিমত সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, কারণ এ ক্ষেত্রে সকল নবি ও রাসূলকেও অঙ্গীকার করা হয়। হযরত আদম (আ) হতে মহানবি (স.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাসে যে সকল সভ্য জাতি ও সভ্যতা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে, সেগুলোকে তমাচ্ছন্ন বলে আখ্যায়িত করা ইতিহাসকে অঙ্গীকার করা ছাড়া কিছুই নয়।

অপর একদল মনে করেন যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর তিরোধানের পর হতে মহানবি (স.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাব্দী কালকে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এ সময় ঐশ্বী জীবনবিধান সম্পর্কে জগৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এ যুগের তমসাকে আরও পরিবর্ধিত করে ও কুসংস্কার এর দিক নির্দেশনা প্রদান করে, কিন্তু পরীক্ষার কষ্টপাথের এ অভিমতও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ খ্রিস্তীয় ষষ্ঠি ও সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ আরব ও উত্তর আরবে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিল্প-সাহিত্য, রাজনৈতিক চেতনাবোধ, অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবহার যতখানি উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, তাকে অন্ধকার বলে আখ্যায়িত করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

তবে বলা যায়, ইসলাম পূর্ব যুগের আরববাসী বা আরব জাতি বলতে আইয়ামে জাহেলিয়ার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল অর্থাৎ হেজাজ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় অধিকতর বর্বর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নৈতিকতাহীন, উচ্চজ্ঞল এবং অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত ছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায় যে, মহানবি (স.) এর জন্মের প্রাক্তালে উত্তর এবং দক্ষিণ আরবে সমৃদ্ধশালী রাজবংশ স্থায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। উত্তর আরবের হীরা ছিল একটি সমৃদ্ধশালী নগরী। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) কর্তৃক ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে হীরা অধিকৃত হলে এর সুরক্ষ্য হর্মরাজি মুসলিম বাহিনীকে স্তুপিত করে তোলে। প্রশিদ্ধানযোগ্য যে, পরবর্তীতে কুফা শহর ও মসজিদ সম্প্রসারণে হীরার স্থাপত্য রান্তির অনুকরণ করা হয়েছিল। বস্তুত দক্ষিণ আরবের হিমাইয়ারী রাজ্য খ্রিস্তীয় ষষ্ঠি শতাব্দীর এক বিশ্বয়কর প্রতিভা। এ রাজবংশের অহংকারী আবরাহা কাবাগ্ত ধ্বংস করতে গিয়ে নিহত হয়েছিল। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দক্ষিণে আরব মিনাইয়ান, সাবিয়ান ও হিমাইয়ারী সভ্যতাকে অজ্ঞতার আবর্তে নিষ্কেপ করা যায় না। অপরদিকে উত্তর আরবের নুফুদ অঞ্চলে নাবাতিয়ান, পালমিরা ঘাসসানি ও লাখমিদ রাজ্যগুলোর সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলোকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা যায় না।

তাছাড়া উত্তর আরবের মরক্কয় নুফুদ অঞ্চলসহ নজ্দ ও হিজাজ প্রদেশে মরঢ়ারি বেদুইনদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে ছিল। অর্তন্ত গোত্র কলহ, কাব্যে কুর্সা রচনায় মত রক্তলোপ লুট্রেরা বেদুইনদের মধ্যে পার্শ্ববর্তী সভ্যতার ছেয়া দাগ কাটতে পারেন। দুর্দয়নীয়, দুর্বিনীত অত্যাচারী হিজাজ ও নজদবাসীর ইতিহাস প্রাক-ইসলামি যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। বিশেষত হিজাজ ও তৎপার্শ্বস্থ এলাকায় নৈরাজ্যের ঘনঘটা বিরাজমান ছিল। হিজাজে প্রচলিত আরবি ভাষায় কুরআন অবর্তীর্ণ হয়। এ জন্য অন্ধকার যুগের আরব বলতে হিজাজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং অন্ধকার যুগ বলতে সে সময়কে বুঝতে হবে।

রাজনৈতিক অবস্থা

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্বজ্ঞাপূর্ণ এবং হতাশাব্যঙ্গক ছিল। কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত না থাকায় আরবে গোত্র প্রাধান্য লাভ করে। তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। গোত্রসমূহের মধ্যে সব সময় বিরোধ লেগেই থাকত।

গোপীনাথ শাসন : অক্ষকার যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশ্বাস্তা, স্থিতিহীন ও নৈরাজ্যের অক্ষকারে ঢাকা। উভয় আরবে বাইজান্টাইনও দক্ষিণ আরবের পারস্য এভাবিত কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যক্তিত সময় আরব এলাকা স্বাধীন ছিল। সামান্য সংখ্যক শহরবাসী ছাড়া যাদাবর প্রেশির গোত্রগুলোর মধ্যে গোত্রগতির শাসন বলবৎ ছিল। গোত্রগতি বা শেখ নির্বাচনে শক্তি, সাহস, আর্থিক ব্যচেলতা, অভিজ্ঞতা, বয়োজ্ঞতা ও বিচার বৃক্ষ বিবেচনা করা হত। শেখের আনুগত্য ও গোত্রগতি একটি থাকলেও তারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি সর্বদা সচেতন ছিলেন। ভিন্ন গোত্রের প্রতি তারা চরম শত্রুভাবাপন্ন ছিল। গোত্রগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্ঝুতাত্ত্ব মোটেই ছিল না। কলহ বিবাদ নিরসনে বৈঠকের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শেখের প্রশাসনিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক জীবন ধারার ছোয়া থাকলেও শাস্তি ও নিরাপত্তার লেশমাত্র ছিল না।

গোত্র-স্বৰ্গ : গোত্র কলহের বিষবাসে অক্ষকার যুগে আরব জাতি কঙুষিত ছিল। গোত্রের মানসম্মান রক্ষার্থে তারা রক্তপাত করতেও কুর্তাবোধ করত না। তৃণভূমি, পানির কর্ণ এবং গৃহপালিত পশু নিয়ে সাধারণত রক্তপাতের স্তরগাত্র হত। কখনও কখনও তা এমন বিভীষিকার আকার ধারণ করত যে দিনের পর দিন এ যুদ্ধ চলতে থাকত। আরবিতে একে আরবের দিন (أَيَّامُ الْعَرَب) বলে অভিহিত করা হত। আরবের মধ্যে খুনের বদলা খুন, অথবা রক্ত বিনিয়য় প্রথা চালু ছিল। অক্ষকার যুগের অহেতুক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের নজির আরব ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। তন্মধ্যে বুয়াসের যুদ্ধ, ফিজার যুদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে গয়েছে। উট, ঘোড়াদৌড়, পবিত্র মাসের অবয়বনা, কুর্দা রাটনা করে ইত্যাদি ছিল এ সকল যুদ্ধের মূল কারণ। বেদুইনগণ উভেজনাপূর্ণ কবিতা পাঠ করে যুদ্ধের ময়দানে রক্ত প্রবাহে মেঠে উঠত। এ সকল অন্যায় যুদ্ধে জানমালের বিপুল ক্ষতি সাধিত হত। যুদ্ধপ্রিয় গোত্রগুলোর মধ্যে আউস, খায়াব, কুরাইশ, বানু বকর, বানু তাগলিব, আবস ও জুবিয়ান ছিল প্রধান।

সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদের সামাজিক জীবন অনাচার-পাপাচার, দূর্নীতি, কুসংস্কার, অরাজকতা, ঘৃণ্য আচার অনুষ্ঠান এবং নিম্ননীয় কার্যকলাপে পরিপূর্ণ ছিল। আরবেরা মদ নারী ও যুদ্ধ নিয়ে মত থাকত। হ্যরত মুহাম্মদ (স) সময় আরব দেশকে মূর্ধন্তা, বর্বরতা ও ধৃক্তি পূজায় নিয়ন্ত্রিত দেখতে পান। তারা এত বেশি মদ্যপায়ী ছিল যে কোন গর্হিত কাজ করতে তারা বিধাবোধ করত না।

কৌলিগ্য প্রথা : তৎকালীন আরবের সমাজ বলতে শহরবাসী ও বেদুইনদের বুঝতে হবে। এ উভয় সমাজে বিয়ে শাদী, আচার অনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া বীতি-বীতি ও ধ্যান-ধারণায় উভয় সমাজ একই ধরনের ছিল। বংশগত কৌলিগ্য ও গোত্রগত মর্যাদা এত একটি ছিল যে অহংকার, হিংসা-বিদ্রোহ, ঘৃণা সমাজের সর্বত্র বিরোজ্বান ছিল। বংশ মর্যাদা ও কৌলিগ্য প্রথা সতর্কপের জন্য কখনও বা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হত। প্রাকৃতিক কঠোরতার নিষ্ঠেষণে আরব সমাজে অরাজকতা, কুসংস্কার, নিম্ননীয় কার্যকলাপ ও ঘৃণাপ্রথা অপ্রতিহতভাবে বেড়ে চলছিল। পাপাচার, দূর্নীতি, মদ্যপান নারীগমনের আসক্তি তাদের পেরে বসেছিল। বক্তৃত তাঁদের জীবনধারা ছিল অভিশঙ্গ ও কল্পিত। জনজীবন ছিল বর্তার শিকার।

নারীর অবস্থা : জাহেলী যুগে আরব সমাজে নারীর স্থান ছিল অতি নিম্নে। সামাজিক মর্যাদা বলতে তাদের কিছুই ছিল না। নারী ছিল ভোগ-বিলাসের সামগ্রী ও অস্ত্রাবর সম্পত্তির মত। অবৈধ প্রণয়, অবাধ মেলামেশা ও একই নারীর বহু স্বামী শহুণ প্রথা ব্যাপক ছিল। ব্যতিচার এত জঘন্য আকার ধারণ করেছিল যে, স্বামীর অনুমতিক্রয়ে কিংবা স্বামীর নির্দেশে অথবা পুত্র সভানের আশায় নারীগণ বহু পুরুষের সাম্নিধ্যে গমন করতো। বিষয়-সম্পত্তিতে ঝীর কোনো অধিকার ছিল না। গৃহপালিত পণ্ডর মত ব্যবহার করা হত নারীদের প্রতি। নারীও যে মানুষ এ কথা তাদের স্মরণে আসত না।

দাস-দাসীর অবস্থা : প্রাচীনকাল হতেই আরবে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। দাস-দাসীদের জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিষহ ও করুণ। মানবিক মর্যাদা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে তাদের কিছুই ছিল না। হাটে বাজারে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের মত দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো। প্রভুর বিনা অনুমতিতে দাস-দাসীগণ বিয়ে করতে পারত না। কিন্তু তাঁদের ছেলে-সন্তানের মালিক হত প্রভু। মূলত ভৃত্য ও ভূমিদাসদের আশা আকাঞ্চার ক্ষীণ আলোও পরিলক্ষিত হত না। নির্মম অত্যাচারে দাস-দাসীদের নিরাপত্তা দারুণভাবে বিঘ্নিত হত। দাস-দাসীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করার কথা তারা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল।

জীবন্ত কন্যা সন্তানকে ক্রয় করা : প্রাক-ইসলামি আরবে জীবন্ত কন্যা শিশুকে ক্রয় করার নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল। দরিদ্রতার ভয়ে বিশেষ করে কন্যা সন্তানকে অভিশপ্ত, লজ্জাজনক ও অপয়া মনে করে জীবন্ত ক্রয় দেওয়া হত। কন্যা সন্তান জন্মানকারী মাতার ভাগ্যেও নেমে আসত কঠিন অত্যাচারের তীব্র ক্ষমতাত। এ ঘৃণ্য প্রথার উচ্ছেদ করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে “তোমরা দরিদ্রতার-ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করো না, বস্তুত আমি তাদের জীবিকা সরবরাহ করে থাকি।”

অনাচার, ব্যভিচার ও নৈতিক অবনতি : নৈতিক অবনতি, ব্যভিচার, অনাচার, লুটরাজ, মদ্যপান, জুয়াখেলা-সুদ, নারীহরণ, ইত্যাদি অপকর্ম আরব সমাজে বিদ্যমান ছিল। সুদ আদায়ে অপারগ হলে সুদ গ্রহীতার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের মালিক মহাজন ক্ষেত্রদাস-দাসী রূপে হস্তগত করে হাটে-বাজারে বিক্রয় করে ফেলত। মোটকথা নারীহরণ, ঝণ প্রথা, কুসিদ প্রথা ও দাসত্ত প্রথার মতো নানাবিধ পাপ পঞ্জিল আরব সমাজকে জর্জরিত করে ফেলেছিল।

ধর্মীয় অবস্থা

জাহেলিয়া যুগে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও অনুরক্তারাচ্ছন্ন ছিল। আরবে তখন অধিকাংশ লোকই ছিল জড়বাদী পৌত্রলিক। তাদের ধর্ম ছিল পৌত্রলিকতা এবং বিশুস ছিল আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির কুহেলিকাপূর্ণ ভয়ভীতিতে। তারা বিভিন্ন জড়বন্ধুর উপাসনা করত। চন্দ, সূর্য, তারকা এমনকি বৃক্ষ, প্রস্তরখন্ড, কৃপ, গুহাকে পবিত্র মনে করে তার পূজা করত। প্রকৃতি পূজা ছাড়াও তারা বিভিন্ন মূর্তির পূজা করত। মূর্তিগুলোর গঠন ও আকৃতি পূজারীদের ইচ্ছানুযায়ী তৈরি করা হতো।

পৌত্রলিক আরবদের প্রত্যেক শহর বা অঞ্চলের নিজস্ব দেবীর মধ্যে অন্যতম ছিল আল-লাত, আল-মানাহ এবং আল-উজ্জা। আল-লাত ছিল তায়েফের অধিবাসিদের দেবী, যা চারকোণা এক পাথর। কালো পাথরের তৈরি আল-মানাহ ভাগ্যের দেবী। এ দেবীর মন্দির ছিল মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী কুদায়েদ স্থান। মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা এ দেবীর জন্য বলি দিত এবং দেবীকে সম্মান করত। নাখলা নামক স্থানে অবস্থিত মক্কাবাসীদের অতি প্রিয় দেবী আল-উজ্জাকে কুরাইশগণ খুব শ্রদ্ধা করত।

আরবদেশে বিভিন্ন গোত্রের দেবদেবীর পূজার জন্য মন্দির ছিল। এমনকি পবিত্র কাবা গৃহেও ৩৬০ টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল। কাবাঘরে রক্ষিত মূর্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্তির বা দেবতার নাম ছিল হোবল। এটি মনুষ্যাকৃতি ছিল- এর পাশে ভাগ্য গণনার জন্য শর রাখা হতো।

উপরিউক্ত দেব-দেবী ছাড়া আরবে আরও পাথরের দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। এগুলোর কথা পবিত্র কুরানে উল্লেখ রয়েছে। আরববাসীরা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনাচারে আচ্ছন্ন ছিল। তারা দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু ও নরবলি দিত। মন্ত্রতত্ত্ব, যাদু টোনা, ভূত, প্রেত ও ভবিষ্যৎ বাণীতে তারা বিশুসী ছিল।

এ যুগে আরবে পৌত্রিক ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও কিছু ছিল। এদের মধ্যে ছিল ইহুদী, খ্রিস্টান ও হানাফী সম্প্রদায়ের লোক। ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা আসমানী কিতাবের অধিকারী ও একেশ্বরবাদী বলে দাবী করত। কিন্তু ইহুদীদের বিশৃঙ্খলার স্তর ও নিয়ন্তা সম্মেৰ্থ সঠিক ধারণা ছিল না। তারা বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী ছিল। অপরপক্ষে খ্রিস্টানরা ত্রিতুবাদে বিশৃঙ্খলী ছিল। আরবে আর এক শ্রেণির বিশৃঙ্খলী লোক ছিল। তারা পৌত্রিকতার বিরোধী ছিল। এক সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এবং পরলোক সম্মেৰ্থ তাদের ধারণা ছিল। তারা সৎ জীবন যাপন করত। ওয়ারাকা বিন নাওফেল, যায়েদ বিন আমর, আবু আনাস প্রমুখ এ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা এত অল্প ছিল যে তারা আরবদের উপরে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আরবের অধিকাংশ অঞ্চল মরুময় ও অনুর্বর। অনুর্বর মরুভূমি কৃষি কাজের উপযোগী ছিল না। ফলে খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অননুভূত ছিল।

তোপোলিক পরিবেশ এবং জীবিকার ভিত্তিতে ইসলাম পূর্ব যুগে আরববাসীদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এ ভাগ গুলো হল- (১) কৃষিজীবি (২) ব্যবসায়ী (৩) সুদের কারবারী (৪) কারিগর (৫) মরুবাসী বেদুইন ইত্যাদি।

কৃষিজীবি : আরবের তায়েফ, ইয়েমেন এবং মদিনা অঞ্চলের ভূমিও কৃষির উপযোগী ছিল। এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা কৃষিকাজ করত। বানু নাজির ও বানু কুরাইজা দুই ইহুদি গোত্র মদিনার শস্য শ্যামল অঞ্চলে কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল। উর্বর তায়েফ ভূমিতে তরমুজ খেজুর, দুমুর, আঞ্চুর, জলপাই, ইঞ্চ উৎপন্ন হত।

ব্যবসায়ী : আঞ্চলিক বসবাসের ভিত্তিতে আরবগণ দুভাগে বিভক্ত ছিল। যথা- শহরবাসী আরব এবং মরুবাসী বেদুইন। শহরবাসী আরবের কিছু কিছু গোত্র ব্যবসায় বাণিজ্যে নিয়োজিত থেকে জীবিকা অর্জন করত। মক্কাবাসী কুরাইশ সম্প্রদায় মিসর, সিরিয়া, পারস্য এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়। ইসলাম পূর্ব যুগে হ্যরত আবুবকর (রা), হ্যরত ওসমান (রা) এবং বিবি খাদিজা (রা) বিন্দুশালী ব্যবসায়ী ছিলেন।

সুদের কারবার : ইসলাম পূর্ব যুগে ধনী আরববাসী বিশেষ করে ইহুদি সম্প্রদায় সুদের ব্যবসা বা কারবারে নিয়োজিত ছিল। দরিদ্র লোকেরা অধিক সুদে ইহুদি ও সুদের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ধার গ্রহণ করত। ফলে খণ্ড গ্রহণকারীরা সর্বশান্ত হয়ে যেত। কোন কোন সময় খণ্ড ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হলে নিজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বিন্দু-সম্পত্তি সুদ-ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যেত। পরবর্তীতে ইসলামে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

কারিগর সম্প্রদায় : ইসলাম পূর্ব আরবে পৌত্রিকতার ব্যাপকতার কারণে মূর্তি তৈরির জন্য এক প্রকার কারিগর শ্রেণির উচ্চব হয়। এদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা ভালো ছিল।

মরুবাসী বেদুইন : মরুবাসী বেদুইনদের জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল লুটতরাজ ও পশুপালন। জীবিকার তাগিদে এসব স্বভাবের বশবর্তী হয়ে তারা ডাকাতি, রাহজানী ও লুটতরাজ করত।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

বর্তমান যুগের ন্যায় প্রাক-ইসলাম যুগে আরব বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও সংস্কৃতি না থাকলেও আরবরা সাংস্কৃতিক জীবন হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাদের ভাষা এত সমৃদ্ধ ছিল যে, আধুনিক ইউরোপের উন্নত ভাষাগুলোর সাথে তুলনা করা যায়।

কবিতার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক চেতনা : প্রাক-ইসলামি যুগে লিখন প্রশালির তেমন উন্নতি হয়নি বলে আরবগণ তাদের রচনার বিষয়বস্তুলো মুখ্যত করে রাখত। তাদের স্বরণ শক্তি ছিল খুব প্রখর। তারা যুধে কবিতা পাঠ করে শুনাত। কবিতার মাধ্যমে তাদের সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশ পেত। এ জন্যেই লোক-গাঁথা, জনগুরুত্বের উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে আরব জাতির ইতিহাস লিখিত হয়েছে।

আরব সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন আরবি গীতিকাব্য অথবা কাসীদা সমসাময়িক কালের ইতিহাসে অঙ্গুলনীয়। ৫২২ হতে ৬২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রচনার সাবলীল গতি ও স্বচ্ছ বাক্য বিন্যাসে বৈশিষ্ট্য থাকলেও এর বিষয়বস্তু কৃচিসম্মত ছিল না। যুদ্ধের ঘটনা, বৎস শৌরূব, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, যুদ্ধের বিবরণ, উটের বিস্ময়কর গুণাবলী ছাড়াও নারী, প্রেম, যৌন সম্পর্কিত বিষয়ের উপর গীতিকাব্য রচনা করা হত। ঐতিহাসিক হিস্টি বলেন, “কাব্য প্রীতিই ছিল বেদুইনদের সাংস্কৃতিক সম্পদ।” প্রাক-ইসলামি কাব্য সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে মিলযুক্ত গদের সম্মান পাওয়া যায়। কুরআন শরীফে এ হন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাব্য চর্চার রীতির মধ্যে উন্ট্র চালকের ধরনিময় সজ্ঞাত (হুদা) এবং জটিলতার হন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কাসীদা ছিল একমাত্র উৎকৃষ্ট কাব্যরীতি। বসুস যুদ্ধে তাবলিব বীর মুহালহিল সর্বপ্রথম দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। জোরালো আবেগময় সাবলীল ভাষা ও মৌলিক চিন্তা ধারায় এটি ছিল পুনৰ্মাণ।

উকাজের সাহিত্য মেলা : প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের বাণিজ্য। জিহ্বার অফুরন্ত বাচন শক্তির অধিকারী প্রাচীন আরবের কবিগণ মুক্ত অবস্থার উকাজের বাংসরিক মেলায় কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। উকাজের বাংসরিক সাহিত্য সম্মেলনে পঞ্চিং সাতটি ঝুলন্ত কবিতাকে আস্স-সাবাউল মুআল্লাকাত (الْمُعَلَّقَات്) বলা হয়। হিস্টি উকাজের মেলাকে আরবের Academic francaise বলে আখ্যায়িত করেন। তখনকার যুগের কবিদের মধ্যে যশোরী ছিলেন উন্ট্র সাতটি ঝুলন্ত গীতি কাব্যের রচয়িতাগণ। সোনালী হরফে লিপিবদ্ধ এ সাতটি কাব্যের রচনা করেন আমর ইবনে কুলসুম, লাবিছ ইবন রাবিয়া, আলতারা ইবন শাদদাদ, ইমরান কায়েস, তারাফা ইবনে আবদ, হারিস ইবনে হিলজা ও জুহাইর ইবন আবি সালমা। এদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন ইমরাল কায়েস। তিনি প্রাক-ইসলামি যুগের প্রের্ণ কবির মর্যাদা লাভ করেন। ইউরোপীয় সমালোচকগণও তার উৎকৃষ্ট শব্দ চয়ন, সাবলীল রচনাশৈলী, চমকপ্রদ স্বচ্ছ লহরীতে মুখ হয়ে তাকে আরবের শেক্সপীয়র বলে আখ্যায়িত করেন। আরবি ভাষায় এরূপ উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনে হিস্টি মন্তব্য করেন, “ইসলামের জয় অনেকাংশে একটি ভাষার জয়, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে একটি ধর্মগ্রন্থের জয়।”

সাহিত্য আসরের আয়োজন : তৎকালীন আরবে সাহিত্য চর্চায় আরবদের আগ্রহ ছিল স্বতঃক্ষুর্ত। অনেক সাহিত্যমৌদী আরব নিয়মিত সাহিত্য আসরের আয়োজন করতেন। সাহিত্য আসরের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তাকিব গোত্রের ইবনে সালামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতি সপ্তাহে তিনি একটি সাহিত্য আসরের আয়োজন করতেন। আরবদের সাহিত্য প্রীতির কথার উল্লেখ করে ঐতিহাসিক হিস্টি বলেছেন, “পৃথিবীতে সম্ভবত অন্যকোনো জাতি আরবদের ন্যায় সাহিত্য চর্চায় এতবেশি স্বতঃক্ষুর্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা এত আবেগাচ্ছন্ন হয়নি। এ সমস্ত সাহিত্য আসরে কবিতা পাঠ, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ও সমালোচনা অনুষ্ঠিত হত।

কবিতার বিষয়বস্তু : প্রাক-ইসলামি যুগের সাহিত্যকগণ তাদের গোত্র ও গোত্রীয় বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, যুদ্ধের বিবরণ, উটের বিস্ময়কর গুণাবলী, বৎস শৌরূব, অতিথি পরামর্শদাতা, নরনারীদের প্রেম, নারীর সৌন্দর্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করতেন। তাদের এ সকল কবিতা সুদূর অতীতকালের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি প্রাক-ইসলামি আরবদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে।

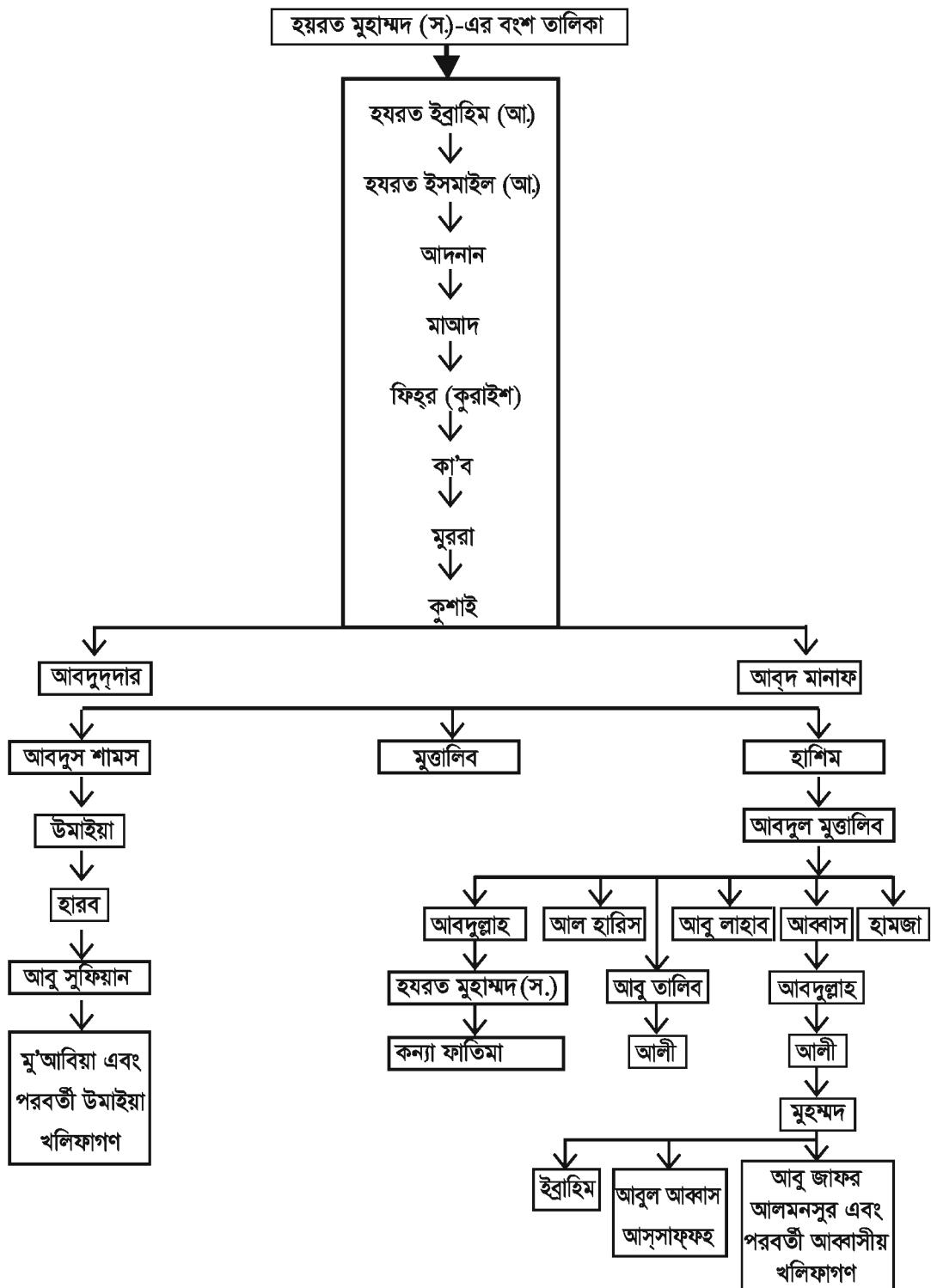
মহানবি (স.)-এর আবির্ভাব ৪ অঙ্গতা যুগের পাপ পঞ্জিকল সমাজ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় মতবাদ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, অভিশপ্ত প্রথা ও অনুষ্ঠানের কথা বললে স্থান ও কাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, আরবদের অঙ্গতা বা বর্বরতার যুগ বলতে হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়াত লাভের (৬১০ খ্রিস্টাব্দের) পূর্বে হিজাজের অবস্থাকে বুঝায়। সামগ্রীকভাবে সমস্ত আরবের প্রাক-ইসলামী যুগকে কখনই বর্বরতার যুগ বলা যেতে পারে না। আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষের একেশ্বরবাদের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে মানবজাতি এক সংকটজনক ও অভিশপ্ত অবস্থায় পতিত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীগণ ধর্মগুরুর প্রদর্শিত পথ ও একেশ্বরবাদের পথ ভুলে পৌত্রিকাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। খ্রিস্টানগণ হয়রত ঈশ্বা (আ.) এর প্রচারিত ধর্মত হতে বিচ্যুত হয়ে ত্রিত্বাদে (Trinity) বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। দক্ষিণ আরবে খ্রিস্টান, ইহুদী ও পরবর্তীকালে জরথুস্ট্র ধর্মের প্রভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক নৈরাশ্যজনক পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই চরম দুর্গতিসম্পন্ন জাতিকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করার জন্য একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আমীর আলীর ভাষায় “পৃথিবীর ইতিহাসে পরিত্রাণকারী আবির্ভাবের এত বেশি প্রয়োজন এবং এমন উপযুক্ত সময় অন্যত্র অনুভূত হয়নি।” অবশেষে আল্লাহ মানব জাতিকে হেদায়তের জন্য হয়রত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণ ও সর্বশেষ নবি রূপে বিশ্বে প্রেরণ করলেন। শুধু আরবের নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে কুসংস্কারের কুহেলিকা ভেদ করে তৌহিদের বাণী প্রচার করার জন্য তিনি মক্কায় ভূমিষ্ঠ হন। তিনি অনস্ত কল্যাণ ও সুস্থির প্রেষ্ঠ সৃষ্টি আপোয়হীন তৌহিদের প্রতীক। এ সম্বন্ধে হিতি বলেন, “মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল এবং সময়ও ছিল মনস্তাত্ত্বিকতাপূর্ণ।”

(খ) হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মক্কাজীবন (৫৭০-৬২২ খ্রিঃ)

পদ্ধতি পরিচেছে আবির্ভাব ও পরিচয়

সর্বশেষ মানব ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব কাল ছিল জাহেলিয়াতের যুগে। তখন আরব উপদ্বিগ্নসহ সমগ্র পৃথিবী অঙ্গতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সে সময়ে মিথ্যা, পাপাচার, হত্যা, লুঁঠন, মদ্যপান, জুয়া, ঘোন অনাচার, কথায় কথায় বাগড়া-বিবাদ এমনকি যুদ্ধ-বিশ্রহ পর্যন্ত ঘটে যেত। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে হত্যা করা হত বা জীবন্ত পুঁতে ফেলা হত। মানবতা বলতে যা বোঝায় তা ছিল তাদের মধ্যে অনুসন্ধিত। এক কথায়, মানুষ আল্লাহর বিধান এবং রাসূলগণের আদর্শ ও সত্যের বাণী ভুলে গিয়ে পাশবিকতায় লিপ্ত ছিল মানবতার এ চরম দুর্দিনে আরবের মক্কা নগরে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (স.) কে পাঠালেন বিশু মানবতার মুক্তি ও শান্তির দৃত হিসেবে। অংশীদারিতা, পৌত্রলিকতা ও জড় পূজা থেকে মানবজাতিকে একাত্মবাদের ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করতে। বিশ্বের নির্যাতিত ও অধিকার বধিতে মানুষকে মুক্তি দিতে। মুক্তি ও শান্তির দৃত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মধ্যে ছিল সকল মানবিক গুণাবলির বিকাশ। তাই তিনি সমগ্র বিশ্বের মানুষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। তিনি ছিলেন মানব জাতির কল্যাণকারী।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃগর্তে থাকাকালীন তিনি পিতৃহারা হন। নবুয়ত লাভ পর্যন্ত ৪০ বছর এবং নবুয়ত লাভের পর থেকে মদিনায় হিজরত পর্যন্ত ১৩ বছর মোট ৫৩ বছর তিনি পবিত্র ভূমি মক্কায় কাটান। এই সময়কালকে তাঁর মক্কা জীবন নামে আখ্যায়িত করা হয়। মদিনায় হিজরত করে মহানবি (স.) মাত্র দশ বছর জীবিত ছিলেন এবং তিনি মদিনায় অবস্থান করেছিলেন। মদিনায় অবস্থানকালীন ১০ বছর সময়কে হযরতের মদিনা জীবন নামে আখ্যায়িত করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সমস্ত জীবনটাই ছিল সংগ্রামমুখর। নবুয়ত লাভের পর থেকে স্বজাতির স্বার্থান্বিদ্যাক্ষেত্রে তাঁকে সহজে মেনে নেয়নি। নানা নির্যাতন, নিপীড়ন ও অত্যাচারে তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল। তা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ (স.) সফল হয়েছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে। তাঁর আদর্শিক বিপ্লবে উন্নাসিত হয় বিশু মানবতা। আলোকিত হয় মানব ও মানব সভ্যতা।



মহানবি (স)-এর বৎপ পরিচিতি

মুসলমান জাতির পিতা হ্যরত ইবরাইম (আ.) এর পুত্র ইসমাইল (আ.) এর বৎশের উত্তর পুরুষগণ কুরাইশ নামে খ্যাত। হ্যরত ইসমাইল (আ.) এর বৎশের ফিহরের অপর নাম ছিল কুরাইশ। তাঁর নামানুসারে গোত্রের নাম রাখা হয় কুরাইশ। তাঁর বৎশবর্ণাধ কুরাইশ নামে পরিচিত। কুরাইশ শব্দের অর্থ সওদাগর। তৎকালে আরবের মধ্য কুরাইশগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অন্যান্য গোত্র থেকে উন্নতি সাধন করেছিল ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মঙ্গায় তাদের ছিল একচেত্রে প্রাধান্য। ফলে মঙ্গায় তাঁরা সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। ফিহর খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ বৃক্ষ। তাঁরই উত্তর পুরুষ কুশাই খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মঙ্গায় এবং হিজায়ে প্রাধান্য বিস্তার করেন। তিনি কাবাঘুরের সংস্কার এবং তীর্থ যাত্রাদের সেবা-যত্ন করায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ে আরবদের নেতা ছিলেন। ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর মঙ্গায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহরের মৃত্যুর পর আবদুল মানাফ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহরের পৌত্রগণ কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও দারুণ নাদওয়া বা পরামর্শ সভাগৃহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লাভ করেন। আবদুস শামসের পর তাঁর ভাই হাশিম এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই মুত্তালিব শাসনভার গ্রহণ করেন। মুত্তালিব বীরত ও দামশীলতার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন।

৫২০ খ্রিস্টাব্দে দয়ালু ও দামশীল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর আতুস্পৃত শায়বাকে মঙ্গায় সর্বময় কর্তৃত প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, শায়বাকে দয়ালু মুত্তালিবের ক্রীতদাস মনে করে তাঁর নাম দেয়া হয় আবদুল মুত্তালিব। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই আবদুল মুত্তালিব নামে পরিচিত। তাঁর শাসনামলে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়ায় বাদশাহ আবরাহা মঙ্গা নগরী আক্রমণ করে। আবরাহা হাতির পিঠে আরোহণ করে মঙ্গায় যুদ্ধ যাত্রা করেন বলে এ বছরকে হষ্টিবৰ্ষ বা ‘আ-মুল ফিল’ (عَامُ الْفِيْلِ) বলা হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশে একদল আবাবিল পাথি ছোট ছোট পাথর কলা নিক্ষেপ করে আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। পবিত্র কুরআন শরীফের ‘সুরা আল ফীলে’ এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আবদুল মুত্তালিব অপরিসীম কার্যক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ৫৯ বছর বয়সে মঙ্গায় ক্ষমতাসীন থাকাকালে মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে ১২ জন পুত্র এবং ৬ কন্যা সন্তান ছিল। পুত্রগণের মধ্যে আবু তালেব, আববাস, হামজা এবং আবুদুল্লাহ ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আববাস হলেন আবাসীয়া বৎশের পূর্ব পুরুষ।

আবদুল মুত্তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ ছিলেন বিখ্নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর পিতা। তিনি মদিনার বানু জোহরা গোত্রের নেতা আবদুল ওয়াহাবের কন্যা বিবি আমিনাকে বিয়ে করেন। বিবাহের কিছুদিন পর আবদুল্লাহর ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। কিন্তু বাণিজ্য থেকে ফেরার পথে মদিনার উপকর্ত্তে অসুস্থ হয়ে মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। বিবি আমিনা তখন গর্ভবতী ছিলেন। আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর হ্যরত মুহাম্মদ (স) জনাগ্রহণ করেন।

হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম ও প্রার্থনিক জীবন

আল্লাহর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বিখ্নবি নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ ও আর্থিকাদের মৃত্য প্রতীক হ্যরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার আরবের মঙ্গা নগরে সম্মান কুরাইশ বৎশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম বিবি আমিনা। হ্যরত মুহাম্মদ (স) এর উর্ধ্বর্তন একাদশ পুরুষের নাম ছিল ফিহর। তিনি কুরাইশ নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ কারণে তাঁর বৎশের কুরাইশী নামে খ্যাতি লাভ করে।

নামকরণ ৪ হয়রত মুহাম্মদ (স.) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গমন করেন। বাণিজ্য শেষে সিরিয়া থেকে ফেরার পথে মদিনার উপকঠে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হয়রতের দাদা ছিলেন আবদুল মুতালিব। হয়রতের জন্মের পর দাদা আবদুল মুতালিব নবজাত শিশুর লালন-পালনের দায়িত্বার গ্রহণ করেন এবং শিশুটির নাম রাখেন ‘মুহাম্মদ’ অর্থাৎ ‘প্রশংসিত’। মাতা আমিনা তাকে আদর করে ডাকতেন ‘আহমদ’ বলে।

ধাত্রী গৃহে গমন ৪ মহানবি (স.) জন্মের পর প্রথম সাত দিন নিজ মায়ের দুধ পান করেন। অতঃপর আরবের প্রখনুয়ায়ী শিশু মুহাম্মদ (স.) কে লালন-পালনের জন্মে সাদ গোত্রের বিবি হালিমাকে ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। তিনি পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বিবি হালিমার গৃহে লালিত-পালিত হন। সেখানে অবস্থানকালে তৎকালীন আরব সমাজের মধ্যে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা আয়ত্ত করেন।

প্রথম বক্ষ বিদীর্ঘ বা সিনা চাক ৪ বিবি হালিমার গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার সময় হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স যখন চার বছর মাত্র তখন দু'জন ফিরিশতা এসে তাঁর সিনা চাক করে নবুয়ত লাভের উপযোগী করে তোলেন এবং অন্তরের সমন্ত ব্যাধি দূর করে দেন।

মাতৃক্রোড়ে বালক মুহাম্মদ ৪ হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স যখন ছয় বছর তখন তিনি মাতা আমেনার কাছে ফিরে আসেন। তাঁর এ মাতৃ সান্নিধ্য বেশিদিন স্থায়ী হল না, তিনি মঙ্কা থেকে পিতা আবদুল্লাহর কবর যিয়ারত করার জন্য মায়ের সাথে মদিনায় গমন করেন। মদিনা থেকে ফেরার পথে ‘আবওয়া’ নামক স্থানে মাতা আমিনা অসুস্থ হয়ে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় দাসী উম্মে আইমন তাঁকে মকায় নিয়ে এসে তাঁর দাদা আবদুল মুতালিবের কাছে পৌছে দেন। আবদুল মুতালিবের কাছে মাত্র দু'বছর লালিত পালিত হন। পরে ৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দাদাকেও হারান।

চাচার অভিভাবকক্ষে বালক মুহাম্মদ (স.) ৪ দাদা আবদুল মুতালিবের মৃত্যুর পর নবিজির লালন-পালনের দায়িত্ব পড়ে চাচা আবু তালিবের ওপর। চাচা আবু তালিব বালক মুহাম্মদ (স.) কে যথাসাধ্য আদর-যত্নে প্রতিপালন করতে থাকেন। কিন্তু আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় মুহাম্মদ (স.) কে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। তাঁকে চাচার উট ও মেষ চরাতে হতো এবং অবসর সময়ে তিনি মকায় তীর্থ যাত্রাদের পানি পান করাতেন। এ সকল কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তিনি অশ্ব চালনা, বর্ণ চালনা, তলোয়ার চালনা প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১০ বছর বয়সে তাঁর দ্বিতীয় বার সিনা চাক হয়।

সিরিয়া গমন বার বছর বয়সে বালক মুহাম্মদ (স.) চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ৫৮২ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। এ পরিভ্রমণে খোদাদ্দোহী সামুদ জাতির ধৰ্মসাবশেষ অবলোকন ও প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে তাঁর মন এক পরম সন্তান সান্নিধ্য পাবার আগ্রহ প্রকাশ করে। কথিত আছে, সিরিয়া যাত্রাকালে পান্দী বুহাইরা বালক মুহাম্মদ (স.) কে প্রতিশ্রুত শেষ নবি হিসেবে চিনতে পারেন। তিনি তাঁর চাচাকে নবির ব্যাপারে ইহুদি খ্রিস্টানদের হতে সতর্ক করে দেন। বালক মুহাম্মদ (স.) প্রথমবারের মত জন্মভূমির বাইরে গমন করে বিশাল পৃথিবী এবং ব্যাপক কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। রাসুল (স.) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তিনবার সিরিয়া গমন করেছিলেন।

আল-আমীন উপাধি লাভ বাল্যকাল থেকেই হয়রত মুহাম্মদ (স.) চিন্তাশীল ছিলেন। মানুষের দৃঢ়ত্ব-দুর্দশায় তাঁর মন ব্যাখ্যিত হত। তাঁর ঘৃতাব ছিল নরম-প্রকৃতির। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন, তাই তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

তিনি কখনও অন্যায় আচরণ করতেন না। এমনকি বাল্যকাল থেকেই ‘লাত’ ও ‘উয়ার’ নামে কোন বিশেষ কাজ করার কথা হয়ে তিনি ‘বলতেন’ এ মৃত্তিগুলো দোহাই দিয়ে তোমরা আমাকে কিছুই বলো না। হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর কর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, নম্রতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলির জন্য সকলে তাঁকে ভালোবাসত এবং ‘আল-আমীন’ উপাধি দিয়েছিলেন। অবস্থা এমন হল যে, মুহাম্মদ নামটি চাপা পড়ে গেল। আল-আমীন নামটিই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করল।

হারবুল ফুজ্জারে অংশগ্রহণ : চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া থেকে মকায় ফিরে আসার কিছুদিন পরেই শুরু হল বিখ্যাত মেলা। এ মেলায় জুয়া খেলা, ঘোড়াদৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতা নিয়ে শুরু হয় এক ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ “হারবুল ফুজ্জার” বা অন্যায় সমর বা পাপাচারীদের সমর নামে পরিচিত। এ যুদ্ধ পাঁচ বছরকার স্থায়ী হয়েছিল এবং এতে অনেক লোকে প্রাণ হারিয়েছিল। যেহেতু এ যুদ্ধ কুরাইশ ও কায়েস বংশের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, সেহেতু হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-কে তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। এ যুদ্ধে তিনি নিষিদ্ধ তীর সংগ্রহ করে চাচার হাতে তুলে দিতেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি।

হিলফ-উল-ফুজ্জুল

ফুজ্জার যুদ্ধের বীভৎসতা ও সহিংসতা দেখে তাঁর মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ল। তিনি আর্ত-গীড়িত, অসহায়, গরিব, দুর্বল ও অত্যাচারিতকে জালিয় ও ধনীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে এবং আরবে শান্তি বজায় রাখার জন্যে কতিপয় শান্তিপ্রিয় যুবকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন ইতিহাসে এটি হিলফ-উল-ফুজ্জুল বা ‘শান্তি সংঘ’ নামে পরিচিত। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল-

১. নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করা
২. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা ও অত্যাচারীকে বাধা দেয়া
৩. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা
৪. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা
৫. বিদেশি বণিকদের ধনসম্পদের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করা ইত্যাদি।

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর বিবাহ :

হিলফ-উল-ফুজ্জুলের মাধ্যমে মানব কল্যাণকামী হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি নিজেকে এ সংঘের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করার সুর্ব সুযোগ লাভ করলেন। সকলের কাছে তাঁর সরলতা, সততা, সত্যবাদিতা, বিশুন্ততা ও চারিত্রিক গুণাবলির কথা আলোচিত ও প্রশংসিত হতে লাগল। এ সুনাম কুরাইশ বংশের এক বিধবা নারী বিবি খাদিজার কাছেও পৌছল। বিবি খাদিজা বিপুল ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। অপরদিকে ঝুপে, গুণে ও বংশের মর্যাদায় তিনি হিজাজের মধ্যে অবিতীয়া ছিলেন। চরিত্রের পবিত্রতা ও স্বাতারিক শুন্দ্রাচারের জন্যে বিবি খাদিজা আরব দেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এজন্য মকাবাসীরা তাকে ‘খাদিজাতুত তাহিরা’ বা নিষ্কলঙ্ক খাদিজা নামে অভিহিত করেছিল।

বিবি খাদিজা হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কে প্রথমে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ক্রমশ তাঁর চরিত্র মাধুর্য, সত্যবাদিতা ও বিশুন্ততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) খাদিজাকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং বিবি খাদিজার

বয়স ছিল ৪০ বছর। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) দীর্ঘ ২৫ বছর কাল বিবি খাদিজার সাথে সংসার ধর্ম পালন করেন এবং খাদিজার জীবনক্ষণায় তিনি অন্য কোনো ঝীঁ গ্রহণ করেন নি। খাদিজার গর্তে হ্যরতের তিন পুত্র হ্যরত কাসেম, আবদুল্লাহ তৈমুর ও তাহের এবং চার কন্যা হ্যরত ফাতেমা, ওরকাইয়া, কুলসুম এবং যমলাবের জন্য হয়েছিল। তিন পুত্র শৈশবেই মারা যান কিন্তু কন্যাগুলি জীবিত ছিলেন। ওরকাইয়া এবং কুলসুমের সাথে হ্যরত উসমান (রা.)-এর বিবাহ হয় সেজল্য হ্যরত উসমানকে যুননুরাইন (رَوْدُ النُّورِ) বা দু'জ্যোতির অধিকারী বলা হয়। সর্ব কনিষ্ঠা মেয়ে ফাতিমার সাথে হ্যরত আলী (রা.)-এর বিবাহ হয়। আবু তালিবের অসচ্ছলতার জন্য হ্যরত আলী মুহাম্মদ (স.) এর গৃহে লালিত-গালিত হন।

বিবি খাদিজার সাথে বিবাহ বশ্যনে আবশ্য হওয়ায় হ্যরত মুহাম্মদ (স.) জীবনধারণের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নি। ঝী বিভূতিশালী হওয়ায় ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে, স্থির চিত্তে, সুস্ক্রিতে চিন্তার অবকাশ ও সুযোগ ঘটে। হ্যরতের নবৃত্তের বিকাশ ও সার্থকতার জন্য বিবি খাদিজার সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

মকার কাবাঘর পৃথিবীব্যাপী চির প্রসিদ্ধ। এর নাম বাইতুল্লাহ (بَيْتُ اللَّهِ)। এ গৃহটি হ্যরত ইবরাহীম (আ.) এর সময় হতেই বিশ্বের সর্বপ্রধান এবাদত খানা রূপে পরিগঠিত ছিল। মানুষ আল্লাহকে ভূলে গিয়ে অর্থ-কুস্তিকারের মোহে পড়ে এই পবিত্র গৃহে বহু দেব-দেবীর মৃত্তি স্থাপন করা সঙ্গেও একে আল্লাহর ঘর হিসেবে বিশুস্থ করত। কাবা গৃহটি সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলে কুরাইশ বংশের সকল শোত্র একত্রিত হয়ে নতুন করে কাবাগৃহ নির্মাণ করতে সংকলবন্ধ হয়। তাঁরা সকলে মিলে কাবা গৃহের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেন। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ বা কাল পাথরটি কে যথাস্থানে স্থাপন করবেন তা নিয়ে যথা বাক-বিভুতের সূচিটি হয়। পাথরটির সাথে সামাজিক মর্যাদা ও বৎসরগত প্রাথান্তের বিষয় সম্পৃক্ত ছিল। প্রত্যেক গোত্রের লোকই দাবি করতে লাগল যে, তাঁরাই পাথরটি স্থাপনের একমাত্র অধিকারী। প্রথমে বচসা, অতঃপর তুমুল হন্দ কলহ শুরু হল। এভাবে চারদিন অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু মীমাংসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তখন আরবের চিরাচরিত প্রথানুসারে সকলে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। যুদ্ধ যখন একেবারে অনিবার্য হয়ে পড়ল, তখন জানবৃদ্ধি আবু উমাইয়া সকলকে আহবান করে বললেন, স্থির হও, স্থির হও, আয়ার কথা শোন। বৃদ্ধের গভীর মর্ম বেদনপূর্ণ গম্ভীর আহানে সকলে ফিরে দাঁড়াল। তখন তিনি সকলকে বুঝিয়ে বললেন এবং প্রস্তাব দিলেন : “যে ব্যাক্তি আগামীকাল সর্বপ্রথম কাবা গৃহে প্রবেশ করবে তিনিই এ বিবাদের ফসলালা দেবেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সকলেই তা মেনে নিবে।” এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হল। প্রথম আগন্তুক আগমনের প্রতীক্ষায় সকলেই উদ্বৃত্তি বর্তালেন এবং কাবা ঘরের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন।

এমন সময় শতকটী আনন্দ রোল উঠল এইত আমাদের ‘আল-আমীন’ উপস্থিতি। আমরা সকলেই তাঁর শীমাংসায় সম্মত। হ্যরত তখন তাদের মুখ থেকে সকল ঘটনা শুনলেন এবং নিজের বৃদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি তাঁর সমাধান দিলেন। তিনি একখানা চাদর বিহিনে নিজে পাথরটি এর যথস্থলে স্থাপন করেন এবং বিদ্যমান সকল গোত্রের প্রতিনিধিগণকে বললেন এবার আপনারা প্রত্যেকেই এর চাদরের এক প্রাপ্তি ধরে পাথরটিকে যথাস্থানে নিয়ে আসুন। সকলেই তা করলেন। তখন হ্যরত মুহাম্মদ (স.) পুনরায় পাথরটি নিজ হাতে ভূলে যথাস্থানে বসালেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ নবুয়ত লাভ

বিবি খাদিজার সাথে বিয়ের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) আর্থিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে প্রতি বছর একমাস মকার অন্দরে হেরো নামক পর্বতের গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দের রমযান মাসের ২৭ তারিখে হেরো গুহায় হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে ওহী প্রাণ্ত হন। এই আলোকিক ঘটনার কথা জানতে পেরে বিবি খাদিজা তাঁকে যথেষ্ট সাহস, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করেন। হযরত খাদিজা (রা.) রসুল (স.) এর নিকট পূর্বাপর সকল ঘটনা শুনে নবুয়তের ঘটনা বিশ্বাস করে মুসলমান হলেন। তিনিই মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমান গ্রহণকারী।

নবুয়ত লাভের মধ্যাদিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল। নবুয়ত প্রাপ্তির পর হযরত মুহাম্মদ (স.) বিপথগামী পৌত্রিক মকাবাসীর নিকট ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি যোষণা করেন আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রেরিত রাসুল। তিনি আরও বলেন ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং আল-কুরআন মানুষের হিদায়াতের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স.) সত্য প্রচারে ব্রতী হলেন। প্রথম তিনি বছর গোপনে প্রচারকার্য চালাতেন। সর্বপ্রথম মুসলমান হলেন তাঁর সহধর্মী হযরত খাদিজা (রা.)। তারপর মুক্ত শোলাম হযরত যায়েদ, হযরত বিল্লাল, হযরত উসমান, হযরত আবদুর রহমান, হযরত সাদ, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর প্রযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ ও আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

পবিত্র কুরআন অবতরণ

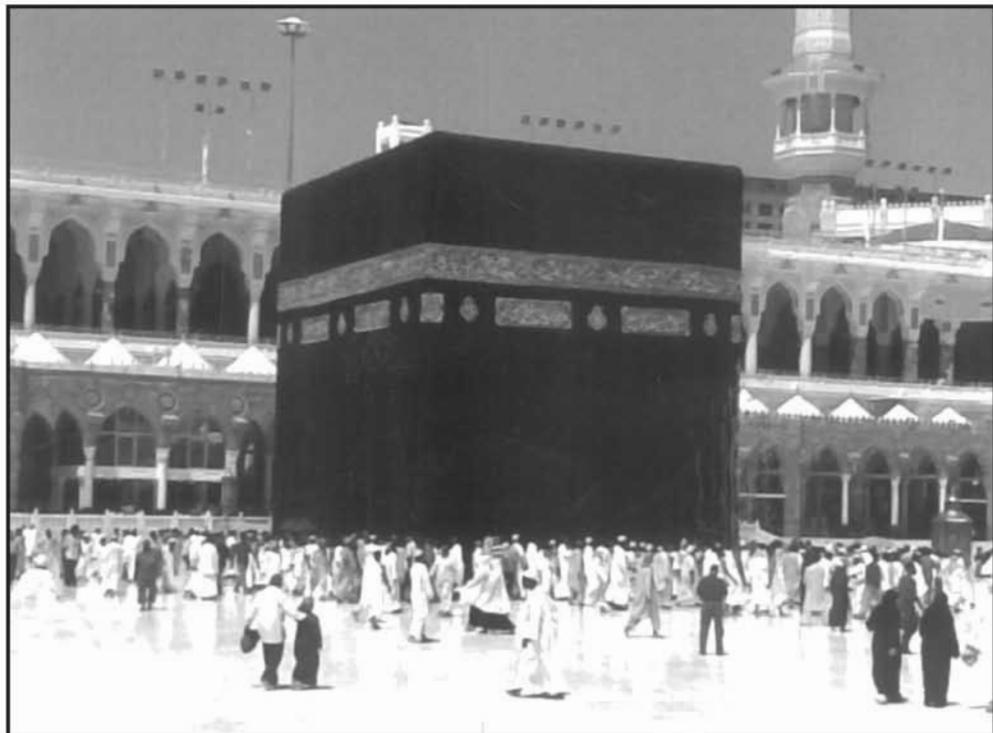
মহাপ্রথম আল-কুরআন ইসলামী জীবন দর্শনের মৌল উৎস ও মহান আল্লাহর বাণী। এটি দুনিয়ার প্রচলিত কোন ধর্মীয় পৃষ্ঠক বা মানব রচিত কোন গ্রন্থের মত গ্রন্থ নয়। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের জন্য তাঁর মনোনীত শ্রেষ্ঠবান্দা ও সর্বশেষ রসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার প্রক্ষেপণে অবতারিত প্রত্যক্ষ ওহির সমষ্টি। যা নবি জীবনের সুনীর্ধ ২৩ বছর ব্যাপী নাখিল হয়েছিল। এটি ইসলামি শরিয়তের মূলনীতি, সমগ্র বিধি-বিধানের উৎস। এর ভাষা সহজ, সাবলীল, মর্মস্পর্শী অলংকারময় ও অনুপম। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি পবিত্র কুরআন নাখিলের পূর্বে এটা লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত ছিল। মহান আল্লাহ বলেন “নিশ্চয়ই ইহা সমানিত কুরআন, লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।” (ওয়াকিয়া: ৭৯)

মহানবি (স.)-এর প্রতি কুরআন নাখিলের পদ্ধতি

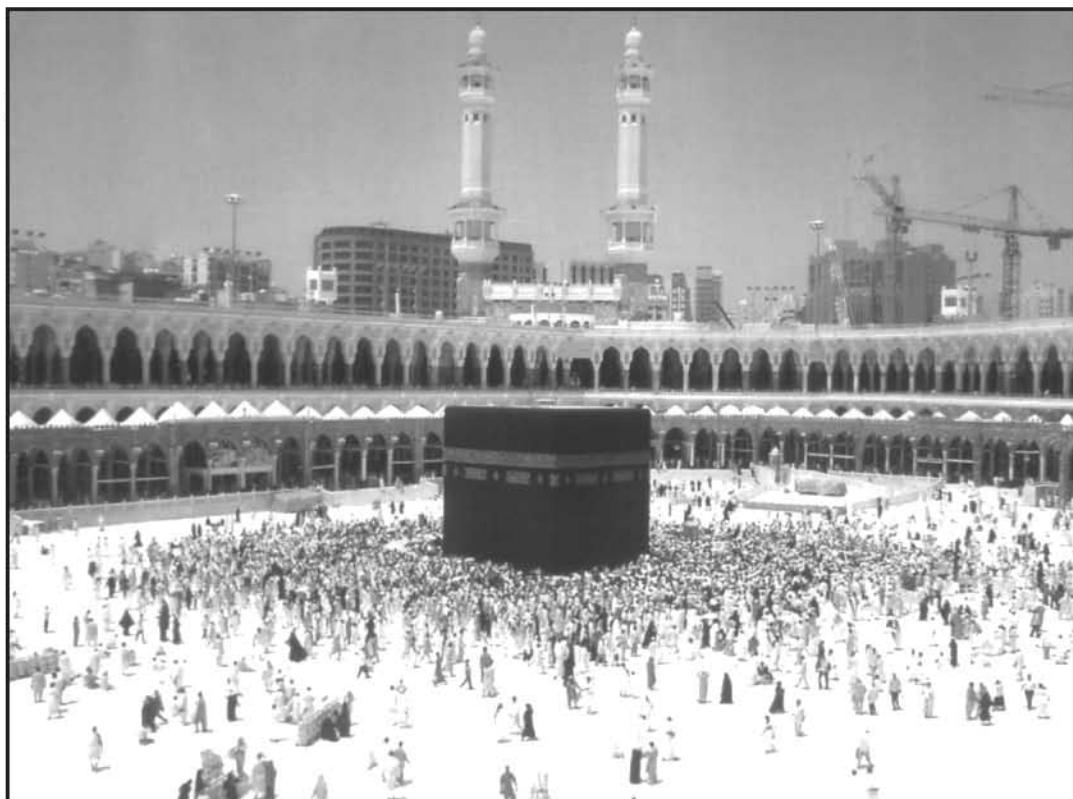
পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী জানা যায় যে, কুরআন মাজিদ হযরত জিবরাইল আমীন (আ.) এর মাধ্যমে মহানবি (স.)-এর কাছে অবতীর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- “এই কুরআন তো বিশ্ব প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশৃঙ্খলা ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছেন।” (সুরা : ১৯২-১৯৩) আল্লাহ পাক আরো বলেন- “রঞ্জুল কুদুস তথা পবিত্র আল্লাহ ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রভুর নিকট হতে সঠিকভাবে এটা আনয়ন করেছেন।” (১৬:১০২)

প্রথম পর্যায়ে 'লাওহে মাহফুজ' থেকে সম্পূর্ণ কুরআন মজিদ একই সাথে নাবিল হত রমবান মাসের কদর রজনীতে পৃথিবী সহলগু আসমানে তখা বাইতুল ইয়বাতে। এ অর্থে আল্লাহ বলেন- "নিচ্ছই আমি কুরআনকে কদর রজনীতে নাবিল করেছি।" (সূরা কদর : ১)। মহানবি মুহাম্মদ বলেন- "লাওহে মাহফুজ হতে কুরআন মজিদকে প্রথমে পৃথিবীর আকাশে বাইতুল ইয়বাতে রাখা হয়। হ্যরত ইবনে আবাস (রা.) বলেন- "কদর রজনীতে সম্পূর্ণ কুরআন পৃথিবীর আকাশে এক সঙ্গে অবর্তীর্ণ হয়।" অতঃপর প্রয়োজনের প্রকাশটে তথা হতে ফেরেশতা জিবরাইল (আ)-এর মারফতে প্রকাশ্যে ওহি বোগে মহানবি (স)-এর প্রতি দুনিয়াতে অবর্তীর্ণ হয়। নবি ঝীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানব জাতির প্রয়োজনের তাকীদে অবস্থার ও ঘটনার পরিস্থিতিতে কুরআনের আয়াত ও সূরা পর্যায়ক্রমিকভাবে অবর্তীর্ণ হয়। এটা অন্যান্য আসমানী কিভাবের মতো এক সঙ্গে সম্পূর্ণ নাবিল না হওয়ার তৎপর্যও রয়েছে।

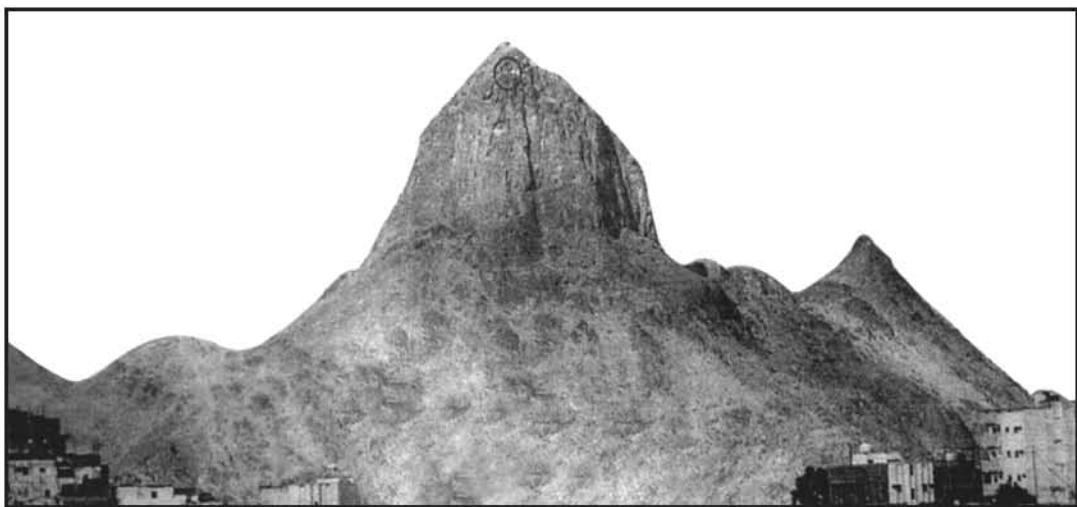
সর্বস্থম ৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবি কারিম (স)-এর ৪০ বছর বয়সে 'জাবালুন নূর' এর হেরাগুহায় লাইলাতুল কদর রজনীতে' সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত অবর্তীর্ণ হয়। তখন তিনি হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন।



চিত্র : মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কাবা শরীফ



চিত্র ৪: মকাম অবস্থিত পবিত্র হেরেম শরীফ



চিত্র ৫: হেরা পর্বত

তারপর প্রায় ২৩ বছর পূর্বে কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ খড়কারে নাফিল হতে থাকে। অবস্থা, প্রয়োজন ও বিভিন্ন ঘটনার প্রক্ষিতে মহানবি (স)-এর ২৩ বছর নবৃত্যাতি জীবনে কুরআন অবতরণ হতে থাকে। কুরআন ধারাবাহিকভাবে ২৩ বছর ধরে নাফিল হয়েছিল। প্রথম দিকে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ, পরকালের নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়ক সূরা অবতীর্ণ হয়। অবশেষে হিজরতের পরে অবতীর্ণ সূরা গুলোতে সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে নাফিল হয়েছিল। অবশেষে একাদশ হিজরির শেষ লগে বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে সূরা মায়দার এ আয়াত নাফিলের মাধ্যমে কুরআন নাফিল সমাপ্ত হয়।

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধানের পরিপূর্ণতা দান করলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবনব্যবস্থারূপে মনেনীত করলাম”। (মায়দা : ৩)

ইসলাম পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ার কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও পরিস্থিতির প্রক্ষিতে কুরআন খড়কারে সুনীর্ধ ২৩ বছর ব্যাপী পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা ঐশীবাণী কুরআনকে আয়ত্ত করা, বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের জবাব, উচ্চত পরিস্থিতির মোকাবিলা, কুরআনের প্রতিটি নির্দেশের উপর আমল করার সুবিধার্থে এবং সর্বোপরি কুরআনের যথাযথ মর্ম অনুধাবন করা সহজ নয়, সে কারণেই কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছরে পর্যায়ক্রমে খড়কারে অবতীর্ণ হয়। আর তা সাথে সাথে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। মহানবি (স) সে আলোকে সমাজ বির্দিশ করেন এবং কুরআনের সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করেন।

এই কুরআনে ১১৪ টি সূরা, ৬২৩৬ টি আয়াত, ৭৭,৯৩৪ টি শব্দ এবং ৩,২৩,৬২১ টি অক্ষর আছে। মকায় ৯২ টি সূরা এবং মদিনায় ২২ টি সূরা অবতীর্ণ হয়। কুরআন শরীফ তার ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা, উৎপেক্ষণ, ছন্দ-মূর্ছনা, রচনা শৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস-দ্যোতনা সব ঘরে এক অতুলনীয় ও অনুপম শাশ্বত সাহিত্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

তিনি বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করার পর হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রকাশ্যে ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাঁর ওপর আদেশ হয়- “আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ প্রদান করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে জনগণকে শুনিয়ে দিন। আর এ ব্যাপারে মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।” এ নির্দেশ পেয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) মকায় অদূরবর্তী ছাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং সকল গোত্রের সর্দারদের উদ্দেশ্যে বলেন :- “হে কুরাইশগণ! আজ যদি আমি বলি এই ছাফা পর্বতের পশ্চাতে একদল প্রবল শত্রু তোমাদেরকে আক্রমণ করার অপেক্ষায় রয়েছে, তবে কি তোমরা সে কথা বিশ্বাস করবে? সকলেই জবাব দিল নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। কারণ এ পর্যন্ত তুমি কখনও আমাদের সাথে যিথ্যাকথা বলনি। এরপর তিনি বললেন “আমি একথা বলি যে, তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আরোপিত হবে”। এ কথা শুনে তাঁর পিতৃব্য আবু লাহাবসহ সকলেই ক্রোধে অগ্নিশৰ্মা হয়ে গেল।

প্রকাশ্যে প্রচারণার ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু মকাব কুরাইশগণ তীব্র বিরোধিতা শুরু করে এবং তাঁর ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন চালাতে শুরু করে। আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব, আবু জাহল প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তার বিরোধিতা করতে থাকে। কুরাইশরা হযরতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস শুরু করে। তাঁকে তারা ধর্মদ্রুই পাগল আখ্যা দেয়। পাথর ছুঁড়ে আঘাত ও আর্বজনা ফেলে অপমান ও লাঞ্ছিত করে। কিন্তু তিনি ও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণ তাদের বিশ্বাসে আঁটল এবং অনড় থাকেন। প্রলোভন, অত্যাচার এবং নির্যাতনে কোনো ফল না পাওয়ায় তারা মুসলমানদের ওপর উৎপীড়ন ও নির্যাতন বৃদ্ধি করে।

কুরাইশদের বিরোধীতার কারণ

কুরাইশদের বিরোধীতার ঐতিহাসিকগণ যে সব কারণ নির্দেশ করেছেন তা হলো—

১. তোহিদের আদর্শ কুরাইশদের নীতি বিরুদ্ধ ছিল : হয়রত (স) কর্তৃক প্রচারিত ইসলামের মূলতন্ত্র তোহিদ ছিল কুরাইশদের নীতি বিরোধী। তারা ছিল মূর্তিপূজক। জড়বাদ ও পৌত্রলিঙ্গতায় বিশ্বাসী বলে তারা মূর্তিপূজা বর্জন করতে পারে নি। নিরাকার এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছিল তাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে পরকালে বিশ্বাস ও পুরস্কারের আশ্বাস তাদেরকে বিভ্রান্তিতে নিপত্তি করে। তাই একশুরবাদী ইসলামের বিরোধিতা করে সমূলে ধৰ্মস সাধনের চেষ্টা করে। তারা বিশ্ব আত্মও পছন্দ করত না। সমাজে উচ্চ-নীচের ব্যবধান ছিল অনেক। বংশ গৌরব ও অভিজাত্যকেই তারা প্রাধান্য দিত।

২. ইসলামের আদর্শ ছিল কুরাইশদের স্বার্থ বিরোধী : হয়রত মুহাম্মদ (স.) আরবদের বংশগত আভিজাত্য ও কৌলিগ্যের উপর কৃঠারাধাত করে সমাজে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। ইসলামের সামাজিক সাম্য স্থাপনের প্রচেষ্টা কুরাইশদেরকে বিক্ষুন্ধ করে তোলার প্রধান কারণ ছিল। তারা মনে করেছিল ইসলাম তাদেরকে কৌলিগ্য ও পৌরহিত্যের অধিকার থেকে বাধ্যত করবে। কুরাইশগণ তাদের দীর্ঘদিনের অন্যায় ও অবৈধ সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ এবং পুরোহিত শ্রেণির ওপর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করে। মক্কার শাসকগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের শিক্ষার প্রতি তত্ত্বে বিরূপ ছিল না—যতখানি বিরূপ ছিল ইসলামের ভবিষ্যত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের প্রতি।

৩. অর্থনৈতিক কারণ : কাবার ঘরের পৌরহিত্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে কুরাইশদের প্রচুর অর্থাগম হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। হয়রত মুহাম্মদ (স.) এর প্রচারিত একেশুরবাদ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে এবং ইসলামি অনুশাসন প্রয়োগ করলে মক্কাবাসী কুরাইশদের অর্থেপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এই আশঙ্কায় তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছিল।

আবসিনিয়ায় হিজরতের শুরুত্ব

আবসিনিয়ায় প্রথম ও দ্বিতীয় বার হিজরত করে মুসলমানগণ প্রমাণ করলেন যে, সত্য ধর্ম ইসলামের জন্যে তাঁরা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত রয়েছেন। হিজরতের মাধ্যমে মুসলমানগণ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ধর্মের জন্যে দেশত্যাগ এবং জীবন বিসর্জন দিতেও তাঁরা সদা প্রস্তুত, আবসিনিয়ায় হিজরত করে তাঁরা তা-ও প্রমাণ করলেন। আবসিনিয়ায় তাঁদের দুর্দিনের জন্যে নিরাপদ আশ্রয় স্থল হিসেবে পরিগণিত হল। তাছাড়া এটা মদিনায় হিজরতে সূচনা ও পূর্বাভাস ছিল। মদিনাবাসীগণ হয়রতকে আশ্রয় দিতে রাজি না হলে এবং আল্লাহর প্রত্যাদেশ না পেলে হয়রত (স.) হয়ত আবসিনিয়াতেই হিজরত করতেন। কাজেই মুসলমানদের আবসিনিয়ায় হিজরতের শুরুত্ব অপরিসীম।

কুরাইশদের বয়কট

হ্যরতের নবৃত্তি শান্তের উপরে ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশগণ ইসলামে দীক্ষিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে বয়কট মীতি প্রচলন করল। কারণ, মুসলমানগণ আবিসিনিয়ার গমন করে নির্বিশ্বে নিজেদের ধর্ম কর্ম করছে। নাঞ্জাশীর নিকট দৃত প্রেরণ করেও কোনো সুফল পেল না বরং নিরাশ হয়ে মকাবি ফিরে এল। কুরাইশগণ নিজেদের মুসলমান হওয়ার বিষ্য সহবাদ রটিয়ে যে সব মতলব এটেছিল তাও ব্যর্থ হয়ে গেল। তাদের সকল যত্ন যত্ন ও চেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হওয়ায় কুরাইশ দলপতিগণের ক্রোধের সীমা অতিক্রম হয়ে গেল। উপরন্তু তারা দেখতে পেল যে হ্যরত হাম্মদ (রা) ও হ্যরত উমর (রা) এর ঘোষণা প্রতিষ্ঠিত বীর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ইসলাম প্রহণ করেছেন। এতে তাদের ক্ষোভ, দৃঢ়ত্ব, ক্রোধ ও অভিমান প্রচড় আকার ধারণ করল। তাই তারা একদিন সমস্ত কুরাইশদের একটি পরামর্শ সভায় সমবেত করল। সকলে একত্র হয়ে এক প্রতিজ্ঞাপত্র তিপিবন্ধ করল।

কুরাইশদের প্রতিজ্ঞা প্রয়োচন : হাশেম ও মুত্তালিব গোত্রের সহায়তার ফলেই মুহাম্মদ (স.) এর স্পর্ধা এত দূর বেড়ে গেছে। অতএব, তাদেরকে এবং মুহাম্মদ ও তাঁর দলে দীক্ষিতদেরকে একদম বয়কট করতে হবে। তাদের সঙ্গে বেচা-কেনা, সামাজিক সেনদেন, কথা-বার্তা সব কিছু বন্ধ ধাকবে। কেউ তাদের কল্যাণ প্রহণ বা তাদেরকে কল্যাণ দান করতে পারবে না। কেউ তাদেরকে কোন অবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করলে, সে কঠোর দণ্ডের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ষেছায় মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য আমাদের কাছে সমর্পণ না করবে ততদিন এ প্রতিজ্ঞা পত্র বলবৎ থাকবে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা শিরু আবি তালিব-এ (شیخُ طالب) মহানবিকে তিনি বছর বন্দি করে রাখে।

অতঃপর কুরাইশগণ হাশেম ও মুত্তালিব গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও বর্জননীতি প্রয়োগ করে তাদেরকে সমাজচূড় করে। এই চরম সংকটাপন্ন অবস্থায়ও মুসলমানগণ তাঁদের ইয়ান ও মনোবল অটুট রাখেন। অবশেষে কুরাইশগণ তাদের বর্জননীতি প্রত্যাহার করে দেয়। ফলে হাশেম ও মুত্তালিব গোত্রবয়ের লোকজন এবং মুসলমানগণ আবার নিজ নিজ গৃহে ফিরে আসলেন।

আবুল ঝুঁয়ল বা দুষ্টের বছর

নবৃত্তির দশম বছরে ৬২০ খ্রিস্টাব্দে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এক প্রচড় মার্শিক আঘাতে ভেঙ্গে পড়েন। পি঱ি সংকট হতে ফিরে আসার কয়েক দিন পর আবু তালিবের অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারা জীবনের কঠোরতা তাঁর সহ্য হয় নি। তাই তিনি ৮৩ বছর বয়সে ইহলোক ভ্যাগ করেন। তিনিই হ্যরতের বিপদ আগদে একমাত্র আশ্বয়দাতা ছিলেন। কুরাইশগণ যখন হ্যরতকে তাদের হাতে সৌপর্দ করার জন্যে আবু তালিবকে অনুরোধ করল, তখন আবু তালিব বললেন : এই মসজিদের মালিকের শপথ। আমার আহমদকে কখনও তাদের হাতে সমর্পণ করব না, কালনাগীনী তাঁর সমস্ত ভয়াবহতা দিয়ে দ্রংশন করলেও নহে।

আবু তালিবকে হারিয়ে মহা নবি (স.) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। আবু তালিবের মৃত্যুতে তিনি যেন অসহায় হয়ে পড়লেন। শিশুরা আবু তালিবের মৃত্যুর শোক দ্রুতে না দ্রুতেই বিবি খাদিজা ও হঠাতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হ্যরত (স.) বুঝতে পারলেন তাঁর জীবন সংজ্ঞাও এবার তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন। চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই বিবি খাদিজা (রা) ৬৫ বছর বয়সে ইত্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল মু আল্লায় দাফন করা হয়।

বিবি খাদিজা (রা.) ছিলেন হযরতের সকল বিপদে আপদে শাস্ত্রনাদানকারী, পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী। তাঁর মৃত্যুতে নবি করিম (স.) এর অস্তর এবং গৃহ শূন্য হয়ে পড়ে। তাঁর শৈশবের আশ্রয় স্থল, যৌবনের অভিভাবক ও পরবর্তী জীবনের কার্যাবলীর একনিষ্ঠ সমর্থক শিত্য আবু তালিবের মৃত্যুতে তিনি শোকে মৃহুমান হয়ে পড়েন। হযরতের বিপদ আপদে ও দৃঢ়সময়ে এ দুর্জন মহাপ্রাণের অনুসম্মতি তাঁর জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। তাঁদের মৃত্যুতে তিনি দৃশ্যিত ও ব্যক্তি হন। এজন্য বছরটি আ'মূল হৃষ্ণ (৩৫২) বা দুঃখের বছর নামে খ্যাত।

হযরত (স.) এর তামেক গমন

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা.) ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশদের অভ্যাচারের পথ একেবারে নিষ্কটক হয়ে যায়। ফলে তাঁরা রাসূল (স.) এর উপর অভ্যাচারের মাঝে আরো বাড়িয়ে দিল। নরাধমগুল প্রায়ই তাঁর গৃহস্থের কাঁটা বিছিয়ে রাখত। হযরত যখন কাবাঘরের সামনে নামায়রত থাকতেন, তখন নরাধম কুরাইশীরা কখনো উটের নাড়িজুঁড়ি কখনো বা সদ্য়প্রসূত ছাগির ফুল তাঁর মাথার উপর চাপিয়ে দিত। এবুপ ঘটনা বহুবার ঘটেছে। একদিন হযরত নামায়ে ময়ু হয়ে আছেন দেখে শুক্রা নিজের চাদর দড়ির মত করে তা হযরতকে শৌচিয়ে অনবরত মোড়াতে থাকত। এর ফলে হযরতের ঘাড় বেঁকে শুস কল্প হওয়ার উপক্রম হয়। ঘটনাক্রমে সে সহয় হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে কোনোক্ষে রক্ষা করেন। এবুপ তাবে প্রতিক্রিয়া তাকে লাঞ্ছন ও নির্বাচন চালাতে থাকত। কখনো কখনো দল বেঁধে গোকজম তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত ও গাল দিত। কখনও তাঁর খাদ্য দুর্ব্যে জীব-জন্মের মলমৃত্য মিলিয়ে দিত। কখনো বা স্থৃত্য আবর্জনাদি তাঁর দেহে নিষ্কেপ করত। এমনিভাবে তাঁরা হযরতকে কষ্ট দিতে লাগল।

পিতৃবৈর বিয়োগ, সহখর্মিনীর বিচ্ছেদ, মাতৃহারা কন্যাগশের বিষাদময় প্লান-মুখ, সর্বোপরি নরপিশাচগশের এ সকল অকর্ত্ত্য অভ্যাচার, সরকিছুর একত্র সমাবেশে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি ভক্ত ও পালিত গুরু হযরত যায়েদকে সঙ্গে নিয়ে সত্য ধর্ম প্রচারের মানসে তায়েফ যাত্রা করার জন্য স্থির করলেন। মক্কা থেকে ৭০ মাইল দূরে তামেফ নগরী অবস্থিত। সেখানে গমন করে তিনি দশদিন অবস্থান করে তামেফবাসীদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনন্দের চেষ্টা করেন। কিন্তু নির্বেথ নগরবাসী তাঁর আহানে কর্ণপাত না করে তাঁকে নির্মতাবে লাজ্জিত ও প্রস্তরাদাতে রক্ষাকৃত করে তাড়িয়ে দেয়।

হযরত (স.) পথে বের হলে তাঁরা হৈ চৈ করে চারিদিকে সমবেত হতে থাকত। গথ চলতে লাগলে ইট পাথর মারতে মারতে তাঁর পিছু ছুটত। অনেক সময় তাঁরা পথের দুখারে সারি বেঁধে বসে পড়ত এবং প্রত্যেক পদ নিষ্কেপে হযরতের চরণ যুগলের উপর দুদিক থেকে প্রস্তুর বর্ষণ করত। ফলে হযরতের পদবয় রক্তে রঙিত হয়ে যেত। এহেন নৃশংস অভ্যাচারেও হযরতের হৃদয় একটুও দমিত হয়নি।

তামেফবাসীগণ হযরতকে এত কষ্ট দেয়া সম্মেলন তিনি তাঁদের উপর অসম্মত হন নি। বরং তাঁদের জন্যে দোয়া করেন— হে আশ্রাহ, হে আমার প্রতু! অপরাধীরা আজ বুবে না যে পুরুষের অপরাধ করেছে, সেজন্যে তুমি দয়া করে তাঁদেরকে শান্তি দিও না, বরং ক্ষমা করে দাও। তাঁদের কোনো দোষ নেই। সে আমারই দুর্বলতা, আমারই অক্ষমতা। এ দুর্বলতার জন্য তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

মক্কা থেকে তায়েফ গমন করেও রাসূল (স.) তামেফবাসীদের অভ্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসলেন। মক্কার অনতি দূরে নাখলা স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে লাগলেন। নাখলায় উপস্থিত হলে হযরত যায়েদ তাঁকে মক্কার কুরাইশদের অভ্যাচারের কথা শরণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁদের বিকল্পে প্রতিকার করার পরামর্শ দিলেন। তাই হযরত (স.) সরাসরি মক্কায় প্রবেশ না করে মৃত্যুই ইবনে আদীর আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আরবের প্রধানসূরে মৃত্যুই হযরতকে আশ্রয় দিয়ে মক্কায় পৌছে দেন।

কাফেররা হ্যরতকে কিছুই বলে নি। মুতাইম-এর এ উপকারের কথা হ্যরত চিরকালই কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করেছেন। হ্যরত (স.) মুতাইম ইবনে আদীর আশুয়ে আসার পর আরও ব্যাপক আকারে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ আরঞ্জ করেন। সাধারণ জনসভায় ও হজের সময় সমাগত লোকদের নিকট ইসলামের বাণী পৌছাতে থাকেন।

হ্যরত (স.) এর মিরাজ শরীক গমন

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর সংগ্রামী জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর, তাৎপর্যপূর্ণ ও আলোকিক ঘটনা হল মিরাজ। এ প্রসঙ্গে আমীর আলী বলেন, মহানবি (স.) তাঁর প্রিয়তমা জীবন সঞ্জিনী বিবি খাদিজাতুল কুবরা (রা.) ও পিতৃব্য আবু তালিবকে হারিয়ে যখন শোকে মুহাম্মদ হয়ে পড়লেন, তখন আল্লাহ তায়ালা মহানবির হৃদয়ের সুপ্ত বেদনগুলো প্রশংসিত করার জন্য ৬২০ খ্রিস্টাব্দে নবুয়তের দশম বছরে রজব মাসের ২০ তারিখে সোমবার নবি (স.) কে নিজের একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে যান। সোমবার দিবাগত রাতে রাসুল (স.) জমজম ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে ঘূর্মিয়ে ছিলেন, জগ্রত হয়ে দেখেন জিবরাইল (আ.) কর্তৃক আনিত বোরাকে ঢেকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় গমন করেন। সেখানে গিয়ে রাসুল (স.) ওয়ু করে নেন এবং সকল নবি ও রাসুলদেরকে সাথে নিয়ে নিজ ইমারিততে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তারপর রাসুল (স.) বোরাকে ঢেকে জিবরাইল (আ.) এর সাথে উর্ধ্বাকাশে গমন করে একেক করে প্রত্যেক আকাশে প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথে কথোপকথন শেষ করে সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে পৌছলেন। তখন জিবরাইল (আ.) রাসুল (স.) কে প্রার্থনার সুরে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.), আমি আর এক বিন্দু সামনে অগ্রসর হতে পারব না। কেননা অগ্রসর হলে আল্লাহর নূরের তাজাহ্লীতে আমি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব। তখন রাসুল (স.) জিবরাইল (আ.) ও বোরাক ত্যাগ করলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর তায়ালার পক্ষে হতে রফরফ নামক বোরাক এসে রাসুল (স.) কে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। তখন রাসুল (স.) এবং আল্লাহ তায়ালার মধ্যে সালাম ও কুশলাদি বিনিময় শেষে আল্লাহতায়ালা তাঁর হাবীবকে জাহাত ও জাহানাম পরিদর্শন করান। সর্বশেষ উচ্চাতে মুহাম্মদীর জন্য ৫ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ নিয়ে রাসুল (স.) পুনরায় ফিরে আসেন। হ্যরতের এই অবশেষ মাত্র রাতের কিয়দাংশ সময় ব্যয় হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় রাসুল (স.) এর মিরাজ স্বশরীরে হয়েছিল। আর এ ঘটনাটি শোনামাত্র সর্বপ্রথম বিশ্বাস করেছিলেন হ্যরত আবু বকর (রা.)। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে অদ্য পর্যন্ত এবৃপ্ত অভিনব ঘটনা আর দ্বিতীয়টি কখনো হয় নি, হবেও না। ফলে মিরাজের মাধ্যমে মানব জাতির হিদয়তের জন্য এক অপূর্ব বৈপ্লাবিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

অর্টম পরিচ্ছেদ মদিনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার

হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) যখন কুরাইশদের নিকট ইসলাম প্রচার করে নিরাশ হলেন তখন তিনি আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন গোত্র হতে মকায় হজ্জের উদ্দেশ্যে এবং বাণিজ্যের জন্যে যারা আসত তিনি তাদের কাছে গমন করে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। সে সময় মদিনায় আরবের দুটি বিখ্যাত গোত্র আউস ও খাজরাজ বসবাস করত। তাদের আদিবাস ছিল ইয়ামেন। আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। আউস ও খাজরাজের গোত্রের লোকেরা শেষ নবির আগমনের কথা জানত এবং তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা একজন নেতারাও সন্ধান করতেছিল। তাঁরা মদিনার ইহুদিদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে, শেষ নবির আবির্ভাবের সময় সমাগত।

আকাবার প্রথম শপথ

নবুয়তের দশম বছরে হজ্জের মৌসুমে খাজরাজ গোত্রের কয়েকজন লোক মুক্ত এসে শুনতে পেল যে, এক ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করছেন। যাকা হতে একটু দূরে আকাবা নামক স্থানে হয়জন লোক আলাপ-আলোচনা করছিলেন। হ্যরত তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন যে, তাঁরা মদিনাবাসী খাজরাজ বংশীয় লোক। হ্যরত তাঁদেরকে ইসলামের শিক্ষা ও সভ্যতার দিকে আহান করলেন এবং কুরআন শরিফের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে তাঁদেরকে ইসলামের দিকে আহান করলেন। তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় পৌছে আল্লাহর মহত্ব প্রচার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে আকাবার প্রথম শপথ অর্ধাদ বাইয়াত আল আকাবা (بَيْعَةُ الْأَكَابِر) নামে পরিচিত। হ্যরত মুসাব (রা.) নামক এক সাহাবিকে ধর্ম শিক্ষা দানের জন্যে ইয়াসরিব তথা মদিনায় প্রেরণ করলেন। হ্যরত মুসাব (রা.) ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রচেষ্টায় ইয়াসরিবে ইসলাম ধর্মের প্রচার নতুন দিগন্তের সূচনা করে। ইয়াসরিববাসী ষত্যমুর্তভাবে আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাস স্থাপন করে মৃত্যুপূর্বোক্ত ত্যাগ করে।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

নবুয়তের একাদশ বছরে আউস ও খাজরাজ গোত্রের ১২ জন মদিনাবাসী পূর্ব কথিত আকাবা নামক স্থানে হ্যরতের সাথে সাঙ্কাঁৎ করে ইসলামের শপথ গ্রহণ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সময় তাঁদের আবেদনে ধর্মীয় আহকাম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে দুজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এটি আকাবার দ্বিতীয় শপথ নামে খ্যাত।

আকাবার তৃতীয় শপথ

নবুয়তের ষাদশ বছর আকাবার দ্বিতীয় শপথের পর সকলে মদিনায় ফিরে আসেন। সেখানে হ্যরত মুসাব (রা.) ইয়ামতি করলেন। সে বছর হ্যরত মুসাব ও হ্যরত খাইয়েমের (রা.) এর হাতে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে উসায়েদ ইবনে হোয়ায়ের এবং হ্যরত সাদ ইবনে খাইয়াম (রা.) ছিলেন। এ দুব্যাক্তির ইসলাম গ্রহণের ফলে আউস গোত্রের সকল নব-নারী মুসলমান হয়ে যান। এভাবে মদিনায় দ্রুতগতিতে ইসলাম প্রসার লাভ করতে থাকে। এই বছর মদিনায় রাসুলুল্লাহর দুর্খ্যাতি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁদের মধ্যে থেকে ৭৩ জন নারী পুরুষ একসাথে হ্যরত (স.) এর সাথে আকাবা নামক স্থানে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবেন না। তাঁরা ইসলামের আদর্শ ও দ্বীতীয় মেনে চলবেন ও তা রক্ষার জন্যে আপোণ ঢেক্টা করবেন। হ্যরতকে সর্ব প্রকার সাহায্য করতে দ্বিধা করবেন না। সেই সাথে কঠিন শপথের পর হ্যরত রাসুল(স) ইসলাম প্রচার ও দীন তালিমের জন্যে তাঁদের মধ্য হতে বারজন নকীব বা প্রচারক নিযুক্ত করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি আকাবার তৃতীয় শপথ নামে খ্যাত।

আকাবার শপথের মূল বিষয় ৪ হ্যরতের নিকট আকাবা নামক স্থানে মদিনাবাসীগণ ইসলামের সুশীতল ছামাতলে আশ্রয় করে থে প্রতিজ্ঞা করেন তা নিম্নে উন্মুক্ত করা হল :—

১. আমরা এক আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করব, তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ইশাহ বলে শীকার করব না এবং কাউকেও আল্লাহর সাথে শরিক করব না।
২. আমরা চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোনো প্রকারের অন্যায় কাজে শিষ্ট হব না।
৩. আমরা ব্যাপিচারে লিপ্ত হব না।

৪. আমরা কোনো অবস্থায় সন্তান হত্যা বা বলিদান করব না।
৫. আমরা কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করব না।
৬. আমরা প্রত্যেক সৎকর্মে হ্যরতের অনুগত থাকব, কোনো ন্যায় বিচারে অবাধ্য হবো না।

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র

মক্কার কুরাইশগণ যখন জানতে পারল যে, হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আকাবায়ে মদিনাবাসীদের সাথে গোপনীয়তাঁর সাথে শপথ নিয়েছেন এবং তাঁদেরকে মদিনায় ফিরে গিয়ে ধর্ম প্রচার চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরাইশদের শত অত্যাচার, নির্যাতন ও প্রলোভন সন্তোষ যখন তাঁরা হ্যরতকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারে নি তদুপরি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ইয়াসরিববাসীদের আমন্ত্রণে সেখানে চলে যাবার চৃড়াত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং ইয়াসরিবকে নিরাপদ আশ্রয় স্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তখন তারা তাকে হত্যা করার মনস্থ করে। এদিকে মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু হলে তাঁরা ছোট ছেট দলে বিভক্ত হয়ে ইয়াসরিবের দিকে যেতে থাকেন। অবিসিনিয়া হতে প্রত্যাগত ২০০ জন মুসলমানকেও তিনি ইয়াসরিবে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলেন। শুধু হ্যরত আবু বকর (রা.) ও হ্যরত আলী (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে মক্কায় অবস্থান করতে লাগলেন। হিস্রু কাফেররা আবু জাহলের নেতৃত্বে স্থির করে যে, প্রত্যেক গোত্র থেকে এক এক জন যুবক নিয়ে হত্যাকারী দল গঠন করবে। তারা একত্রে তরবারির আঘাতে হ্যরতকে হত্যা করবে। কুরাইশরা তাঁর গৃহ অবরোধ করলে আল্লাহর প্রত্যাদেশে হ্যরত (স.) আলী (রা.) কে সীয় বিছানায় শায়িত করে হ্যরত আবু বকর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে দুটি উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করে তিনি ইয়াসরিব অভিমুখে যাত্রা করলেন। হ্যরতকে গৃহে না পেয়ে মুশারিকরা তাঁর পশ্চাদ্বাবন করলে তিনি হ্যরত আবু বকরসহ পথিমধ্যে সওর নামক পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে তথায় তিনি দিন অবস্থান করেন। গুহায় অবস্থানকালে হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ এবং কন্যা আসমা তাঁদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতেন। চতুর্থ দিনে তাঁরা গিরিগুহা হতে বের হয়ে ইয়াসরিবের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। মক্কা থেকে ইয়াসরিবের দূরত্ব ২৫০ মাইল। পথে অনেক বাধা-বিপর্যস্ত অতিক্রম করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাঁরা ৬২২ প্রিস্টাদের ২৪ সেপ্টেম্বর (১২ রবিউল আউয়াল) তারিখে মদিনার নিকটবর্তী কুবা নামক স্থানে এসে পৌছেন। হ্যরত আলী (রা.) পরে তাঁদের সাথে যোগ দেন। ইয়াসরিবে আগমন করে তিনি এর নাম পরিবর্তন করে মদিনাতুন্নবী বা নবির শহর রাখেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

মক্কা হতে মদিনায় হ্যরতের এ সুপরিকল্পিত প্রস্থানকে ইতিহাসে হিজরত বলা হয়। মক্কা হতে মদিনায় আগমন ইসলামের ইতিহাসে একটি নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। হ্যরতের এই হিজরতকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৭ বছর পর হ্যরত উমর (রা.) চন্দ্র বছরের প্রথম মাস মহররম এর প্রথম দিন (১৬ই জুলাই) হতে হিজরি সালের প্রবর্তন করেন। নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

হিজরতের কারণ

১. প্রাকৃতিক প্রভাব : মদিনা ছিল শস্য-শ্যামল ও উর্বর ভূমি। সেখানে স্বাস্থ্যকর ও সুশীতল আবহাওয়া বিরাজমান ছিল। তাই সেখানকার লোকদের আচার-আচরণ ছিল নম, ভদ্র ও মার্জিত। তাঁরা ছিল দয়ালু ও পরোপকারী। তাই, সেখানে ইসলামের দাওয়াত সহজ ও গ্রহণীয় হবে ধারণা করে রাসুল (স.) মদিনায় হিজরত করেন।

প্রাক-ইসলামি পটভূমি

২. ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ : আউস ও খায়রাজ গোত্রের লোকজন হজের মৌসুমে আকাবায় মিলিত হয়ে হয়রতের নিকট শপথ করে ইসলাম গ্রহণ করলে মদিনায় ইসলামের বিস্তৃতি লাভ করে। এছাড়া, হয়রত মুহাম্মদ (স.) হয়রত মুসআব (রা.) কে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য মদিনায় প্রেরণ করেন। এর ফলে দ্বিতীয় আকাবায় শপথ গ্রহণে কমপক্ষে ৭১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা হয়রতের সাথে মিলিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর মদিনায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি হলে হয়রত মুহাম্মদ (স.) তথায় হিজরত করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

৩. মনস্তাত্ত্বিক কারণ : হয়রত মুহাম্মদ (স.) অতীতের নবি রাসুলদের ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছেন যে কোন নবি-রাসুলই নিষ্কটভাবে তাঁর জন্মভূমিতে দীন প্রচারে সক্ষম হন নি। তদুপরি মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে জুলুম-নির্যাতন সহ্য করা সত্ত্বেও ইসলামের পরিবেশ সেখানে কায়েম হয় নি। তাই তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন হিজরত করার জন্যে।

৪. আভিজাত্য ও কৌলীশ্যের প্রভাব : ইসলাম সমতার ধর্ম। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মুসলমান ভাই ভাই। উচ্চ-নীচ কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু মক্কার কুরাইশদের মধ্যে যে আভিজাত্য ও কৌলিন্য প্রথা মজ্জাগত ছিল তা ইসলামের প্রভাবে উলট-পালট হয়ে যেতে বাধ্য। ঐতিহাসিক যোশেফ হেল বলেন : মক্কার শাসকবর্গ ইসলাম ধর্মের শিক্ষার প্রতি যতধানি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল, তার তুলনায় বেশি বিকল্প ভাবাপন্ন ছিল ইসলাম কর্তৃক আনীত সম্ভাব্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রতি। ইসলামের শিক্ষা হল বংশ, জন্ম, আভিজাত্য বা পৌরহিতের জন্যে মানুষ কোন বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারে না। যে কারণে তারা ইসলামকে গ্রহণ করতে পারে নি। ইসলামের শিক্ষা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ফলে তারা বিরোধীভাবে তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৫. পুরোহিতদের বিরোধিতা : মক্কার পুরোহিতরা ছিল পৌত্রিক। কাবা-গৃহে তখন মূর্তি রাখা হয়েছিল এবং সেগুলোর পূজা হত। তাই, কাবা গৃহের একচত্র অধিকার ছিল মক্কার পুরোহিতদের। মূর্তিপূজার বিরোধী ইসলামের শিক্ষা হল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্ত্বার এবাদত করা যাবে না। মক্কার পুরোহিতদের কায়েমি স্বার্থ-বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা বিরোধিতা করতে থাকে। ফলে সেখানে ইসলামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় হয়রত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন।

৬. ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত : মক্কার কুরাইশরা ধর্মান্ধ হয়ে পূর্ব-পুরুষদের চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানকে আকড়িয়ে ধরে মৃত্তিপূজা করত। তারা মৃত্তিপূজাকে বর্জন করে তাওহিদের বাণীকে গ্রহণ করে আল্লাহর একচতুর্বাদে বিশ্বাসী হতে পারে নি। তাওহীদ পরিপন্থী জড়বাদী ও মৃত্তিপূজা ত্যাগ করার মানসিকতা তৈরি করতে পারে নি। তাই, তারা ইসলামের বিরোধিতা করায় রাসুল(স.) মদিনায় হিজরত করেন।

৭. মুসলমানদের সংখ্যা অঞ্চল : নবৃত্য প্রাপ্তির পর তিনি বছর গোপনে ও ১০ বছর প্রাকাশ্যে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। মানুষ মৃত্তিপূজা ছেড়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে নি। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের উপরেও কুরাইশরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছে। ফলে মুসলমানগণ শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন নি কাফেরদের বিকল্পে রুখে দাঁড়াবার। ইসলামের বিস্তৃতি, শক্তি বৃদ্ধি ও কাফিরদের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যে হয়রত মদিনাকে বেছে নিয়ে হিজরত করেন।

৮. মদিনাবাসীদের ক্ষম্ব নিরসন : মদিনায় যে সমস্ত লোক বসবাস করত তার মধ্যে খায়রাজ এবং আউস গোত্রের প্রসিদ্ধ ছিল। তারা ইয়ামেন থেকে এখানে বসতি স্থাপন করে। অপরদিকে ইহুদি ধর্মাবলম্বী তিনটি গোত্রের লোকজনও এখানে বাস করত। তারা যথাক্রমে বনি কাইনুকা, বনি নাবির এবং বনি কুরাইয়া। আউস এবং খায়রাজ গোত্রের লোকেরা দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত ছিল। তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এবং শান্তি স্থাপনের জন্য একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করতে থাকে। অতপর হয়রতের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সংবাদ পেয়ে তারা তাকে আমন্ত্রণ জানালেন। ফলশ্রুতিতে মহানবি (স.) মদিনায় হিজরত করেন।

৯. প্রভাবশালী অভিভাবক ও জীবন সংজ্ঞানীয় অভিব্যক্তি : নবিজীর চাচা আবু তালিব সব সময় তাঁকে আশ্রয় দিয়ে রাখতেন। আর হয়রত খাদিজা (রা.) তাঁকে সব সময় পরামর্শ ও সাহস যোগাতেন। তাঁদের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়লেন। কুবাইশদের নির্যাতন আরও বহু গুণ বেড়ে গেল। এমনকি তাঁর প্রাণ নাশের ব্যবস্থা পাকাপাকি করা হল। নবিজী জীবনের নিরাপত্তার অভিব্যক্তি বেধ করায় মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন।

১০. ইহুদিদের আমন্ত্রণ ও মদিনার ইহুদিগণ তাওরাত কিতাবের মাধ্যমে জানতে পারল যে, শেষ নবির আবির্ভাব ঘটবে। তাঁরা শেষ নবিকে মদিনায় তাঁদের মধ্যে পাবার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করল। হিজরতের পূর্বেই মদিনায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। মক্কায় কোনো ইহুদি না থাকায় তাঁরা শেষ নবির আবির্ভাবকে মেনে নিতে পারে নি। তাই তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন।

১১. আজীয়তার সম্পর্ক : হয়রত মুহাম্মদ (স.) এর পিতা আবদুল্লাহ ও প্রপিতামহ হাশিম উভয়ে মদিনায় বিবাহ করেন। নবিজীর মাতা বিবি আমিনার দিক থেকে মদিনায় আজীয়-স্বজন রয়েছে। তাছাড়া তাঁর পিতা আবদুল্লাহর কবরও মদিনার উপকণ্ঠে রয়েছে। সব দিক বিবেচনা করে নবিজীর মনে ধারণা জন্মে মদিনাবাসীদের সাহায্য ও সহযোগিতা তিনি লাভ করবেন। তাই তিনি মদিনায় হিজরত করেন।

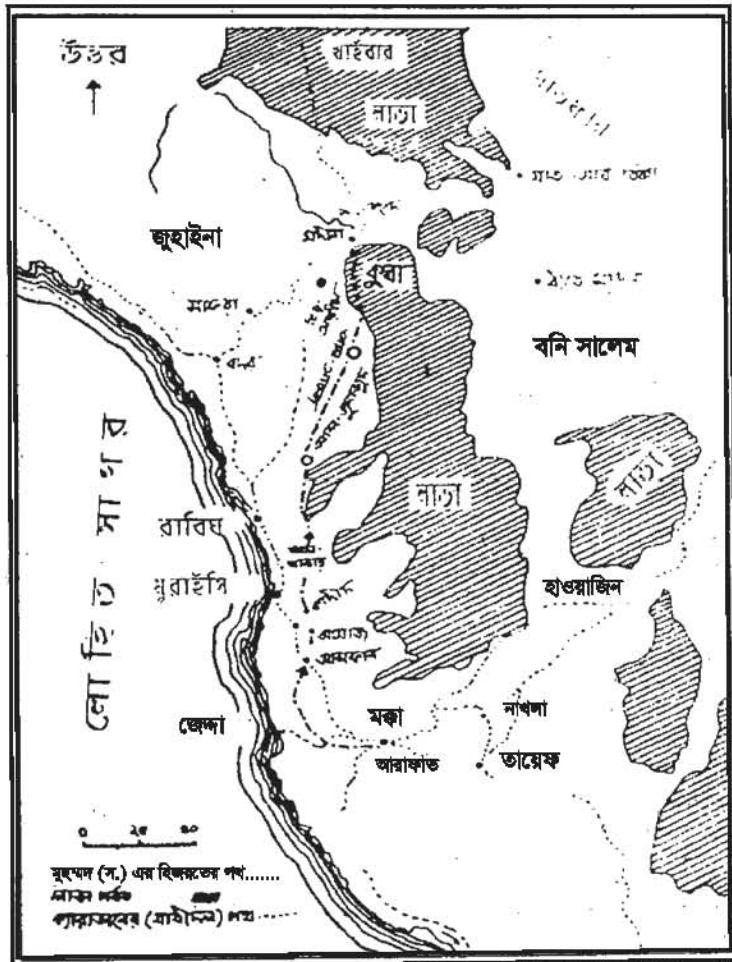
১২. আল্লাহর নির্দেশ : ইসলামের উত্থানকে ঠেকানোর জন্যে মক্কার কাফির পৌত্রলিঙ্গণ নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়েও কোন সুফল না পেয়ে আবু জাহেলের নেতৃত্বে ‘দারুণ নাদওয়ায়’ পরামর্শ সভা ডেকে নবিজীকে হত্যা করার জন্যে হত্যাকারী কমিটি গঠন করে। তখন আল্লাহর প্রত্যাদেশের মাধ্যমে হয়রত মুহাম্মদ (স.) কে নির্দেশ দেয়া হয় হিজরতের জন্যে। সে অনুসারে তিনি রাতের অন্ধকারে হয়রত আবু বকর (রা.) কে সাথে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন।

হিজরতের শুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাস ও মহানবি (স.) এর জীবনে হিজরত এক গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী ঘটনা। ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা ও ইসলামকে সার্বজনীন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল হিজরতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। হিজরতের ফলাফল ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। নিম্নে হিজরতের ফলাফল ও গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. নির্যাতনের অবসান : হিজরতের ফলে হয়রত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁর মক্কা জীবনের লাঞ্ছনা, অবমাননা, ভয়-ভীতি দূর হয়। তিনি নির্বিশেষে ইসলাম প্রচারের সুযোগ লাভ করেন। মদিনায় সমান ও শুল্কার অধিকার হয়ে মদিনাবাসীদের আপনজন হিসেবে বিবেচিত হন। অপরদিক তাঁর জীবনে নেমে আসা দুর্যোগের অবসান ঘটে। তিনি মক্কার পৌত্রলিঙ্গদের নির্যাতন, নিপীড়ন, জুলুম-অত্যাচার ও হতাশার দিনগুলোর অবসান ঘটিয়ে আশা ও আলোর পথ প্রাপ্ত হলেন।

২. সামাজিক ক্ষেত্র : হিজরতের ফলে মদিনায় সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সাধিত হয়। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে নৈতিকতা ফিরে আসে, দুর্বার্তা দূর হয়। খাজরাজ এবং আউস গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘ দিনের বাগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ ও রক্তপাত বন্ধ হয় এবং সমাজে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসে। নবিজী সমাজ থেকে সকল অনাচার-অবিচার দূর করে সমাজকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করেন। সমাজে ইসলামি অনুশাসনের মাধ্যমে সমতা ফিরিয়ে আনেন।



চিত্র : হিজরতের মানচিত্র।

৩. ইসলামের উৎসাহ : হিজরতের ফলে ইসলাম অস্তিত্ব গতিতে প্রসার লাভ করতে থাকে। ইসলাম প্রচারে মহানবি (স) এর উপর কোনো বাধা অবশিষ্ট থাকে নি। ফলে ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম ও জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে শীর্ণতি লাভ করে। যেকাহ ইসলামের প্রসার ছিল ধূবই মন্থর গতিতে এবং কন্টকাকীর্ণ, যেকায় মুসলমানগণ ছিলেন সংখ্যালঘু। আর হিজরতের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মে পরিণত হয়। হযরত মুহাম্মদ (স) প্রকাশ্যভাবে দীন প্রচার ও প্রসারের পরিকল্পনা ও সুযোগ লাভ করেন।

৪. রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সাত : মদিনায় হিজরতের ফলে মহানবি (স) রাজ্যপতি হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি মদিনায় একটি কল্যাণধর্মী ইসলামী রাজ্যের গোড়াপতন করেন। যেকায় তিনি কেবল একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন। কিন্তু মদিনায় একধারে রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসক ও কূটনীতিবিদ ছিলেন। মদিনার এই ক্ষুদ্র ইসলামি রাজ্য পরবর্তী কালের বৃহত্তম ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল।

৫. ইসলামের আন্তর্জাতিক রূপ লাভ : হিজরতের পূর্বে মকায় ইসলাম ছিল গভীবদ্ধ বহু বাধার সম্মুখীন। আর মদিনায় হিজরতের ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিক বৃপ্ত লাভ করে। ইসলামের বাণী দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। মহানবি (স.) দৃত প্রেরণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ইয়ামান, রোম ও পারস্য দেশের শাসনকর্তাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেন। ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করে।

৬. ইয়াসরিবের নতুন নামকরণ : মুহাম্মদ (স.) ইয়াসরিবে হিজরত করার পর ইয়াসরিবের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মদিনাতুন নবি বা নবির শহুর। হিজরতের পর থেকে ইয়াসরিবকে মদিনা নামে অভিহিত করা হয়। আর এ সময় থেকে হ্যরত উমর(রা.) পরবর্তীতে হিজরি সালের প্রবর্তন করেন।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

১. রহমতপুর গ্রামের চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ে খুবই মেধাবী। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এখন সরকারি বড় কর্মকর্তা। অন্য দিকে একই গ্রামের রহিম মিয়ার ছেলে গ্রামের কলেজ থেকে পাশ করে কলেজে শিক্ষকতা করছে। রহিম মিয়া তার ছেলের সাথে চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তা নাকচ করে দেন। তবে চেয়ারম্যান সাহেব সম্পত্তি ভাগের ব্যাপারে এবং মেয়েদের স্বাধীনভাবে লেখাপড়ার ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার।
 ক. মিসরীয় সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল?
 খ. আমুল হ্যন বলতে কি বুঝ?
 গ. চেয়ারম্যান সাহেব ইসলাম পূর্ব যুগের কোন প্রথার অনুসরণে বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেন, ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. সম্পত্তি ভাগের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আইয়ামে জাহেলিয়াতের নারীর মর্যাদার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর।
২. দশম শ্রেণির শিক্ষক আরমান সাহেব বললেন, মহানবি (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বযুগকে ‘আইয়ামে জাহিলিয়া’ বা অন্ধকার যুগ বলা হয়। তারপর তিনি জিজেস করলেন তাহলে আইয়ামে জাহিলিয়া বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের ব্যাপ্তি কতটুকু? উত্তরে শিক্ষার্থী নাহিদ বললো, স্যার আপনার বক্তব্য অনুযায়ী হ্যরত আদম (আ.) হতে হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে। সাইদ নাহিদের উত্তরের বিরোধিতা করে বললো যে, হ্যরত ঈশ্বা (আ.) এর তিরোধানের পর হতে মহানবি হ্যরত (স.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাব্দী কালকে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়।
 (ক) কোন যুগকে ‘আইয়ামে জাহিলিয়া’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়?
 (খ) অন্ধকার যুগ সম্পর্কে নাহিদের বক্তব্য যথার্থ নয় কেন? ব্যাখ্যা কর?
 (গ) অন্ধকার যুগ সম্পর্কে সাইদের বক্তব্যের যথার্থতা দেখাও।
 (ঘ) অন্ধকার যুগের আরব বলতে হিজাজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং অন্ধকার যুগ বলতে সে সময়কে বুঝতে হবে কেন?
 বিশ্লেষণ কর।

৩. ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় জনেক বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মহানবি (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি পূর্বযুগ, তাঁর চরিত্র, কর্মকাণ্ড ও গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এক পর্যায়ে তিনি তৎকালীন আরবের বিশ্বজগত নেরাজ্য, গোত্রকলহ ইত্যাদি প্রসঙ্গে তুলে ধরেন। পরিশেষে তিনি বলেন তৎকালীন আরবের এসব অবস্থা নিরসনে সর্বশ্রেষ্ঠ নবি রূপে মহানবি (স.) আবির্ভূত হন।
- (ক) মহানবি (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব যুগ কী নামে পরিচিত ছিল?
- (খ) সে যুগের বাস্তিকাল কত ছিল?
- (গ) উক্ত যুগের মত উন্নত কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তোমার করণীয় কী? ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) “মহানবি (স.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি রূপে বিশেষ আবির্ভূত হন” – উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
৪. আমাদের সমাজে একটা প্রবাদ আছে- তেলে মাথায় তেল দেয়া। কিন্তু শরফুন্দীন সাহেব এর ব্যাতিক্রম। মহল্লায় বসবাস করার সময় তিনি তাঁর এলাকায় অসহায় দরিদ্র ও অত্যাচারিত মানুষের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। চাকুরি থেকে অবসরের পর তিনি ‘ক’ নামে একটি সেবামূলক সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর এই মহত্বী কর্মকাণ্ডে অনেকে এগিয়ে আসেন। আমাদের পুরিত্র ইসলাম ধর্মেও এরূপ মানবকল্যাণগর্ভী কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষ তাগিদ রয়েছে।
- (ক) মহানবি (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির নাম কী?
- (খ) মহানবি (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির উদ্দেশ্যবলি কী ছিল?
- (গ) শরফুন্দীন সাহেবে ‘ক’ নামের সংগঠনটি গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কেন?
- (ঘ) মহানবি (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির মাধ্যমে কীভাবে তিনি আরবের মানুষের কাছে পরিচিত লাভের সুযোগ পেয়েছেন বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।
৫. আবদুল্লাহপুর গ্রামে ছোট খাটো বিষয় নিয়ে সর্বদা ঝাগড়াবাটি মারামারি লেগেই থাকত। তাদের মধ্যে নীতি- নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না। এমন পরিস্থিতি অবলোকন করে এলাকার যুবক ছুমায়ন খুবই মর্মাহত হন। এ পরিস্থিতি থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষার জন্য ছুমায়ন কিছু যুবকের সমষ্টিয়ে একটি ভাস্তুসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের শাস্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও নিঃস্ব অসহায়কে সহায়তা করা। অন্য দিকে গ্রামের মাদরাসা ভবন উত্তোধন নিয়ে মাতবরদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ছুমায়ন সকল মতবিরোধ অবসান করে সকলকে সাথে নিয়ে মাদরাসা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে সক্ষম হন।
- ক. রাসূল (স.) কত শ্রীঃ হিজরত করেন?
- খ. হিলফ উল- ফুজুল বলতে কি বুঝ?
- গ. ছুমায়নের প্রতিষ্ঠিত ভাস্তুসংঘের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন সংস্কার মিল খুজে পাওয়া যায়? তার উদ্দেশ্যবলী আলোচনা কর।
- ঘ. মাদরাসা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এর সাথে রাসূল (স.) এর জীবনের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও।
৬. জহির এলাকার একজন মহত্বী ছেলে। ছোট বেলা থেকেই তিনি সমাজ সেবার কাজে নিয়োজিত। এলাকাবাসী তাকে পছন্দ করতো ও বিশ্বাস করত। কিন্তু এলাকার কিছু স্বার্থীর্বাসী ব্যক্তি তাকে অপছন্দ করে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। অবস্থা টের পেয়ে তিনি এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র তার আত্মায়ের বাড়ি চলে যান।

- ক. পবিত্র কুরআনে মক্কা নগরীকে কি বলা হয় ?
 খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কি বুঝা ?
 গ. জহির এর এলাকা ত্যাগ এর ঘটনার সাথে রাসুল (স.) এর জীবনের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ইসলামের ইতিহাসে হ্যারত (স.) এর মদিনায় গমন একটি তাত্পর্যপূর্ণ ঘটনা – বজ্রব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

বচ্ছ নির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘উম্মুল কুরা’ বলা হয় কোন স্থানকে?

- | | |
|-----------|-----------|
| (ক) আরব | (খ) মদিনা |
| (গ) মক্কা | (ঘ) বসরা। |

আরবভূমি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত। এদেশের মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। আরব শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা রকম মতামত রয়েছে।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২-৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

২। আরব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

- | | |
|--------------|--------------|
| (ক) মরম্ভূমি | (খ) বাণিজ্য |
| (গ) আরাবা | (ঘ) আদি নগরী |

৩। আরব শব্দের উৎপত্তি হয়েছে-

- i. “আরাবা” থেকে
- ii. “ইয়ারা” থেকে
- iii. ‘আবহার’ থেকে

কোনটি সঠিক?

- | | |
|----------------|------------------|
| (ক) i | (খ) i এবং iii |
| (গ) ii এবং iii | (ঘ) i,ii এবং iii |

৪। আরবের একটি নগরীকে ‘উম্মুল কুরা’ বলার কারণ-

- | |
|---|
| (ক) ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকার মিলনস্থলে অবস্থিত |
| (খ) এখানকার মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা |
| (গ) অধিকাংশ স্থান মরুভূমি |
| (ঘ) প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি |

৫। মরুবাসী বেদুইনদের অন্যতম আহার্য কী?

- | | |
|---------------|---------------|
| (ক) খেজুর | (খ) গরুর মাংস |
| (গ) উটের মাংস | (ঘ) উটের দুধ |

শিক্ষক শ্রেনিকক্ষে আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থা ও সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রগল্পী নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি সমীরকে জিজ্ঞেস করলেন, ভূ-প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আরবের অধিবাসীদের কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? এরপর তিনি সুমাইয়াকে বললেন, মরুবাসী বেদুইনদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলো। উত্তরে সুমাইয়া বললো, আরবরা খুবই অতিথি পরায়ণ। কেননা তারা অতিথি শত্রুকেও আদর আপ্যায়ন করতো। শিক্ষক অবশ্যে বললেন মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও আচার আচরণের উপর ভৌগোলিক প্রভাব ব্যাপক।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬-৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৬। শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর সামরিকের জবাব কি হবে?

- | | |
|--------------|----------------|
| (ক) দুই ভাগে | (খ) চার ভাগে |
| (গ) তিন ভাগে | (ঘ) পাঁচ ভাগে। |

৭। সুমাইয়ার জবাবের সাথে বেদুইনদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আরো কি যুক্ত হতে পারে?

- i. নিষ্ঠুর প্রকৃতির
- ii. কওম চেতনা
- iii. স্থায়ীভাবে বসবাস

কোনটি সঠিক?

- | | |
|---------|---------------|
| (ক) i | (খ) i এবং ii |
| (গ) iii | (ঘ) i এবং iii |

৮। ভৌগোলিক প্রভাবের ফলে মরুবাসী আরবরা মূলত-

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (ক) শহরমুখী | (খ) ভবিষ্যৎমুখী |
| (গ) যুদ্ধাংদেহী | (ঘ) অতীতমুখী |

৯। মেসোপটেমীয় সভ্যতা হচ্ছে-

- i. নগর সভ্যতা
- ii. আইন শাস্ত্র ভিত্তিক সভ্যতা
- iii. নীতি ধর্মভিত্তিক সভ্যতা

কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|----------------|
| (ক) i | (খ) ii এবং iii |
| (গ) i এবং ii | (ঘ) i এবং iii |

রাফি বললো, হ্যরত (স)-এর নবৃত্য প্রাপ্তির পূর্ব্যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। রিমি বললো, তবে সমগ্র আরব অঞ্চলকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইয়ামে জাহেলিয়া বলা যায় না।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০-১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১০। আইয়ামে জাহেলিয়া সম্পর্কে রাফির বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, তাহলে-

- i. পূর্ববর্তী সকল নবি রসূলকে অধীকার করা হয়
- ii. পূর্ববর্তী সকল সভ্য জাতি ও সভ্যতাকে অধীকার করা হয়
- iii. আরব জাতির কৃতিত্বকে স্লান করা হয়।

কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|----------------|
| (ক) i | (খ) i এবং iii |
| (গ) i এবং ii | (ঘ) ii এবং iii |

১১। রিমির বক্তব্য অনুযায়ী সমগ্র আরবভূমিকে আইয়ামে জাহেলিয়া অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাহলে আইয়ামে জাহেলিয়ার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল কোনটি?

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| (ক) সমগ্র উত্তর আরব | (খ) হিজাজ ও পাশ্ববর্তী এলাকা |
| (গ) হীরা নগরী | (ঘ) হিমাইয়ারী রাজ্য |

১২। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কতো খ্রিস্টাদে জন্ম গ্রহণ করেন-

- | | |
|---------|---------|
| (ক) ৫২০ | (খ) ৫৭৯ |
| (গ) ৫৭০ | (ঘ) ৫৮২ |

১৩। আ-মূল-ফিল বা হাস্তি বর্ষ বলা হয় কোন খ্রিস্টাদকে?

- | | |
|---------|---------|
| (ক) ৫৭০ | (খ) ৫৮২ |
| (গ) ৫৭৯ | (ঘ) ৬১০ |

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মহানবি (স.) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে পূর্ববর্তী পাঠের পুনরালোচনা করছিলেন। শিক্ষকের অনুরোধে ফয়সাল আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বললো, হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বাল্যকাল থেকেই আর্ত পীড়িত, অসহায় ও গরীব দুর্বলদের প্রতি জালিম ও ধনীদের অত্যাচারের নিরসন করার চিন্তা ও চেষ্টা করতেন। এজন্য তিনি একটি বিশেষ কমিটি বা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষক বললেন, সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় তোমরাও মহানবি (স.)-এর আর্দশ অনুসরণ করতে পার।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

১৪। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) গঠিত কমিটির নাম কি ছিল?

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (ক) হারবুল ফুজ্জার | (খ) হিলফ-উল-ফুজ্জুল |
| (গ) আ-মূল-ফিল | (ঘ) সমবায় |

১৫। হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর গঠিত কমিটির উদ্দেশ্য ছিল-

- i. নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সাহায্য করা
- ii. অত্যাচারীকে সাহায্য করা
- iii. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা

কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|----------------|
| (ক) i | (খ) i এবং iii |
| (গ) i এবং ii | (ঘ) ii এবং iii |

১৬। বর্তমানে তোমার এলাকায় কোনো সামাজিক সমস্যা নিরসনকক্ষে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর আদর্শ মোতাবেক তুমি কী করবে?

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (ক) অত্যাচারীকে নিজে বাধা দেবে | (খ) আইনের আশ্রয় নেবে |
| (গ) অত্যাচারিতকে সাহায্য করবে | (ঘ) কমিটি বা সংগঠন গড়ে তুলবে |

নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই মক্কাবাসীগণ হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কে ‘আল-আমিন’ নামে ডাকতো। কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কাবাসি কুরাইশগণ ইসলামের আহ্বানের প্রচড় বিরোধিতা করেছিল। এমন কি তাদের বিরোধিতার কারণে হ্যরত (স.) কিছুদিন গোপনে ইসলাম প্রচার করেছিলেন।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৭, ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

১৭। মক্কাবাসীগণ হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কে ‘আল-আমিন’ হিসাবে বিশ্বাস করতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (ক) তাঁকে ‘আল-আমিন’ নামে ডাকায় | (খ) মক্কাবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করায় |
| (গ) হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ঘটনায় | (ঘ) তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হওয়ায় |

১৮। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কত বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেছিলেন?

- | | |
|------------|-----------|
| (ক) ১০ বছর | (খ) ৮ বছর |
| (গ) ৫ বছর | (ঘ) ৩ বছর |

১৯। মক্কাবাসির কুরাইশগণ ইসলামের প্রচড় বিরোধিতা করেছিল কারণ-

- i. তৌহিদ কুরাইশদের নীতি বিরুদ্ধ
- ii. অর্থোপার্জন বশের ভয়
- iii. গোষ্ঠীগত বিদ্যেষ

কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|----------------|
| (ক) i | (খ) iii |
| (গ) i এবং ii | (ঘ) ii এবং iii |

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ହସରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ.) ଏର ମଦିନା ଜୀବନ (୬୨୨-୬୩୨ ଖ୍ର.)

ପ୍ରଥମ ପରିଚେତ

ମଦିନାର ଅଧିବାସୀ ଓ ସନ୍ଦ

ହସରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ.) ଏର ମଦିନାଯ ଆଗମନେର ପୂର୍ବେ ମଦିନାର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଛିଲ । ମଦିନାଯ ଶାନ୍ତି-ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରାଖାର ମତ କୋଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ଛିଲ ନା । ଏ ସମୟ ଆଉସ ଓ ଖାସରାଜ ନାମେ ମଦିନାର ଦୁଟି ଗୋତ୍ର ପରମ୍ପରା ହିସାତ୍ତକ କଲହ-ବିବାଦେ ଲିପ୍ତ ଛିଲ । ମଦିନାଯ ବସବାସରତ ଇତ୍ତଦିଗଣ ତଥନ ତିନଟି ଶାଖାୟ ବିଭକ୍ତ ଛିଲ (୧) ବାନୁ କାଇନୁକା (୨) ବାନୁ ନାଜିର ଓ (୩) ବାନୁ କୁରାଇୟା । ତାଦେର ଘାର୍ଥପରତା ଓ ଚକ୍ରାନ୍ତେ ଫଳେ ମଦିନାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିବାସୀ ଉଦ୍ଦେଶ ଓ ସଂଶୟେର ମଧ୍ୟେ ଦିନାତିପାତ କରାତ । ଏକଥିବା ଅବସ୍ଥାୟ ହସରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ.) ଏର ମଦିନାଯ ଆଗମନକେ ମଦିନାବାସୀ ଆନ୍ତରିକତାବେ ଘାଗତ ଜାନାଯ । ହସରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ.) ଏର ନେତୃତ୍ଵେ ତାରା ସାମ୍ୟ ଓ ଭାତୃତ୍ଵେ ଆଦର୍ଶେ ଉଦ୍‌ଦ୍ୱାର୍ଥ ହେଁ ନତୁନ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ । ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅଶାନ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଦିନାଯ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।

ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟବଳି : ହସରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ.) ୬୨୨ ଖ୍ରିସ୍ଟାବେ ମଙ୍କା ହତେ ମଦିନାଯ ହିଜରତ କରଲେ ଇସଲାମେର ଇତିହାସେ ଏକ ନତୁନ ଯୁଗେର ସ୍ଥଳା ହୁଏ । ତିନି ମଦିନାଯ ମସଜିଦେ ନବବି ନାମେ ଇସଲାମେର ପ୍ରଥମ ମସଜିଦ ସ୍ଥାପନ କରେନ । ଏର ନିର୍ମାଣ କାଜେ ତିନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ କାଜ କରେନ । ଏଥାନେ ତିନି ଧର୍ମୀୟ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟବଳି ସମ୍ପାଦନ କରତେନ ଏବଂ ସମ୍ପରିବାରେ ବସବାସ କରତେନ ।

ମହାନବି (ସ.) ମଙ୍କା ଥେକେ ହିଜରତକାରୀ ମୁସଲମାନଦେର ‘ମୁହାଜିରିନ’ ଏବଂ ଆଶ୍ୟ ଦାନକାରୀ ମଦିନାର ମୁସଲମାନଦେର “ଆନସାର” ଅର୍ଥ ସାହ୍ୟକାରୀରୂପେ ଅଭିହିତ କରେନ । ମଦିନାଯ ତଥନ ପାଁଚ ପ୍ରେଶିର ଅଧିବାସୀ ଛିଲ । ସଥା ମୁହାଜିରିନ, ଆନସାର, ଇତ୍ତଦି, ଶ୍ରିଷ୍ଟାନ ଓ ମୁଶାରିକ । ଏ ସମୟ ସାର୍ଥ ହାସିଲେନ ଜନ୍ୟ ଅନେକେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରଲେ ଓ ମନେପ୍ରାଣେ ତାରା ହସରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ.) କେ ଗ୍ରହଣ କରାତେ ପାରେନି । ସଂକଟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତାରା ତାର ବିରୋଧିତା କରାତ । ସେଜନ୍ୟ ତାଦେର ମୁନାଫିକ (ବହୁବଚନେ ‘ମୁନାଫିକିନ’) ବଲା ହାତ । ମଦିନା ଜୀବନେର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାୟ ହସରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ.) ତାଦେର କାରଣେ ଅନେକ ବିପଦେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଁଛିଲେନ ଏବଂ ତିନି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌଶଳେ ତାଦେର ମୋକାବିଲା କରେନ । ଏ ଦଲେର ନେତା ଛିଲେନ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ ଉବାଇ ଇବନ ସାଲୁଲ ।

ମଦିନାର ସନ୍ଦ ଓ ଇସଲାମି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ

ସନ୍ଦେର ପ୍ରମୋଜନୀୟତା ୪ ମହାନବି (ସ.) ମଙ୍କା ହତେ ଇୟାସରିବେ ହିଜରତ କରାର ପର ଏମନ କତୋଗ୍ଲୋ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବୁଧୀନ ହନ ଯାର ଜରୁରି ସମାଧାନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେଁ ପଡ଼େ । ଏସବେର ମଧ୍ୟେ ସବଚେଯେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିଲ ପ୍ରଥମତ ମଙ୍କାର କୁରାଇଶ ମୁହାଜିର ଏବଂ ସଥାନୀୟ ଇୟାସରିବବାସୀ ଆନସାରଦେର ମଧ୍ୟକାର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟେର ସୀମାରେଖା ଟାନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁହାଜିର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଜୀବିକାର ସଂସ୍ଥାନ କରା, ତୃତୀୟ କୁରାଇଶଦେର ହାତେ କ୍ଷତିଗ୍ରହଣ ମୁହାଜିରଦେର କ୍ଷତିପୂରଣେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା, ଚତୁର୍ଥତଃ ମଦିନାର ଅମୁସଲମାନ ବିଶେଷତ ଇତ୍ତଦିଦେର ସାଥେ ଏକଟି ସମ୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେସର, ପଞ୍ଚମତଃ ମଦିନା ନଗରୀର ରାଜନୈତିକ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରା, ସଞ୍ଚାର ମଦିନାର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରୂପରେଖା ପ୍ରଗମନ କରେ ମଦିନାବାସୀଦେର ମଧ୍ୟେ ସଥାରୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆଇନଗତ

কাঠমো গঠন করা এবং সর্বোপরি ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং মুসলমানদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার তাগিদে মুসলিম ও অমুসলিম প্রত্যেকের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অধিকার নিশ্চিতকরণ। এ সমস্ত সমস্যার সমাধানকল্পে নবি করিম (স.) ইয়সরিবের পৌত্রিক, ইহুদি, আনসার ও মুহাজিরদের জন্য যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন তা হল কিতাব আর রাসুল বা সহিফা রাসুল সংক্ষেপে মদিনার শাসনতন্ত্র বা মদিনার সনদ।

সনদের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ :

১. সনদের শরীক দলের সকলে অন্যান্য লোকদের থেকে স্বতন্ত্র একটি উম্মাহ বা জাতি।
২. এই সনদে অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের জন্য ইয়াসরিব উপত্যকা পৰিব্রত।
৩. মদিনায় অতর্কিত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তারা একে অপরকে সাহায্য করবে।
৪. যে সকল ইহুদি আমাদের অনুসারী হবে তারা আমাদের সাহায্য ও সহানৃতি পাবে। এ সম্পর্ক ততদিন বর্তমান থাকবে যতদিন তারা মুসলমানদের ক্ষতি করবে না।
৫. ইহুদি সম্প্রদায়ের মিত্রগণও সমান স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে।
৬. যুদ্ধের সময় ইহুদিগণ মুসলমানদের সঙ্গে সমভাবে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।
৭. কোন মুমিন একজন মুশারিকের জন্য একজন মুমিনকে হত্যা করবে না বা কোন মুশারিক মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।
৮. কেউ কুরাইশদের বা অন্য কোন বহিঃশত্রুদের সাথে মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্র করতে পারবে না।
৯. কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এর জন্য তার সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।
১০. মুসলমান ও অমুসলমান সকলে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে।
১১. যাহানবি (স.) এর অনুমতি ছাড়া মদিনার কোন সম্প্রদায় কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।
১২. এই সনদের লোকদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (স.) এর উপর ন্যস্ত করতে হবে।
১৩. আশ্রিত ব্যক্তি আশ্রয়দানকারীর মতই, যতোক্ষণ পর্যন্ত সেকোনো অন্যায় বা বিশুসংস্থাতকতা করবে না।
১৪. এই সনদে যা আছে আল্লাহ তার সত্যতার সাক্ষী এবং রক্ষাকারী।
১৫. আল্লাহ সৎ ও ধর্মতীরুদের রক্ষাকারী এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল।

সনদের শুরুত্ত

প্রথম লিখিত সংবিধান ৪ মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম লিখিত সংবিধান। ইতোপূর্বে শাসকের ঘোষিত আদেশই ছিল আইন। মহানবি (স.) সর্ব প্রথম জনগণের মজলার্থে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় শাসনে দেশের সকল সম্প্রদায় ও জনগণের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি এই সনদ প্রণয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বস্তুত মদিনার সনদে নাগরিক সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন, ধর্মের স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা, সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ঘোষিত হওয়ায় এই সনদকে মহাসনদ বলা হয়।

রাজনৈতিক প্রজাতা পরিচয় ৪ মদিনা সনদ মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্ব বর্ণনে আবদ্ধ করে হিংসা, দেষ ও কলহের অবসান ঘটায়। বিপদে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। মদিনা রাষ্ট্র তথা ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণে সকলের সমত্বে যুদ্ধ ব্যয় বহন করার ব্যবস্থা, হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

সম্মতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা ৪ মদিনা সনদ গোত্র প্রথার বিলোপ সাধন করে ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মীয় অনুশাসন পরিচালনার দায়িত্ব অপর্ণ করে। অধ্যাপক পি, কে, হিতি বলেন, মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে বৃহত্তম ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করেন।

ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান ৪ মদিনা সনদ মুসলমান ও অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে। মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এ শর্ত দ্বারা যে মহানুভবতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। সর্বগুণাধিত, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগান্তকারী এ মহাপুরুষ তৎকালীণ বিশ্বে ধর্ম ও রাজনৈতিক সম্বয়ে যে ইসলামী উমাহ বা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, উভরকালে ইহা বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করে।

মদিনার পুনৰ্গঠন ও মহানবির (স.) এর শ্রেষ্ঠত্ব ৪ মদিনা সনদের মাধ্যমে মহানবি (স.) দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত আরব জাহানকে একত্বাবদ্ধ করার একটি মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ বিধিস্ত মদিনা নগরীর পুনৰ্গঠনের প্রয়াস পান। উপরন্তু এই সনদে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, কুটনৈতিক দূরদর্শিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগান্তকারী মহাপুরুষরূপে আর্বিভূত হন।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৪ মদিনা সনদের শর্তসমূহ হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম সমাজের চরম কর্তৃত্ব আরব গোত্রীয় প্রধানদের নিকট হতে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর এবং তদুর্বৰ্তী আল্লাহর তাআলার উপর ন্যস্ত হয়েছে। এই সনদ আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্বের ধারণা প্রচারিত করে। এ যাবৎ আরবদের নিকট তা একেবারেই অঙ্গত ছিল। মুসলিম সমাজের জনসাধারণকে তাদের গোত্রীয় স্বাধীনতার একটি বিশেষ অংশ পরিহার করে ঐশ্বী নির্দেশের নিকট আনুগত্য স্বীকার করতে হয়েছিল। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ তখন ঐশ্বীতন্ত্রে পরিণত হল। ফলে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিধানের আলোকে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনীয় দায়িত্ব নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর পূর্ণাঙ্গ ভাবে ন্যস্ত হলো। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য বর্তমান থাকল না। নবজাত মুসলিম রাষ্ট্র ইসলাম ধর্মান্বয়ী রাষ্ট্রে পরিণত হল। বস্তুতপক্ষে, মদিনা সনদের কতোগুলো ধারা হতে প্রতীয়মান হয় যে, মদিনা রাষ্ট্র ছিল একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নাগরিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃত ছিল। এ রাষ্ট্রে সকল গোত্রের যোগদানের সুযোগ উন্নত ছিল। সে রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মর্যাদাবোধ, আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস এবং নবি ও রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর নেতৃত্ব স্বীকৃত ছিল। এ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোর যে ধাচ মুহাম্মদ (স.) তৈরি করেছিলেন এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে খলিফাগণ যুগোপযোগী নীতিমালা সংযোজন করে অধিকতর কল্যাণকর প্রশাসন কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় পরিচেছন যুদ্ধ ও শান্তি মীর্তি বদরের যুদ্ধ (মার্চ, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ)

হিজরতের পর মদিনায় ইসলামের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও কর্মকাণ্ডে সাফল্য লাভ এবং মদিনা নগরীর শাসন শৃঙ্খলা উন্নত হওয়ায় মক্কার কুরাইশদের মনে তৈরি অসন্তোষ ও ক্ষেত্রের সংগ্রহ হয়। এই দীর্ঘ ও শত্রুতা থেকেই গৌরুণ্যিক মক্কাবাসী মহানবি (স) এর সঙ্গে প্রথম যে সংঘর্ষের সুস্থগাত ঘটায় ইসলামের ইতিহাসে তা “গাজওয়ায়ে বদর” (غَزْوَةُ بَدْرٍ) বা বদর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

বদরের যুদ্ধের কারণ :

মক্কার কুরাইশদের শত্রুতা : মদিনায় ধর্মভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে আন্তর্জাতিকীকরণে মহানবির প্রচেষ্টায় মক্কার কুরাইশগণ ঈর্ষাণ্ডিত হয়। তারা জন্মভূমি মক্কা হতে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে সম্মুখে ধ্বনি করার জন্য ঘৃত্যজ্ঞ ও যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

আবদুল্লাহে ইবনে উবাই-এর বড়বন্ধু :

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অসামান্য প্রাধান্য ধর্ম করার জন্য বানু খায়রাজ বংশীয় আবদুল্লাহ বিন উবাই নামক একজন প্রতিষ্ঠিতালী মুনাফিক নেতা গোপনে বড়বন্ধু করতে থাকে। কেননা হিজরতের পূর্বে মদিনায় তার শাসকরূপে অধিষ্ঠিত হবার কথা ছিল; কিন্তু ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও মদিনা সনদের পরিস্থেক্ষিতে তার আশা পূর্ণ হয়নি। এর ফলে সে মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে দুর্বিস্মিন্মূলক কার্যকলাপে নিয়োজিত হয় এবং মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে প্রচারণা ও বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা একটি মুনাফিক দল গঠন করে। ইসলামের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য শীকার করলেও আবদুল্লাহর নেতৃত্বে মুনাফিক দল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বিরুদ্ধে শক্তি করেন।

মদিনার ইহুদীদের বড়বন্ধু :

মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় প্রথমে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে সানন্দে বরণ করলেও তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি ও সুনাম তাঁদেরকে অত্যন্ত বিচ্ছুদ্ধ করে তোলে। মদিনা সমদে তাঁদেরকে সকল প্রকার ধর্মীয় ও নাগরিক আধীনতা প্রদান সত্ত্বেও ইহুদিগণ কোনদিনই মুসলমানদের প্রতি আতঙ্গস্থল মনোভাব প্রকাশ করেনি। উপরন্তু মদিনা সনদের শর্ত লংঘন করে তারা কুরাইশদের সঙ্গে বড়বন্ধু ও গুণ্ঠ সংবাদ প্রেরণ করে ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিলোগ সাথন করার সর্বান্তক চেষ্টা করে। এমনকি তারা মদিনা আক্রমণের জন্য শত্রুদেরকে প্ররোচিত করতে থাকে। সৈয়দ আমীর আলী যথার্থই মন্তব্য করেন, সম্প্রতি মদিনা বিদ্রোহ ও বিশ্বাসাত্ত্বকায় ভরে পিয়েছিল।

আর্থিক কারণ : মক্কা হতে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথে মদিনা অবস্থিত ছিল। এই জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মদিনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাণিজ্য গথ ব্যক্তিত এই পথটি হচ্ছে যাত্রীদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কুরাইশগণ নির্বিপ্রে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ হারাতে পারে এ আশঙ্কায় মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের গতন ঘটানোর জন্য তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

কুরাইশদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ : পবিত্র কাঁবা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় সমগ্র আরবের শৌভিলিকদের মধ্যে কুরাইশদের অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মক্কা ও মদিনার বাণিজ্য পথে বসবাসকারী বিভিন্ন আরব গোত্র কুরাইশদের সাথে গোপনে যোগসূত্র স্থাপন করে হযরতের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকলে মুসলমানদের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। মদিনার সীমান্তবর্তী এলাকায় কুরাইশগণ অথবা তাদের সাহায্যকারী আরব গোত্র মুসলমানদের শস্যক্ষেত্র জালিয়ে দিত, ফলবান বৃক্ষ ধ্বংস করত এবং উট ও ছাগল অপহরণ করত। এই প্ররোচনামূলক ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য মহানবি (স.) আজ্ঞারক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

নাখলার খন্দযুদ্ধ : কুরাইশদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ও লুটতরাজ বন্ধ করার জন্য মহানবি (স.) হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি গোয়েন্দা দল সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রেরণ করেন। হযরতের নির্দেশ অনুযায়ী তিনিদিন পর সীলমোহরকৃত আদেশপত্র উন্মোচন করে হযরত আবদুল্লাহ সঙ্গীদের নিয়ে নাখলার দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং মক্কা কাফেলার জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ পেলেন। লক্ষণীয় যে মহানবি (স.) কাফেলার উপর আক্রমণ করতে আদেশ করেন নি। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রা.) তুলক্রমে চারজন যাত্রীর মক্কার এক কাফেলার উপর আক্রমন করলে নাখলায় একটি খন্দযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর ফলে কুরাইশ নেতা আমর বিন হায়রামী নিহত ও অপর দুইজন বন্দী হয়। নাখলার খণ্ড যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এটি ছিল একটি অজুহাত মাত্র। কেননা তারা অনেকদিন আগ থেকেই ইসলামের উত্তরোপ্তর শক্তি বৃদ্ধিতে চিহ্নিত হয়ে এর ধ্বংস সাথনে প্রবৃত্ত হয়।

আবু সুফিয়ানের কাফেলা আক্রমণের মিথ্যা গুজ্বব : ইসলামের যোরতর শত্রু আবু সুফিয়ান অন্ত সংগ্রহের জন্য বাণিজ্যের অজুহাতে এক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গিয়েছিল। নাখলা যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে কুরাইশগণ মক্কায় কাফেলার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের নিচ্ছতা বিধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এসময় এক ভিত্তিহীন জনরব উঠল যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা মদিনার মুসলমান অধিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এ গুজ্ববের সত্যতা যাচাই না করেই আক্রমনাত্মক নীতি অনুসরণ করে আবু জাহল ১০০০ সৈন্য নিয়ে আবু সুফিয়ানের সাহায্যার্থে মদিনা অভিযুক্তে রওয়ানা হয়।

বদর যুদ্ধের ঘটনা

এমতাবস্থায় মহানবি (স.) ঐশ্বীবাণী লাভ করে অনুপ্রাণিত হলেন। তিনি নাযিল হয় “আল্লাহর পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে”। সাথে সাথে মহানবি (স.) নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের পরামর্শে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আনসার এবং মুহাজির নিয়ে গঠিত মাত্র ৩১৩ জনের একটি মুসলিম বাহিনী কুরাইশ বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য বদর অভিযুক্তে রওনা হয়।

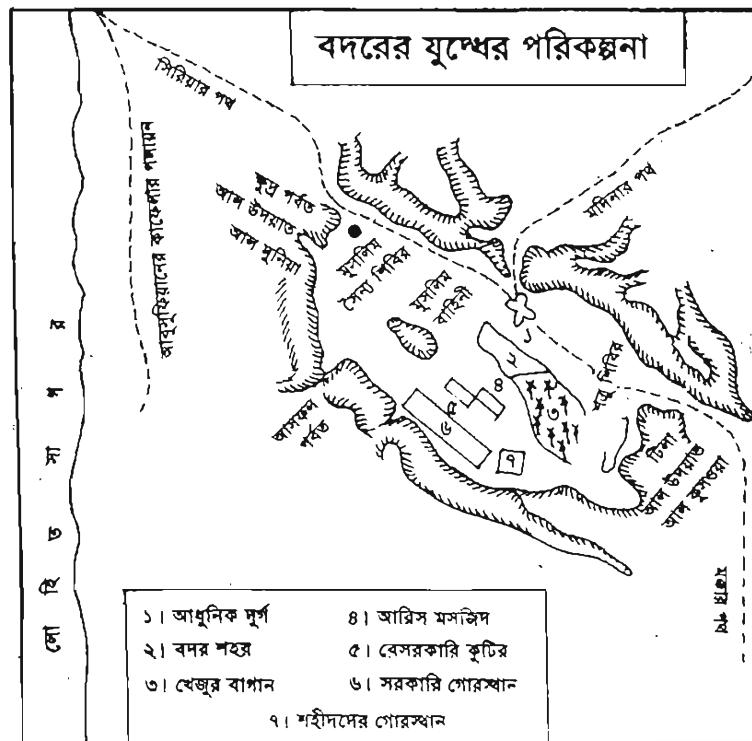
মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বদর উপত্যকায় ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে ১৩ মার্চ (১৭ই রময়ান, জুমুআবার দ্বিতীয় হিজরি) মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে কুরাইশদের সংঘর্ষ হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আল-ওয়াকিদী বলেন— হযরত মুহাম্মদ (স.) মুসলিম সৈন্য সমাবেশের জন্য এমন একটি স্থান বেছে নেন যেখানে সূর্যোদয়ের পরে যুদ্ধ শুরু হলে কোন মুসলমান সৈন্যের ঢাকে সূর্য কিরণ পড়বে না। প্রথমে প্রাচীন আরব রেওয়াজ অনুসারে মল্লাযুদ্ধ হয়। মহানবির নির্দেশে হযরত আমির হামজা (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবু ওবায়দা (রা.) কুরাইশ পক্ষের নেতা উত্তী, শায়বা এবং ওয়ালিদ বিন উত্বার সঙ্গে মল্লাযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে শত্রুপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হয়। উপায়ন্তর না দেখে আবু জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশগণ মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তারা মুসলমানদের উপর প্রচড়ভাবে আক্রমণ চালাতে লাগল, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় সংঘর্ষে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করা কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অসামান্য রণ-নৈপুণ্য, অপূর্ব বিক্রম ও অপরিসীম নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ কুরাইশগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বদর যুদ্ধে মহান আল্লাহ হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেন। এ যুদ্ধে ৭০ জন কুরাইশ

সৈন্য নিহত হয় ও সমস্থ্যক সৈন্য বন্দি হয়। অপরদিকে মাত্র ১৪ জন মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। আবু জাহল এ যুদ্ধে নিহত হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) যুদ্ধবন্দীদের প্রতি যে উদার ও মধুর ব্যবহার করেন তা তাঁর মহানুভবতার পরিচয় বহন করে। মুক্তিপণ গ্রহণ করে কুরাইশ বন্দীদেরকে মুক্তি প্রদান করা হয়। মাত্র ৪০০০ দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারিত হয়। যারা মুক্তিপণ দিতে অক্ষম তারা মুসলমানদের বিরোধিতা না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে ও মুসলমান বালককে শিক্ষাদান করে মৃক্তি লাভ করে।

ବଦଳ ସ୍ମୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱ

সামরিক প্রজ্ঞান গবিনেট ৪ বিশাল কুরাইশ বাহিনী স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্যদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে অমুসলিমরা ইসলাম ধর্ম ও মদিনা রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সমন্বেত ভীত হয়ে উঠে। সৈন্যসংখ্যা যুদ্ধে ভাগ্য নির্ধারণ করে এ ধারণা ভাস্তিতে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের মনে অসামান্য সাহস, উকিলপনা ও আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার করে যা মুসলমানদের ভবিষ্যতের যুদ্ধ জয়ের এক দর্বাৰ আকাঞ্চায় উদ্বৃদ্ধ করে।

ইসলাম প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি : বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সম্প্রসারণের সূচনা করে এবং পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে (৬২৪-৭২৪) ইসলাম পঞ্চিকা হতে পূর্বে ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। যোসেফ হেল বলেন— পরবর্তীকালে সমস্ত সামরিক বিজয় এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রদর্শিত ও বিকশিত আরব গুণাবলির জন্যই সম্ভব হয়। যথা— শৃঙ্খলা ও মৃত্যুর প্রতি অবহেলা। হযরত মুহাম্মদ (স.) যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নির্দেশ দেন, তোমরা কেউ সারি ভেঙে এগিয়ে যেওনা এবং আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করো না।



ଚିତ୍ର ୧ : ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର

চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ : মঙ্কার প্রায় এক সহস্র বীর সেনার বিরুদ্ধে তিনিশত তের জন মুসলমানের যুদ্ধাভিযান যে অঙ্গতার বিরুদ্ধে জানের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংবর্ধ তা নিশ্চিতরণে বলা যেতে পারে। এ যুদ্ধে জয়লাভ না করলে ইসলাম শুধু রাষ্ট্র হিসেবেই নহে ধর্ম হিসেবেও পৃথিবীর বুক হতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ৪ বদরের যুদ্ধ মুঠিমেয় মুসলমানদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে বিধৰ্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুপ্রোগা প্রদান করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে আল্লাহ স্বয়ং তাদের সাহায্যকারী। ধর্মযুদ্ধে জীবিত অবস্থায় গাজী ও মৃত্যুতে শহীদ হওয়ার প্রেরণা এবং পারলোকিক পুরস্কার লাভের বাসনা তাদের পরবর্তী বিজয়গুলোতে প্রভাব বিস্তার করে।

রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মুহাম্মদ (স.)-এর স্বীকৃতি ৪ বদরের যুদ্ধ বিজয় ইসলাম প্রচারে নব দিগন্তের সূচনা করে। ইসলামের মর্যাদা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কথা এবং গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের কথা চিন্তা করে নিকলসন বলেন, বদরের যুদ্ধ ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সর্বোচ্চ যুদ্ধের অন্যতম। বদরের প্রান্তরে বিজয় লাভের ফলে সকলের দৃষ্টি মুহাম্মদ (স.) এর উপর নিবন্ধ হল। আরবগণ তাঁর ধর্মকে যতই উপেক্ষা করুক না কেন, তাঁকে সম্মান না করে পারল না। এ যুদ্ধ ইসলামকে মদিনা প্রজাতন্ত্রের ধর্ম হতে একটি সুসংবন্ধ রাষ্ট্রের ধর্মে উন্নীত করে।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মনে ভীতি ৪ ইহুদি ও খ্রিস্টান আরবগণ ইসলামের অসীম ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারণ হতে সাময়িকভাবে বিরত থাকল। মুনাফিকগণ ধর্মদ্রোহিতার জঘন্য পাপাচার হতে ক্ষণিকের জন্য নিবৃত্ত রইল। বিধৰ্মীরা হযরতের ঐশ্বরীক ক্ষমতায় আকৃষ্ট হল এবং মুসলমানগণ বদরের বিজয়কে আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কারমূলক প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ করে তাওহিদ ও নবুয়তে বিশ্বাস।

বিশ্ব বিজয়ের সূচনা ৪ বদরের যুদ্ধের মহাবিজয় ইসলামকে কেবল আরবেই নয়, অনারব অঞ্চলও সার্বজনীন করে তোলে। এনসাইক্লোপেডিয়া বিটেনিকার জনেক লেখক বলেন, বদরের যুদ্ধ শুধু একটি বিখ্যাত যুদ্ধই নয় এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম। ইহা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতেও যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

রাষ্ট্র নায়কের মর্যাদা জাত ৪ যুদ্ধক্ষেত্র হতে বিজয়ীর বেশে মহানবি (স.) মদিনায় ফিরে এসে পরাক্রমশালী যোদ্ধা, সুদক্ষ সমরনায়ক ও সুবিবেচক শাসকের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেন। ঘটনাবলি বিচারে হযরত মুহাম্মদ (স.) একজন যোগ্য ও জনপ্রিয় নেতা তা প্রমাণিত হল। এ বিজয়ের ফলে হযরত মুহাম্মদ (স.) একাধারে নবি ও রাষ্ট্র পরিচালকের দায়িত্বার পরিচালনা করতে থাকেন। মুসলমানদের বদর বিজয় ইসলামের অপরাজেয় শক্তির পরিচায়ক। এর ফলে ইহুদি এবং খ্রিস্টানগণ ভীত ও শক্তিত হয়ে পড়ে। প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার ও আচার অনুষ্ঠান পালন, রাষ্ট্রীয় কার্য তত্ত্ববিধান, যুদ্ধবিশ্রান্ত পরিচালনা, দৃত প্রেরণ দ্বারা বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। তবে তাদের বিরুদ্ধাচারণ বন্ধ হয়নি। বদর যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক শি.কে হিটি বলেন, ইতোপূর্বে রাষ্ট্রীয় ভিত্তি ব্যতিরেকে ইসলাম শুধু ধর্ম মাত্র ছিল। এখন থেকেই ইসলাম একটি রাষ্ট্রের ধর্মে পরিণত হল। বদরের পরে মদিনাতে এটা রাষ্ট্রীয় ধর্মের থেকেও বড় ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম নিজেই একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। সে সময় এবং সেখান থেকেই ইসলাম পরিণত হয় একটি সংগঠিত রাষ্ট্র এবং সারা বিশ্ব তাকে সেভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। এজন্য বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগসন্ধিক্ষণকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত।

উহুদের যুদ্ধ (৬২৫ স্ট্রিংটাই)

যুদ্ধের কারণ

বদরের যুদ্ধে কুরাইশগণ আর্থিক, সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় বীর আবু জাহল ও উত্তরা প্রাণ হারিয়েছিল। বদরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রতিশেষ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি নারী অথবা তৈল স্পর্শ করবেন না। এ সময় মদিনার ইহুদিগণ কুরাইশদের কুম্ভণা দিতে শুরু করে। ইহুদি কবি ক'ব বিন আশরাফ কবিতা রচনা করে দুর্দর্শ বেনুইন সম্পদায়কেও প্ররোচিত করতে থাকে। মদিনার প্রাধান্য এবং ইসলামের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধিতে কুরাইশগণ আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারানোর আশঙ্কায় শক্তিত হয়ে পড়ে। উপরন্তু হাশেমী গোত্রের হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর একচত্র আধিপত্য লাভ এবং তার নেতৃত্ব মদিনার ক্রমোন্নতি গোত্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী হলে উমাইয়া নেতা আবু সুফিয়ানের গাত্রাদাহ দেখা দেয়। বস্তুত কুরাইশ গোত্রের হাশেমী ও উমাইয়া শাখা দুটির পুরনো দ্বন্দ্ব নতুন মাত্রা লাভ করলে যুদ্ধ অবশারিত হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের ঘটনা : আবু সুফিয়ান ৬২৫ স্ট্রিংটাই ৩০০ উন্টারোই ও ২০০ অশ্বারোইসহ ৩০০০ সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে মদিনার পাঁচ মাইল পশ্চিমে উহুদ উপত্যকায় সমবেত হলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ১০০ জন বর্মধারী, ৫০ জন তীরন্দাজসহ মাত্র ১০০০ জন মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পথিমধ্যে মোনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই তার ৩০০ জন অনুচরসহ দলত্যাগ করলে শেষ পর্যন্ত মাত্র ৭০০ জন মুসলিম যোদ্ধা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মহানবি (স.) উহুদ পাহাড়ের গোলাকার অংশের বাইরে থেকে যুদ্ধ চালাবার মনস্থির করেন এবং সেভাবে সৈন্য সমাবেশ করেন। মুসলিম শিবিরের পচাতে বাম পাশে একটি গিরিপথ ছিল। পেছন দিক থেকে যাতে শত্রুরা অর্ডিক্ট আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজকে গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথটির প্রহরায় নিযুক্ত করেন এবং মহানবি (স.) এর সুস্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেন। প্রথমদিকে মুসলমানরা পর পর সাফল্য লাভ করে। শত্রুবাহিনী দিশ্বিদিক ভজনশূন্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন শুরু করেন। যুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্যের উল্লাসে মুসলিম সৈন্যবাহিনী শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে এবং গিরিপথের রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে গনিয়াতের মাল সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। মুসলিম বাহিনীর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে দুর্দর্শ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ পেছন থেকে অর্ডিক্ট আক্রমণ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং দ্রুত পলায়নে বাধ্য করে। স্বয়ং মহানবি (স.) কুরাইশ গোত্রের ইবন কামিয়ার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে আহত হয়ে সংজ্ঞা ও দুটি দাঁত হারান। এই যুদ্ধে বীরকেশরী হ্যরত আমীর হামজা (রা.) সহ ৭০ জন মুসলিম যোদ্ধা শহীদ হন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হামজা (রা.) এর হৃৎপিণ্ড চর্বণ করে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। অনেক সাহাবি উহুদের যুদ্ধে আহত হন।

মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ

উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা মুসলমানদের তিনগুণ ছিল। কিন্তু বিধীয়দের সংখ্যাধিক্য যে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ হতে পারে না, ইতোপূর্বে বদর যুদ্ধেই তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই এ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়ের কারণ অন্যবিধি ছিল।

নেতার আদেশ অমান্য ও শৃঙ্খলার অভাব : উহুদের যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যগণ তাঁদের নেতার আদেশ যথাযথভাবে পালন করেনি। রাসুলুল্লাহর নির্দেশ ছিল ‘জয় অথবা পরাজয় কোন অবস্থাতেই মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী যেন গিরিপথ অতিক্রম না করে।’ কিন্তু বিজয় নিজেদের করায়ত মনে করে মুসলিম বাহিনী উপরিউক্ত আদেশ লজ্জন করায় তাঁদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সে সুযোগে শত্রুপক্ষ তাঁদের আক্রমণ করে। নেতার আদেশ লজ্জন ও শৃঙ্খলার অভাবই ছিল উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ।

হযরত মুহাম্মদ (স.) নিহত হওয়ার গুজব : যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (স.) নিহত হয়েছেন এমন একটি গুজব উঠলে মুসলমানদের মধ্যে বিভাসি ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি ছিল যুদ্ধে হযরত মুসআব (রা.) শাহাদাত বরণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সাথে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য ছিল।

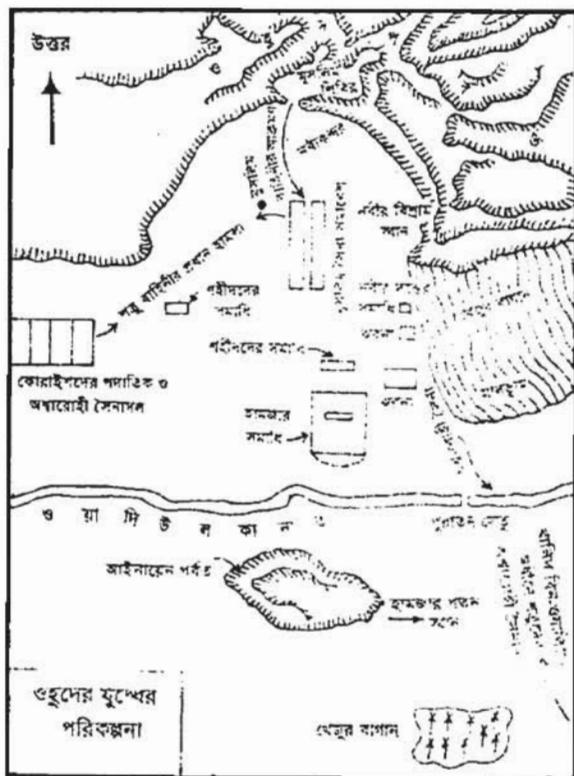
কর্তব্যে অবহেলা : বিজয় অবশ্যভাবী মনে করে মুসলিম বাহিনী বিপুল উৎসাহে সামরিক আদর্শ রক্ষার পরিবর্তে শত্রুদের ধন-সম্পদ সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাঁদের এই কর্তব্য জ্ঞান অপেক্ষা গণিয়ত লাভ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তাঁরা যদি তাঁদের নিজ নিজ স্থানে দৃঢ় থাকতেন, তাহলে খালিদ বিন ওয়ালিদ পশ্চাত্তাগ হতে মুসলমানদের আক্রমণ করার সুযোগ পেত না।

খালিদের রণকৌশল : মহাবীর খালিদের রণদক্ষতা ও চাতুর্য শত্রুপক্ষের সাময়িক বিজয়কে সম্ভব করেছিল। মুসলিম সেনাদল যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ত্যাগ করে গনিমাত সংগ্রহে ব্যস্ত, ঠিক সে মুহূর্তে বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ বিন ওয়ালিদ তাঁদের উপর মরণপন আক্রমণ চালায়। ফলে মুসলিম সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে।

যুদ্ধের ফলাফল

উহুদের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য ইয়ান ও দৈর্ঘ্যের অগ্নি পরীক্ষা। এ যুদ্ধ তাঁদের ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্ম জিজ্ঞাসার পরীক্ষা। বিজয়োল্লাসী বিধর্মী কুরাইশগণ মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে সাময়িক জয়লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মানসিক ও শারীরিক শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং এ কারণে তাঁদের জয় ছিল পরাজয়ের নামান্তর। উহুদের অগ্নি পরীক্ষা ইসলামের দৃঢ় সংকল্প ও আত্মনির্ভরশীলতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। বদরের প্রান্তর ইসলামের সামরিক বিজয়ের প্রতীক ছিল; কিন্তু উহুদের বিপর্যয় মুসলমানদের সুশৃঙ্খলাবন্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত করে। উহুদের যুদ্ধের পরাজয় থেকে মুসলমানগণ যে শিক্ষা লাভ করেন তা পরবর্তী সময়ের সকল যুদ্ধে তাঁদের নিকট একটি অবিসরণীয় দৃঢ়ীভূত হয়ে থাকে।

উহুদের যুদ্ধের পর মহানবি (স.) ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য ৪০ জন বা ৭০ জন মুসলিম ধর্ম প্রচারককে নজদ পাঠান। বিবে মাউনা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে উক্ত দলটি আমির গোত্রের অন্যতম নেতা আমি ইবনে তোফায়েলের নিকট দৃত মারফত মহানবির (স.) একথানা (ইসলামের) দাওয়াতপত্র পাঠান। পত্র হস্তগত হবার সাথে সাথে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে দৃতকে হত্যা করে বিবে মাউনায় সৈন্যে গমন করে বাকি ৬৯ জনের মধ্যে ৬৭ জন মুসলমানকে হত্যা করে। বিনা যুদ্ধে এত বেশি শিক্ষিত মুসলমানদের শাহাদাত বরণ ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।



চিত্র : উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্র।

খনকের যুদ্ধ (৬২৭ খ্রিস্টাব্দ)

মুসলমান কানুন

কুরাইশদের আশকা : কুরাইশরা উহুদ যুদ্ধে সাময়িক জয়লাভ করলেও এতে তাদের আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়নি। তারা মক্কার সাথে মদিনাকে অক্রুক্ত করার জন্য এবং তাদের বাণিজ্য পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কোন সেনাবাহিনী মদিনায় ঝোঁকে যাওয়ানি। ফলে কুরাইশদের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ নিজেদের সংগঠিত করে পূর্বের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেন। মদিনায় মুসলমানদের এই শক্তি বৃদ্ধিতে মক্কার কুরাইশগণ ভীত সন্তুষ্ট হয়ে পড়ল। তারা মনে করল যে, মুসলমানদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তাদের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় সুবোগ-সুবিধা চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তারা শেববারের মতো মুসলিম সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করল।

বেনুইনদের শক্তি : মদিনার শহরতলীতে বসবাসকারী বেনুইনরা শুটভোজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের এ সব কার্যকলাপ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এমনকি করেকবার তাদেরকে এ জন্য শান্তি প্রদান করেন। সজ্ঞাত-কানুনে মুসলমানদের উপর বেনুইনরা অসন্তুষ্ট ছিল। প্রতিশেষ ধ্রুবের বাসনায় তারাও কুরাইশদের সাথে হাত মিলাল।

ইহুদিদের উসকানি : উহুদ যুদ্ধের পর মদিনা হতে বানু নাজির গোত্রের ইহুদিদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। তারা খাইবারের ওয়াদি উল কুরা ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথে এবং অন্যান্য জায়গায় বসতি স্থাপন করল। অবিলম্বে এসব ইহুদি স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। তাদের প্রোচনায় প্রভাবিত হয়ে সব ইহুদি গোত্রই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। উপরন্তু, তারা মক্কার কুরাইশদের মদিনা পুনরাবৃত্তির জন্য অনবরত উত্তেজিত করতে থাকে।

যুদ্ধের ঘটনা ৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ আবু সুফিয়ান কুরাইশ, ইহুদি ও বেদুইনদের একটি সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব দান করে ১০০০০ সৈন্যসহ মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। মহানবি (স) ৩০০০ সৈন্য সংগ্রহ করে এই সম্মিলিত বাহিনীকে প্রতিরোধ করার উপায় উচ্চাবনের লক্ষ্যে পরামর্শ সভা আহবান করেন। সভায় পারস্যবাসি হযরত সালমান ফারসি (রা)-এর পরামর্শ গৃহীত হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী, শহরের তিন দিকে অরক্ষিত স্থানে পরিখা খনন করা হয়। পরিখা অথবা খন্দক হতেই এ যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে ‘খন্দকের যুদ্ধ’। ইংরেজি ভাষায় এ যুদ্ধকে Battle of the confederates বা সম্মিলিত শক্তিসমূহের যুদ্ধ বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এটা ‘আহবাবের যুদ্ধ’ নামে অভিহিত হয়েছে। আত্মরক্ষামূলক এ ব্যবস্থায় শিশু ও নারীদের নিরাপদ দূর্গ ও গম্ভীর আশ্রয় প্রদান করা হয়। উচ্চাবনী শক্তির প্রতীক ও আত্মরক্ষার বলিষ্ঠ উপায়- এ পরিখা কুরাইশদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। আত্মরক্ষার এ অভিনব কৌশল দেখে বিধৰ্মী কুরাইশরা বিস্মিত হল। আপ্রাণ ঢেক্টা করেও তারা মদিনায় প্রবেশ করতে সমর্থ হল না। তিন সপ্তাহের অধিককাল মদিনা অবরোধ করে অবশেষে তারা রণে তঙ্গ দেয়। বেদুইন, কুরাইশ ও ইহুদিদের দ্বারা গঠিত ত্রি-শক্তির মধ্যে ঐক্যের অভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহানবি (স) এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, রণকৌশল, মুসলিম গোয়েন্দা বাহিনীর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মুসলিম বাহিনীর অসাধারণ ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ শত্রুপক্ষের পরাজয়ের পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

খন্দক যুদ্ধের ফলাফল

ইসলামের ইতিহাসে খন্দক যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

প্রথমত : ত্রি-শক্তির পরাজয় : বদরের যুদ্ধের মতো পরিখার যুদ্ধও ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিসরণীয় যুগান্তকারী ঘটনা। উহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা যেরূপ বদরের বিপর্যয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে তদুপ উহুদের পরাজয়ের ফলানিকে মুসলমানগণ পরিখার যুদ্ধে মোচনের ঢেক্টা করে। বদরের যুদ্ধ অপেক্ষা পরিখার যুদ্ধের গুরুত্ব কোন অংশে কম নহে। কারণ বদরের প্রাতরে মক্কার পাসিষ্ঠ কুরাইশদের পরাজিত করে ইসলামকে মদিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। অপরদিকে পরিখার যুদ্ধে বেদুইন, ইহুদি ও বির্দমী কুরাইশদের সম্মিলিত শক্তিকে ধ্বংস করা হয়। এস, এম, ইয়াম উদ্দিনের মতে, “এ সম্মিলিত বাহিনী (আহবাব) ভাঙ্গনের ফলে মক্কাবাসিদের সম্পূর্ণ পরাজয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং মদিনায় মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করে। অঞ্চলের মধ্যে ইসলাম সমগ্র আরবে তথা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বিস্তৃতি লাভ করে।”

দ্বিতীয়ত : শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসের বিজয় : পরিখার যুদ্ধের গুরুত্ব বিচার করে জোসেফ হেল বলেন, “পরিখার যুদ্ধের ফলাফল ছিল সংখ্যাধিক শক্তির উপর শৃঙ্খলা ও একতার নব বিজয়।” এর ফলে ইসলামের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। উহুদের যুদ্ধে যে কারণে মুসলমান গণ পরাজয় বরণ করে এর পুনরাবৃত্তি হলে পরিখার যুদ্ধে ইসলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, একতা, শৃঙ্খলা ও আত্মোৎসর্গের পরাকার্তা দেখিয়ে হ্যরত মুহাম্মদ (স) এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মুসলমানগণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বিজয় সুনিশ্চিত করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহুদিদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সম্পর্ক

যদিও বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মীমাংসিত বিজয়ের ফলে মক্কার কুরাইশদের শক্তি খর্ব হয়ে পড়েছিল, তথাপি হযরত মুহাম্মদ (স.) নতুন বিপদের সম্মুখীন হতে লাগলেন। বদর হতে প্রত্যাগত বিজয়ী বীর হযরত মুহাম্মদ (স.) এর শক্তি দেখে ইহুদিগণ অস্থির হয়ে উঠল। তারা আশংকা করছিল যে মুহাম্মদ (স.) এর এ অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত বিজয়ের ফলে হয়তো এখন হতে মুসলমানগণ তাদের উপর প্রভৃতি করবে। প্রথমে ইহুদিগণ মনে করল যে, মদিনাতে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ক্ষমতা ঝণাত্তুক হবে এবং তারা তাঁকে নিজেদের দলে আনতে পারবে। কিন্তু ইহুদিগণ যখন দেখল তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না, তখন তারা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বিকল্পাচরণ করতে আরম্ভ করল। তারা ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। ধীরে ধীরে মুসলমানদের নিকট তাদের চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপটি উন্মোচিত করতে লাগল। ব্যাপারটি এতই গুরুতর হয়ে উঠল যে, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সঙ্গে সাক্ষরিত সম্মিতি তারাই প্রথম ভঙ্গ করল।

ইহুদি গোত্রসমূহ

বানু কাইনুকা : মদিনার বানু কাইনুকা ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিল। বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এ সম্প্রদায়ের একজন ইহুদি যুবক জনৈক মুসলিম তরুণীকে বাজারে প্রকাশ্যভাবে অপমান করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন মুসলমান ও একজন ইহুদি নিহত হলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে ইহুদিরা যুদ্ধের হুমকি দিলে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। হযরত মুহাম্মদ (স.) ঘৰং বানু কাইনুকাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা মদিনা ত্যাগ করার আদেশ প্রদান করেন। মুসলিম প্রজাতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতক এ ইহুদি সম্প্রদায় পনের দিন নিজেদের দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার পর ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে (তৃতীয় হিজরি) তাদেরকে মদিনা হতে বিতাড়িত করা হয়। অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বানু নাজির : ইহুদিদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে মদিনার মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের পর মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে বানু নাজির গোত্রের কাঁ'ব ইবন আশরাফ বীর গাঁথা রচনা করে বিধীনের উৎসাহ দান করে। আবু রাফি সাল্লাম নামক একজন নাজির গোত্রীয় ইহুদি সুলাইম ও গাতফান প্রভৃতি আরব বেদুইন গোত্রগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। হঠকারিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত ইসলামের এ দুই পরম শত্রুকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করা হয়। নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উপরন্তু: উত্তুদের যুদ্ধে বানু নাজিরের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে সনদের শর্তভঙ্গ করলে মহানবি (স.) বানু নাজিরের মহল্লায় উপস্থিত হয়ে তাদের অংশের মুক্তিপণ দিতে অনুরোধ জানান। তথায় আমর বিন জাহাশ মহানবি (স.) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। সৌভাগ্যক্রমে মহানবি (স.) এ দূরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তাদেরকে মদিনা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করে তারা আবদুল্লাহর নেতৃত্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে মহানবি (স.) তাদেরকে অবরোধ করতে বাধ্য হন। অবশেষে তাদেরকে মদিনা হতে বহিষ্কার করা হয়। মদিনা হতে বিতাড়িত হয়ে তারা সিরিয়া ও খাইবারে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। হিজরি চতুর্থ বছরে (৬২৬ খ্রিস্টাব্দে) বানু নাজির গোত্রের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বানু কুরাইয়া : ইহুদিদের অপর প্রতাবশালী গোত্র ছিল মদিনার বিশ্বাসাতক বানু কুরাইয়া। খন্দকের যুদ্ধে এ ইহুদি গোত্র পৌত্রিক, কুরাইশ ও বেদুইনদের সঙ্গে যিলিত হয়ে ত্রি-শক্তির সংঘ গঠন করে এবং ইসলামকে নিষ্ঠিত করার সকল প্রকার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ত্রি-শক্তির সংঘের শোচনীয় পরাজয়ের পর হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এ বিশ্বাসাতক বানু কুরাইয়াকে সমুচ্চিত শান্তি প্রদানের জন্য মদিনা ত্যাগ করতে আদেশ দেন কিন্তু আদেশ অমান্য করলে তাদের দুর্গ অবরোধ করা হয়। আত্মসমর্পণ করলে হ্যরত (স.) ইহুদিদের ইচ্ছানুযায়ী আউস গোত্রের দলপতি সাদ বিন মুয়াজ (রা.) এর উপর বিশ্বাসাতকতার অপরাধে বিচার ভার ন্যস্ত করেন। তাঁর বিচারে ইসলামের বিরোধিতাকারী ইহুদিদের প্রায় ২৫০ ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করা হয়।

মৃল্যাঘন : ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও নিরপেক্ষ সমালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদিদের বিরুদ্ধে যে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা তাদের জিঘাংসামূলক ব্যবহার, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসাতকতার তুলনায় অতি নগণ্য। ইহুদিদের জ্যৰ্থন্য রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা- (১) মদিনা সনদের পরিপন্থী ইহুদি গোত্র মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে মুসলমানদের গুপ্ত ঝৰ্ব কুরাইশদের পরিবেশন করত। গুপ্তচর বৃত্তি বিশ্বাসাতকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত : (২) কাঁব ইবন আশরাফ বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের বিপর্যয়ে মক্কায় গমন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিধৰ্মীদের প্ররোচিত করতে থাকে, (৩) মুসলিম তরঙ্গীর শালীনতা হানির চেষ্টা, (৪) আবু রাফি সাল্লাম কর্তৃক আরব বেদুইন গোত্র সুলাইম ও গাতফানকে ইসলামের বিরুদ্ধে উভেজিত করে তোলা, (৫) আমর বিন জাহাশ গৃহ চূড়ায় আরোহণ করে হ্যরত (স.) কে হত্যার চেষ্টা করে, (৬) বিরে মাউনায় আরব বেদুইন গোত্র কর্তৃক মুসলিম ধর্মপ্রচারকের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল বানু সুলাইম এবং তাতে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ছিল বলে মনে করা হয়, (৭) বিরে মাউনা হতে আজ্ঞারক্ষা করে একজন মুসলমান ভুলক্রমে বানু আমির গোত্রের দুইজনকে হত্যা করেন। হ্যরত (স.) ইহুদি ও মুসলমানদের উভয়কে সনদের শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ করেন। কিন্তু বানু নাজির গোত্র সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে অসীকার করে। হ্যরত (স.) স্বয়ং ক্ষতিপূরণ আদায় করতে গেলে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়, (৮) খাইবার হতে বহিস্কৃত হয়ে মদিনার উপকণ্ঠে ইহুদিগণ মুসলমানদের বাড়িঘর লুণ্ঠন করত এবং আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করত, (৯) ইহুদিদের প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসাতকতার জুলন্ত দৃষ্টান্ত খায়বারের যুদ্ধ, (১০) খায়বারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার হীন চক্রান্ত করে।

কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে, “নিশ্চয় মুখে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) তারা জ্যৰ্থন্য ধূগা বা হিংসা প্রকাশ করেছে এবং অন্তরে তাদের (মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধূগা) আরও অধিক। হিংসাত্মক ও বিদ্রোহজনক কার্যকলাপের তুলনায় ইহুদিদের প্রতি হ্যরত (স.) খুবই মানবোচিত শান্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ডল্লিউ মুইর বলেন, যে কারণে মুহাম্মদ (স.) ইহুদিগণকে শান্তি প্রদান করেন তা রাজনৈতিক, ধর্মীয় নহে। অতএব ইহুদিদের প্রতি মহানবি (স.) কঠোর ও অন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে স্পেক্টাকুল, উইল প্রমুখ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যে মন্তব্য করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্রিষ্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক

ইসলামের প্রথম যুগে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্ভাব ছিল। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) খ্রিস্টান আবিসিনীয় সম্রাট নাজ্জাসির সহন্দয়তার কথা বিস্তৃত হননি। কারণ তিনি তার রাজ্যে হিজরতকারী মুসলমানদের আশ্রয় দান করেন। মদিনায় হিজরত করার পর স্থানীয় খ্রিস্টানগণ হ্যরতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করত এবং মুসলমানদের সঙ্গে বশ্যুত্ত রক্ষা করে চলত। খ্রিস্টানদের সহন্দয়তা ও বশ্যুত্পূর্ণ মনোভাবে প্রীত হয়ে হ্যরত (স.) ষষ্ঠ হিজরিতে সিনাই পাহাড়ের সন্নিকটে সেটে ক্যাথরিন মঠের সন্ম্যাসিদের এবং অন্যান্য খ্রিস্টানদের একটি সনদ প্রদান করেন।

এ সনদে খ্রিস্টানদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। সনদের শর্তভঙ্গকারী মুসলমানদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। খ্রিস্টানদের জীবন ও ধন সম্পত্তি রক্ষার ভার হয়েরত মুহাম্মদ (স.) স্বয়ং গ্রহণ করেন। এ সনদের মাধ্যমে তিনি নিজে এবং মুসলিম জাতি খ্রিস্টানদের বাসস্থান, মঠ, গির্জা এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। অতিরিক্ত কর আদায়, স্বর্ধম ত্যাগে বাধ্যকরণ, ধর্মাজ্ঞকের পদ হতে বহিষ্কার, গির্জা ধ্বংস করে মসজিদ অথবা মুসলমানদের গৃহ নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। নির্বিশ্বে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ধর্মান্তরিত না হয়েও খ্রিস্টান মহিলাদের মুসলমানকে বিবাহ করার অধিকার প্রদান করা হয়। আরবের বাইরে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের বিরোধ সংঘটিত হলে আরবের খ্রিস্টানদের উপর কোন অত্যাচার করা হবে না বলে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, খ্রিস্টানদের প্রতি হয়েরত মুহাম্মদ (স.) যে উদারতা, মহানুভবতা ও সহৃদয়তার পরিচয় এ সনদে প্রদান করেন, তা অসাধারণ সহিষ্ণুতার অভ্যুৎকৃষ্ট কীর্তিস্তুতি স্বরূপ। বস্তুতপক্ষে, হয়েরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে প্রদত্ত সনদ পরধর্মের প্রতি তার সীমাহীন সহনশীলতার এক উজ্জ্বল দ্রষ্টান্ত।

হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রিস্টাব্দ)

সন্ধির পটভূমি : ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে (ষষ্ঠ হিজরীতে) মহানবি (স.) মাতৃভূমি দর্শন ও হজ্জ পালনের জন্যে ১৪০০ সাহাবা নিয়ে হজ্জের পোশাক পরিধান করে ও কুরবাণী পশু নিয়ে তারী যুদ্ধাত্মের পরিবর্তে কেবল খাপেবন্ধ তরবারিসহ মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ছয় বৎসর পূর্বে মুহাজিরগণ ঘরবাড়ি, আল্লায়-হজ্জন ও বন্ধু বাস্থবের মায়া কাটিয়ে ইসলামের জন্য মক্কা থেকে মদিনায় হজরত করেছিলেন। তাদের মন দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ইতোমধ্যে মক্কা (বায়তুল্লাহ শরীফ) কিবলা বলে নির্ধারিত হয়েছে। এসব কারণেও স্বপ্নে মক্কায় প্রবেশের ইঙ্গিত পেয়ে তিনি সাহাবিদের নিয়ে মক্কায় রওয়া হন। পবিত্র জিলকদ মাসে প্রাচীন আরব প্রথানুযায়ী যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কুরাইশগণ কর্তৃক খালিদ ও ইকরামার নেতৃত্বে একদল সৈন্য হয়েরত মুহাম্মদ (স.) এর গতিরোধের জন্য প্রেরিত হল। কেননা, কুরাইশদের ধারণা হল এটি আরব গোত্রসমূহের সামনে তাদের পদমর্যাদাকে অবনমিত করার একটি চাতুর্যপূর্ণ চালমাত্র। মক্কার সন্নিকটে খুজাহ গোত্রের বুদাইল বিন ওয়াকার নিকট কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পেয়ে মহানবি (স.) পথ পরিবর্তন করে মক্কার নয় মাইল অন্তরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। “হুদায়বিয়া নামক একটি কৃপের নামানুসারে অঞ্চলটি হুদায়বিয়া নামে পরিচিত।

কুরাইশদের দূরত্বসম্মিল্য জানতে পেরে হয়েরত বুদাইলকে দূরবৃপ্তে পাঠিয়ে হয়েরত মুহাম্মদ (স.) কুরাইশদের জানালেন যে, তারা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, যুদ্ধ করতে মক্কায় আসেনি। শুধু হজ্জ বা পবিত্র কাব্বাগৃহ পরিদর্শন করতে এসেছেন। হয়রতের সততায় বিশ্বাস করে কুরাইশগণ ওরওয়া বিন মাসুদকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে মহানবি (স.) এর নিকট পাঠান। সাহাবিদের বিশ্বস্ততা ও সদিচ্ছার প্রতি কটাক্ষ করে ওরওয়া কটুস্তি করলে সন্ধি চুক্তির প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মহানবি (স.) প্রথমে হয়েরত খারাশ বিন উমাইয়া অল খোয়াস্তিকে এবং পরে হয়েরত উসমান (রা.) কে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেন। হয়েরত উসমান (রা.) এর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হলে মুসলিম শিবিরে রব উঠল যে, মুশরিকরা হয়েরত উসমানকে হত্যা করেছে। ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং বীর মুসলিম যোদ্ধাগণ নিরস্ত্র হলেও দীপ্তকষ্টে শপথ গ্রহণ করলেন যে তাঁরা হয়েরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এ শপথকে বাইয়াতুর রিদওয়ান অথবা বৃক্ষের নিচে শপথ গ্রহণ করা হয় বলে বাইয়াতুশ শাজারা বলে অভিহিত করা হয়। মুসলমানদের দৃঢ় শপথে শক্তিত হয়ে কুরাইশগণ হয়েরত উসমান (রা.) কে মুক্তি দিয়ে সুহাইল বিন আমরকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে পাঠান। অনেক বাকবিতভার পর মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল।

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তাবলি

মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১. এই বছর (৬২৮ খ্রিস্টাব্দে) মুসলমানগণ হজ সম্পাদন না করে মদিনা প্রত্যাবর্তন করবে।
২. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে আগামী দশ বছর পর্যন্ত যে কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
৩. যদি মুসলমানগণ ইচ্ছা করে তা হলে তিনদিনের জন্য পরের বছর (৬২৯ খ্রিস্টাব্দে) মকায় হজ পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করতে পারবে। মুসলমানদের অবস্থানকালে কুরাইশগণ মক্কা নগরী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিবে।
৪. আগমনকালে মুসলমানগণ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য কোষবন্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোন মরণাত্মক আনতে পারবে না।
৫. হজের সময় মুসলমানদের জান মালের নিরাপত্তা বিধান করা হবে এবং মক্কার বণিকগণ নির্বিশে মদিনার পথ ধরে সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।
৬. চুক্তির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং একে অপরের ক্ষতি সাধন করবে না। কোনো প্রকার লুঠন অথবা আক্রমণ চালাবে না।
৭. আরবের যে কোনো গোত্রের লোক মুহাম্মদ (স.) অথবা কুরাইশদের সঙ্গে সান্ধিসূত্রে আবন্ধ হতে পারবে।
৮. কোন মক্কাবাসী মদিনায় আশ্রয় প্রহর করলে কুরাইশরা চাইলে মদিনার মুসলমানগণ তাকে ফেরত দিবে, পক্ষান্তরে কোন মুসলিম মদিনা হতে মক্কায় আগমন করলে মক্কাবাসী তাকে প্রত্যাপনে বাধ্য থাকবে না।
৯. মক্কার কোনো নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুসলমানদের দলে যোগদান করতে পারবে না, করলে তাকে ফেরত দিতে হবে।
১০. সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষকে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

হুদায়বিয়া সন্ধির তাৎপর্য ও গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়া সন্ধির তাৎপর্য ও গুরুত্ব সুদৃঢ়প্রসারী

দীর্ঘমেয়ানী যুদ্ধাবস্থার অবসান : হুদায়বিয়ার সন্ধির তাৎপর্য আলোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, এতে বিধৰ্মী ও মুসলমানদের মধ্যে অন্ততপক্ষে দশ বছরের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়। যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে কুরাইশ ও হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সদিচ্ছা প্রকাশ পায়। কুরাইশগণ যুদ্ধ করতে করতে ঝাল্লান হয়ে পড়েছিল। বিরামহীন যুদ্ধে তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও সুসংহতকরণের জন্য শক্তামৃত্ত ও উদ্বেগহীন কিছু সময় মুসলমানদেরও প্রয়োজন ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধি উভয়পক্ষকে স্ব স্ব কাজে সময়ের সম্বৃদ্ধারের সুযোগ এনে দেয়। মহানবি (স.) ১৪০০ জন বিশ্বাসী নিয়ে মাত্তুমিতে গমন করেন এবং মক্কাবাসী ও মুসলমানদের সমআধিকারের ভিত্তিতে হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদিত করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে নিজস্ব গোত্র কুরাইশদের সঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (স.) যুদ্ধবিরতির সূচনা করেন।

মহাবিজয় ৪ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিভার পরিচায়ক এ হুদায়বিয়ার সম্বিধানে মাত্তুম মুবিন বা প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আলোচ্য সম্বিধান আপাতত মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং অপমানজনক বলে প্রতীয়মান হলেও এটা ছিল ইসলামের নিরঙ্কুশ বিজয়ের সংকেতসমূহ। এই সম্বিধানবি (স.) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। ঐতিহাসিক যত্নীয় বর্ণনা মতে, ইসলামের পূর্ববর্তী এমন কি পরবর্তী কোন বিজয়ই এর চেমে বৃহত্তর ছিল না। এনসাইক্লোপেডিয়ার স্বেচ্ছাকৃত লেখক বলেন— আপাত দ্রষ্টিতে মনে হল যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) লজ্জাজনকভাবে পশ্চাত্পদ করেছিলেন, কিন্তু শিগগির প্রতিভাত হলো যে, সুবিধাগুলো মুহাম্মদ (স.) এর পক্ষেই ছিল। বাস্তবিক এই সম্বিধানটি ছিল কৌশলপূর্ণ পশ্চাত্পদ কিন্তু রণচাতুর্যপূর্ণ বিজয়।

আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ৪ চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল যে, অনুমতি ব্যক্তিত কোনো কুরাইশ মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে হযরত মুহাম্মদ (স.) তাকে ফিরিয়ে দিবেন এবং কোনো মুসলমান মকায় আসলে কুরাইশগণ তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। বিবেচনা করে দেখলে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন। চুক্তি মোতাবেক দেশত্যাগী মদিনার মুসলমানগণ মকায় প্রত্যাবর্তন না করায় কুরাইশগণ বিস্মিত হয়েছিল।

রাষ্ট্র হিসেবে মদিনার স্বীকৃতি জাত ৪ এই সম্বিধান দ্বারা সমগ্র আরবের দ্রষ্টিতে মদিনা রাষ্ট্র মকায় রাষ্ট্রের সম্পর্যায়ে উন্নীত হল। এই চুক্তির ফলে কুরাইশগণ সর্ব প্রথম মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং মুহাম্মদ (স.) কে এর নেতৃত্ব দিতে বাধ্য করে নেওয়া হয়েছিল। ইতোপূর্বে আরবের রাজনীতি মকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। এখন থেকে মদিনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে দাগল।

ধর্ম হিসেবে ইসলামের সাক্ষ্য ৪ হুদায়বিয়ার সম্বিধান অন্যতম প্রধান তাৎপর্য ছিল, ইসলামের বিস্তৃতি ও প্রসারতা। শর্তগুলো ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরিপন্থী ছিল না। বরং পরোক্ষভাবে প্রেরণাদায়ক ছিল। আরবের যে কোনো গোত্র হযরত মুহাম্মদ (স.) অধিবাস কুরাইশদের সঙ্গে সম্বিধান সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে— এ শর্তটির ফলে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পক্ষে গত আঠার বছরে যা করা সম্ভব হয়নি তা মাত্র দুবছরে সম্ভব হয়েছিল। এ শর্ত মোতাবেক বানু খুয়ায়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। মুসলমানদের সঙ্গে বেদুইন গোত্রের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকার ফলে ইসলামের পরিসর বৃদ্ধি পায়। সম্বিধান শর্তানুযায়ী নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস প্রচারে অবাধ সুযোগ লাভ করলে বিশেষ করে যুদ্ধে লিপ্ত পৌত্রলিক আরববাসীরা ইসলামের অস্তিনিহিত গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। হুদায়বিয়ার সম্বিধান গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হুদায়বিয়ার সম্বিধান ফলে আমরা যেবুং জয়ী হয়েছিলাম সেরূপ কখনো হয়নি।

শ্রেষ্ঠ বীরদের ইসলাম গ্রহণ ৪ এ সম্বিধান স্বাক্ষরিত হবার পর খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আসের মতো শ্রেষ্ঠ বীরদের ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইবনে হিশাম বলেন হযরত মুহাম্মদ (স.) যেখানে ১৪০০ সাহাবি নিয়ে হুদায়বিয়ায় গমন করেছিলেন দু বছর পর মকায় বিজয়ে ১০০০০ সাহাবী তাঁর আনুগত্য করেছিল। আঠার বছর কঠোর ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফলে শিষ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০০ তে, কিন্তু এ চুক্তির ফলে মাত্র দু বছরে (৬২৯-৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলমানদের সংখ্যা হয়েছিল ১০,০০০। নিঃসন্দেহে এটি মহাবিজয়।

দৃত প্রেরণ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

হুদায়বিয়ার সম্বিধান পর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স.) নিম্নলিখিত দৃতদের তাদের নামের পাশে উল্লিখিত রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরণ করেন।

১. হ্যরত দাহিয়া ইবনে খলিফা কালবী (রা) : রোমের সম্রাট হিরাক্রিয়াস।
২. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে হ্যাফা (রা) : ইরানের সম্রাট কিসরা (খসরু পারভেজ)
৩. হ্যরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রা.) : আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশী।
৪. হ্যরত হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রা.) : মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাওকিস।
৫. হ্যরত সালীত ইবনে আস সাহমী (রা.) : ওমানের বাদশাহ জায়কর।
৬. হ্যরত সালীত ইবনে আমর (রা.) : ইয়ামায়ার সরদার হাইজা ইবনে আলী।
৭. হ্যরত আলা ইবনে হায়রামী (রা.) : বাহরাইনের শাসক মুনজির ইবনে সাবী
৮. হ্যরত শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদী (রা.) : গাসসানের শাসক হারিছ গাসসানী।
৯. হ্যরত মুহাজির ইবনে উমাইয়া মাখযুমী (রা.) : ইয়ামেনের শাসক হারিছ হিমাইয়ারী।

আবিসিনিয়ার নগতি নাজাশী নবি করীম (স.) এর পত্র পেয়ে ইসলাম কবুল করেন। রোমান সম্রাট হিরাক্রিয়াস রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণে অপারগতার কথা জানান। অগ্নি উপাসক পারস্য রাজা দ্বিতীয় খসরু রাসুল্লাহর পত্র ছিড়ে ফেলে। ইহা শ্রবণ করে রাসুল (স.) বলেন যে, আমার পত্রকে যেমন সে ছিড়ে ফেলেছে ঠিক তেমনি মুসলমানদের হাতে তার রাজ্যও ছিন্ন ভিন্ন হবে। পরবর্তীতে হ্যরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে সম্রাট ইরান সম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে। রাজনৈতিক কারণে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মুকাওকিস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। গাসসানের শাসনকর্তা হারিছ এবং ইয়ামায়ার শাসনকর্তা হাইজা মুসলিম দৃতকে জন্ম্যতাবে অপমানিত করেন। রোমান সাম্রাজ্য সুরাহবিল মুসলিম দৃতকে হত্যা করে। এর ফলে খ্রিস্টান জগতের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিস্টাব্দ)

ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বদা ঘড়্যন্ত ও বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত ইহুদি সম্প্রদায় মদিনা হতে বিতাড়িত হয়ে সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী খাইবার নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। বানু নাজির ও বানু কুরাইয়া গোত্রের ইহুদিগণ ইসলামকে ধর্ম করার উদ্দেশ্যে মুনাফিক দলের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং গাতফান ও অন্যান্য বেদুইন গোত্রের সঙ্গে ঘড়্যন্ত শুরু করে। তারা খন্দকের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে বেদুইন গোত্রের সহযোগিতায় ৪০০০ সৈন্যের একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। এ সংবাদ শুনে ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে (৭ম হিজরির মহররম মাসে) হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ইহুদিদের সম্মুলে ধর্ম করার জন্য ২০০ অশ্বারোহীসহ ১,৬০০ মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে খাইবায়ের দিকে যাত্রা করেন। ইহুদিদের অবরুদ্ধ করা হয়। আল কামুস দুর্গসহ ইহুদিদের সকল দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়। হ্যরত আলী (রা.) বীরবিক্রমে এ যুদ্ধ করেন বলে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) তাকে আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁকে বিখ্যাত জুলফিকার তরবারি প্রদান করেন।

এই যুদ্ধে ইহুদি সম্প্রদায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মহানবি (স.) তাদেরকে ক্ষমা করে নির্বিঘ্নে তথায় বসবাস করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ইহুদিগণ হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কে হত্যা করার ঘড়্যন্ত করে। হারিছের কন্যা জয়নব খাইবারের যুদ্ধে পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বিষ প্রয়োগে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কে হত্যা করার চেষ্টা করে। খাদ্যে বিষ প্রয়োগের ফলে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর এক সাহবি নিহত হলেন। কিন্তু বিষ মিশ্রিত সামান্য খাদ্য মুখে দেওয়ায় সৌভাগ্যক্রমে

মহানবি (স.) এর জীবন রক্ষা পায়। সাহাবীর মৃত্যুর জন্য জয়নবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু সমগ্র ইহুদিদের উপর কোন প্রকার অভ্যাচার করা হয়নি। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মহানূত্ববতার এটি একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক তাবারীর মতে, জয়নবকে ক্ষমা করা হয়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, নবির জীবন রক্ষা পেল কিন্তু বিমের ক্রিয়া তার শরীরে বিস্তৃতি লাভ করায় পরবর্তী জীবনে এর মারাত্ক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইহুদিদের বিপর্যয়ের পর তাদের উপর বাধ্যতামূলক কর প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়। কর প্রদান পূর্বক ইহুদিদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ এবং জানমালের নিরাপত্তার নিষ্পত্তা দান করা হয়।

মুলতবী ওমরাহ

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে' ৭ম হিজরীর জিলকদ মাসে ২০০০ সাহাবি নিয়ে কায়া ওমরাহ পালনের জন্য মকায় যাত্রা করেন এবং তিনিদিন অবস্থানের পর মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মুইরের বর্ণনায় মকার উপত্যকায় সংঘটিত ইহা (ওমরাহ পালন) একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা সত্য অসাধারণ দৃশ্য ছিল। মকার উচ্চ ও নীচ সকল নাগরিক স্ব স্ব বাসস্থান ত্যাগ করে তিনিদিনের জন্য প্রাচীন শহরের বাইরে চলে যায়। অন্যদিকে মুহাজিরগণ বহুদিন পর জন্মভূমিতে আসেন। শৈশবের বেলাভূমি পরিদর্শন করলেন এবং নির্ধারিত স্থানে কায়া ওমরাহ পালন করলেন। মকাবাসীরা মুসলমানদের দৈর্ঘ্য, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)

হুদায়বিয়ার সন্ধি (মার্চ ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে মক্কা বিজয় (জানুয়ারি ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ে মুসলমানগণ যে ১৭টি অভিযান পরিচালনা করে তন্মধ্যে মুতা অভিযান ছিল অন্যতম। রোমান সামন্তরাজ সুরাহবিল বিন আমর মহানবি (স.) এর প্রেরিত দৃত হযরত হারিস বিন উমাইয়াকে মুতায় নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ বিশ্বাসঘাতকতামূলক হত্যার উপর্যুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করে হযরত মুহাম্মদ (স.) সহ যুদ্ধ পরিচালনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশত এ বাহিনী নেতৃত্ব প্রদান করা হয় তার দণ্ডক পুত্র হযরত জায়িদ বিন হারিসকে। আরব উপজাতি ও বায়জান্টাইনদের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় এক লক্ষাধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে মুসলমানগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। একের পর এক তাদের প্রিয় সেনাপতি হযরত জায়িদ বিন হারিস, হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা শহীদ হন। সমূহ বিপর্যয় হতে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করেন বীরশ্রেষ্ঠ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। অসীম বীরত্ব ও দক্ষতা প্রদর্শন করে খালিদ মুতার যুদ্ধে ইসলামের বিজয় পতাকা উঠান্ন করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর তেজস্বিতা ও বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সাইফুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তরবারি খেতাবে ভূষিত করেন।

মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

পটভূমি : ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত বদরের যুদ্ধ হতে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার অভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। বদরের যুদ্ধ কুরাইশ গোত্রকে দুটি দলে বিভক্ত করে। বদরের যুদ্ধে মখজুম গোত্রের সাফওয়ান সঙ্গে আন্দুস শামস গোত্রের আবু সুফিয়ানের যে বৈরীভাবের উচ্চব হয়, উহুদের যুদ্ধে তা আরও প্রচড় আকার ধারণ করে। মূলত আভ্যন্তরীণ গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও

রাজনৈতিক অনেকেয়ের ফলে কুরাইশদের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। ৬২৮ খ্রিঃ মক্কাবাসীরা সাফওয়ান, সুহাইল এবং আবু জাহলের পুত্র ইকরামার নেতৃত্বে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে হজ পালনে বাধা দান করে। পরিশেষে তারা সম্মিলিত করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই সম্মিলিত সম্পাদনে আবু সুফিয়ানের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি। আবু সুফিয়ানের নিষ্ঠিতার মূলে ছিল তার কন্যা উমে হাবিবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রভাব। পরবর্তীকালে উমে হাবিবা মহানবি হযরত (স.) এর সহধর্মীনী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হুদায়বিয়ার সম্মিলিত শুধুমাত্র হজ পালনের নিষ্ঠিতা দান করে নি, মক্কা বিজয়েরও সূচনা করে। মক্কার পৌত্রলিঙ্গগণ পিতৃধর্মকে পরিত্যাগ করতে পারিনি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ মক্কাবাসীগণ মহানবি (স.) এর সত্য প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। বিশেষ করে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) ও হযরত উসমান বিন তালহা (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ বিধিমৌদ্রের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

মক্কা বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল হুদায়বিয়ার সম্মিলিত চুক্তির অবমাননা। বানু খুয়ায়া নবিজীর সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। আবার বানু বকর কুরাইশদের প্রতি অনুগত ছিল। এ বানু খুয়ায়ার প্রতি বকর গোত্রের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার মক্কা অভিযান এবং বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। বকর গোত্রের একজন কবি ব্যজ্ঞাত্বক কবিতা রচনা করে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর অবমাননা করলে বানু খুয়ায়া লোকেরা তাকে হত্যা করে। এর ফলে নওফিল বিন মুয়াবিয়া গোপনে কুরাইশদের সাহায্যে বানু খুয়ায়াকে আক্রমণ করে। হুদায়বিয়ার সম্মিলিত স্বাক্ষরকারী সাফওয়ান, সুহাইল ও ইকরামা প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যভাবে বানু বকরকে সহায়তা করলে সম্মিলিত শর্ত ভঙ্গ হয়। এ পরিস্থিতিতে মহানবি (স.) হুদায়বিয়ার সম্মিলিত শর্তাবলী বানু খুয়ায়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

অবশ্য যুদ্ধ এড়াবার জন্য মহানবি (স.) কুরাইশদের নিকট তিনটি প্রস্তাব সম্বলিত একটি পত্রসহ শাস্তিদূত প্রেরণ করেন। প্রস্তাবগুলো ছিল (১) অন্যায়ভাবে নিহত বানু খুয়ায়ার লোকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অথবা (২) বানু বকর সম্পদায়কে সকল প্রকার সাহায্য প্রদানে বিরত থাকতে হবে। (৩) হুদায়বিয়ার সম্মিলিত শর্তাবলি বাতিল বলে ঘোষিত হবে।

মহানবি (স.) এর দৃত মক্কা হতে মদিনায় ফিরে এসে জানালেন যে, কুরাইশগণ ত্রুটীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন। এর ফলে হযরত মুহাম্মদ (স.) বহু আকাঞ্চিত মক্কা অভিযানের সমষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মদিনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলেও মক্কা বিজয় ব্যতীত আরবে ইসলাম সুন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইত্যবসরে মক্কাবাসীদের বিভেদ ও বৈষম্যের কথা উপলব্ধি করে আবু সুফিয়ান স্বয়ং মদিনায় গমন করে শাপি প্রস্তাব করলে হযরত মুহাম্মদ (স.) তা প্রত্যাখান করেন এবং ১০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি (১০ই রমজান, অষ্টম হিজরি) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মক্কা বিজয়ের ঘটনা

মহানবি (স.) মক্কার উপকণ্ঠে শিবির সন্নিবেশ করেন। তাঁর এই বিশাল বাহিনীকে কুরাইশগণ সরাসরি বাধা প্রদান করতে সাহস পেল না। আবু সুফিয়ান দুজন অনুচরসহ মুসলিম শিবিরের পরিস্থিতি দেখতে এসে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বন্দি হয়ে মহানবি (স.) এর নিকট প্রেরিত হন। মহানবি (স.) তাকে ক্ষমা করে দিলে তিনি বিমুক্ষ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর মহানবি (স.)

তাঁর শ্রিয় জন্মভূমি মকায় প্রবেশ করেন। আবু সুফিয়ান তাঁকে মকায় স্বাগত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সাফওয়ান, ইকরামা এবং সুহাইল একত্রিত হয়ে মাখযুমগোত্রের লোকজনসহ হযরত মুহাম্মদ (স.) কে বাধা প্রদানে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে হযরত আবাস (রা.) ইসলাম ধর্ম প্রচারণ করে মকায় গমন করেন এবং কুরাইশদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন, অবরুদ্ধ মক্কা নগরীর দক্ষিণাংশে খালিদ, উত্তরাংশে জুবাইর এবং আল্লাহর রাসুল (স.) স্বয়ং আনসার ও মুহাজিরিন এবং বানু খুয়ায়া দ্বারা গঠিত সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছেন। আবু সুফিয়ানও আত্মসমর্পণের জন্য কুরাইশদের উদ্বৃদ্ধ করেন। মুসলমানগণ যখন নগরে প্রবেশ করতে থাকেন, তখন ইকরামার নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক কুরাইশ বিক্ষিপ্তভাবে মক্কার দক্ষিণ ফটকে বাধা দান করেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) বীরবিক্রমে সমন্ব্য প্রতিবন্ধকতা দ্বার করেন। প্রায় বিনা বাধায় ও বিনা রক্তপাতে দীর্ঘ আট বছর পর মুসলমানগণ মক্কা বিজয় করেন। মহানবি (স.) মক্কাবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন, (১) যে অন্ত্র ত্যাগ করবে তার জন্য ভয় নেই (২) যে কাবায় প্রবেশ করবে সে নিরাপদ (৩) যে নিজেকে গৃহে আবদ্ধ রাখবে সেও নিরাপদ (৪) যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে তারাও অতয়প্রাপ্ত। মহানবি (স.) কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা মহানুভবতার এক অবিসরণীয় দৃষ্টান্ত।

মক্কা বিজয়ের তাত্পর্য ও গুরুত্ব : শ্রিয় মাত্তুমি মক্কা হতে নির্বাসিত হযরত মুহাম্মদ (স.) দীর্ঘ আট বছর পর বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। অধ্যাপক পি.কে.হিটি মক্কা বিজয়কে প্রাচীন ইতিহাসে একটি তুলনাবিহীন মহাবিজয় বলে অভিহিত করেন। সীজার, আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ানের দেশ জয় নিরীহ জনসাধারণের রক্তপাতের ইতিহাস। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.) নির্বিশ্বে ও বিনা প্রতিবন্ধকতায় মদিনা হতে অভিযান করে মক্কা বিজয় করেন। মক্কা বিজয় সমগ্র আরব দেশ বিজয়ের সমতুল্য ছিল।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব : মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিসরণীয় ঘটনা। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। হুদায়বিয়ার সমিথিতে মক্কা বিজয় দ্বারা ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার বীজ নিহিত ছিল। এছাড়া হযরত মুহাম্মদ (স.) উপনৰ্থি করেন যে, নব প্রতিষ্ঠিত ধর্মের শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে মক্কার সামরিক শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে এবং মক্কা আয়তে আসলে বর্হিবিশ্বেও তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। উদারতা, মহানুভবতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স.) বিধৰ্মী কুরাইশদের মন জয় করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) মকায় প্রবেশ করে পবিত্র হারাম শরীফ গমন করে সাতবার কাঁ'বা তাওয়াফ করেন এবং সেখানে অবস্থিত ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি অপসারণ করার আদেশ দেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) একখানি লাঠি দিয়ে দেব মূর্তিগুলোর সম্মুখে গেলেন এবং সেই লাঠির অগ্রভাগের আঘাতে মূর্তিগুলো ভূপাতিত হতে লাগল। সে সময় হযরত (স.) “সত্য উপস্থিত হয়েছে অসত্য লোপ পেয়েছে, নিশ্চয়ই অসত্য লুপ্ত হবে” এ আয়াতটি পড়তে লাগলেন। হযরত আবাস (রা.) বলেন, যেদিন হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা জয় করেন, সেইদিনই তিনি কাবাগৃহে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি ধ্বংস করেন। আরববাসিগণ ঐ দেব-মূর্তির পূজা করত এবং তাদের নিকট বলি দিত। দেব মূর্তি ছাড়া কাঁ'বা গৃহের দেয়ালে অঙ্গিত বিভিন্ন ছবিও মুছে ফেলা হয়। পবিত্র কাবা শরীফ হতে সৌন্দর্যিকতার সর্বশেষ চিহ্নগুলো দূরিভূত হলে আল্লাহর একত্ববাদের নীতি সুদৃঢ়রূপে হারাম শরীফ তথা মক্কা ও আরবদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

ইমলামের ব্যাপক প্রসার : মক্কা বিজয়ের অবশ্যমভাবী ফলস্বরূপ আরব গোত্রের বেদুইনগণ দলে দলে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হল। ধর্মীয় অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এবং অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগের জন্যই বেদুইনগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল। নিকলসন বলেন, পবিত্র নগরীর আত্মসম্পর্ণে আরব দেশে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। তাঁর কার্য সমাধা হল। বিভিন্ন বেদুইন গোত্রের প্রতিনিধিগণ বিজেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। ফলশ্রুতিতে মহানবি (স.) এর রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি, ইসলামের দ্রুত প্রসার ও আন্তর্জাতিকীকরণ সহজতর হয়। জোসেফ হেল বলেন :এইরূপে মুহাম্মদ (স.) তাঁর আকাঞ্চন্দ্র চরম সীমায় উপনীত হন।

হুনাইনের যুদ্ধ (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

মক্কা বিজয়ের পর মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী অঞ্চলে হাওয়াজিন ও সকিফ গোত্রের ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পৌত্রলিঙ্গতার পরাজয়ের পর কাবা মুসলমানদের আওতাভুক্ত হলে বিধর্মী গোষ্ঠী ইসলামকে উচ্ছেদ করে মূর্তি পূজা পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে এবং পবিত্র আল্লাহর ঘর পুনরায় দখলের চেষ্টা করে। বেদুইনদের সহযোগিতায় এ দুই গোত্র মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী হুনাইন উপত্যকায় ২০,০০০ সৈন্য সমাবেশ করে। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ শে জানুয়ারি (৮ম হিজরি ৬ই শাওয়াল) মুসলমান ও কুরাইশদের একটি সম্মিলিত বাহিনী মক্কা ত্যাগ করে। মক্কায় অবস্থানের তিন সপ্তাহের মধ্যে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কে এক বিশাল শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়। মুসলমানের পক্ষে মোট ১২,০০০ সৈন্য হুনাইনের প্রাতঃরে শক্তির মোকাবিলা করে। যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসলমানগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। অবশেষে মহানবি (স.) এর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সেনাপতি হ্যরত খালিদ (রা.) এর বীরচক্রের কারণে মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করে। যুদ্ধে প্রায় ছয় হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী হয়। বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু, প্রচুর পরিমাণ রৌপ্য ও সমরাত্ম মুসলমানদের হস্তগত হয়।

তায়েফ বিজয় (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

হুনাইনের যুদ্ধে পরাজিত শক্তি সৈন্যগণ তায়িফের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনায় মেতে উঠে। সংবাদ পেয়ে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আবু মুসার অধিনায়কত্বে একটি বিশাল মুসলিম বাহিনী তায়েফে প্রেরণ করেন। তিন সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর তায়িফবাসী মহানবির নিকট আত্মসম্পর্ণ করে। মহানবি (স.) তাদের ক্ষমা করেন এবং সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করেন। যে তায়িফবাসী একদিন মহানবি (স.) কে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করেছিল, মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে তারা ভীত ও জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল এবং মদিনার শাসনাধীনে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর আনুগত্য স্বীকার করল। তায়েফবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল।

তাবুক অভিযান (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

আরবের ইতুদিগণ হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাতে কয়েকবার পরাজয় বরণ করে সিরিয়া সংলগ্ন খাইবার অঞ্চলে নাশকতায়ুক্ত কার্যে লিপ্ত ছিল। হুদায়বিয়ার সম্মিলনের পর হ্যরত মুহাম্মদ (স.) রোম সন্তুষ্ট হেরাক্লিয়াসের দরবারে দৃত পাঠান। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন ও তায়িফে ইসলামের বিজয়ে হেরাক্লিয়াস দৰ্শ্যাবিত হয়ে পড়ে। তদুপরি মূতার যুদ্ধে খ্রিষ্টাব্দের পরাজয় এবং ইতুদিদের প্রোচনা তাকে উত্তেজিত করে তোলে। ঘাসসানীদের সহযোগিতায় ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে লক্ষ্যধিক সৈন্যসহ বায়জানটাইন বাহিনী মদিনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এ সংবাদ পেয়ে সিরিয়া গমনের বাণিজ্যের পথটিকে নিরাপদ রাখার জন্য সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত তাবুক নামক স্থানে শত্রুপক্ষের গতিরোধ করেন।

মুসলিম বাহিনীতে পদাতিক সৈন্য ছিল ৩০,০০০ এবং অশুরোয়ী ১০,০০০। এ যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, হযরত ওমর (রা.) তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি এবং হযরত উসমান (রা.) ১,০০০ ঝর্মুদা, ১,০০০ উট এবং ৭০টি অশু যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। বিশেষ কোনো যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন হয়নি কারণ মুসলমানদের যুদ্ধে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী মনে করে বায়জান্টাইন বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে অবর্তীণ না হয়ে পলায়ন করে।

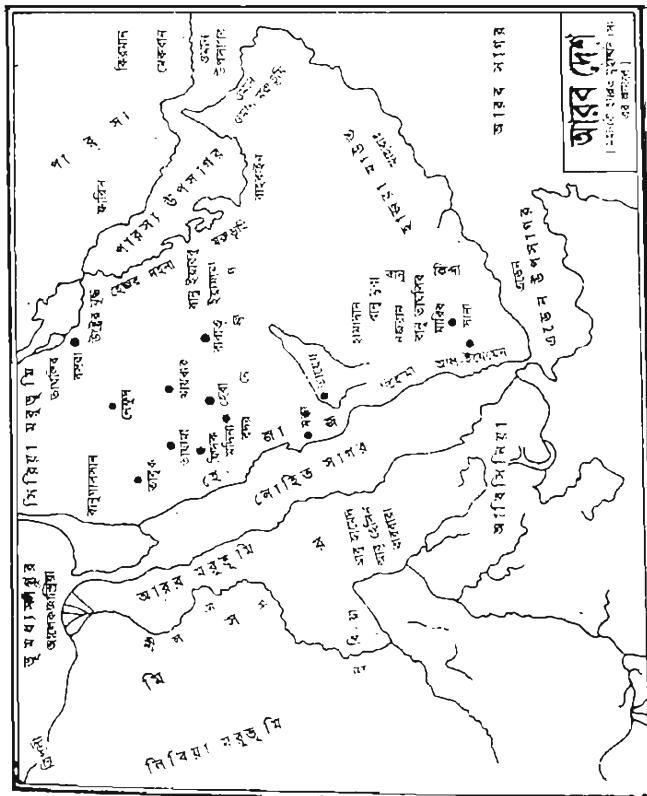
মহানবি (স.) ২০ দিন তাবুকে অবস্থান করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আমলে ছোট বড় সর্বমোট ২৭টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে তাবুক ও অন্যান্য ৮টি যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাবুকই ছিল মহানবি (স.) এর জীবনের শেষ অভিযান। মুসলমান সৈন্যবাহিনী তাবুক গমনকালে পথিমধ্যে গ্রীষ্মের সূর্যের প্রচড় ক্রিয়ণ ও প্রথর তাপে এবং পানির অভাবে ভয়ানক কষ্ট পায়।

প্রতিনিধি প্রেরণের বছর

নবম হিজরি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনে এবং বিশেষ করে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইবনে হিশাম বলেন যে, এ বছর হযরত মুহাম্মদ (স.) অসংখ্য প্রতিনিধিকে (ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে) সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন বলে উক্ত বছরকে প্রতিনিধি প্রেরণের বছর বা আমুল উফুদ বলা হয়। ওমান, হাজরামাউত, নাজরান, মাহরা, বাহরাইন প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চলে কোন প্রকর অভিযান প্রেরণ করা হয়নি, সে সমস্ত অঞ্চল হতে প্রতিনিধি মদিনায় প্রেরিত হল। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরে হযরতের আমন্ত্রণক্রমে এ সমস্ত প্রতিনিধিরা ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপন করল। ইয়ামেনের অনেক গোত্রও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। মাহরা এবং ইয়ামেনের খ্রিস্টানগণ ইসলামে দীক্ষিত হয়। খ্রিস্টান গোত্র বানু হানিফা, বানু তাগলিব, বানু হারিস, বানু কিলদা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে বাংসরিক কর প্রদানের অঙ্গীকার করে।

তাবুক হতে বায়জান্টাইন বাহিনীর পলায়নের পর আইলাহের খ্রিস্টান শাসনকর্তা এবং মাকনী আজরহ ও জারবা মরুদ্যানের ইতুদি সম্প্রদায় মুসলমানদের সঙ্গে সম্মিলিত করে। এ অঞ্চলের খ্রিস্টান ও ইতুদি সম্প্রদায় মুসলমানদের নিকট হতে নিরাপত্তা লাভ করে বাংসরিক নির্দিষ্ট হারে কর জিয়িয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করে। কুরাইশদের মিত্র বানু আসাদ ছাড়া বানু কাবাও হযরতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। এরপে গোত্রের পর গোত্র হযরতের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে পৌত্রলিঙ্গতার পরিবর্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। প্রত্যেক গোত্রকে একখানি লিখিত সম্পত্তি প্রদান করা হয় এবং ইসলামের আদর্শ শিক্ষা দানের জন্য একজন মুয়াল্লিম নিযুক্ত করা হয়।

আমুল উফুদ বা প্রতিনিধি প্রেরণের বছর ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য যে, তা কেবল ইসলামের প্রচারেই সহায়তা করেনি, সমগ্র আরব জাতিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে সুসংঘবদ্ধ করে শক্তিশালী বায়জান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দান করে। ইবন ইসহাকের মতে, বিভিন্ন গোত্র হতে প্রেরিত প্রতিনিধিদের প্রতি মহানবি (স.) এর সৌজন্যমূলক ব্যবহার, তাদের অভিযোগের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, বিরোধ নিষ্পত্তি করার মতো বিচক্ষণতা সমগ্র উপর্যুক্তি তাকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং মহান, সদাশয় ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে।



চিত্র : আরব দেশ (মহানবী (স)-এর সময়)

বিদায় হজ (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

দশম হিজরিতে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) উগলখি করলেন যে, তাঁর জাগতিক কর্তব্য শেষ হয়েছে এবং জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হওয়ার সময়ও আসল্ল। তাই হজবৃত্ত পালনের উদ্দেশ্যে ২৫ শে জিলকদ, ১০ হিজরী অর্থাৎ ২৩ শে মেকুয়ারি, ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অগনিত সাহাবি সহকারে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। ইতোপূর্বে মহানবি (স.) দুবার ওমরাহ পালন করেছেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত হজবৃত্ত পালনের সুযোগ হয়নি। হজবৃত্ত পালন এবং মুসলমানদের এতদসংক্রান্ত বিধি বিধান সম্পর্কে সরাসরি অবহিত করাও ছিল মহানবি (স.) এর এবার হজে যাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য। এটি ছিল মহানবি (স.) এর জীবনের শেষ হজবৃত্ত পালন। এজন্য এ হজকে হজজাতুল বিদা' বা বিদায় হজ বলা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে সুরা বারায়াত নাজিল হওয়ার পর হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আরবের সমস্ত গোত্রকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য ৪ মাস সময় প্রদান করেন এবং বলেন যে, এ সময় অতিবাহিত হবার পর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না। এর ফলে পরের বছর ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হ্যরত (স.) হজ উপলক্ষে ১,১৪,০০০ জন সাহাবাসহ মক্কায় গমন করতে সক্ষম হন। এ যাত্রায় তাঁর সকল সহধর্মীনী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কুরবানী দেওয়ার জন্য তিনি ১০০টি উট সঙ্গে মেন।

যাত্রার দশদিন পর হযরত মুহাম্মদ (স.) ছয় মাইল অদূরে যুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছেন এবং সেখান থেকে সাহাবিদের নিয়ে হজের পোশাক পরিধান করে (ইহরাম বেঁধে) একাদশ দিনে মকাব প্রবেশ করেন। কাঁবা গৃহের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করে হযরত মুহাম্মদ (স.) মাকামে ইবাহিম নামক স্থানে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার দৌড়ালেন। জিলহজ মাসের অষ্টম দিনে তিনি মিনায় এবং নবম দিনে আরাফাত ময়দানে পৌছান। হজ সম্পন্ন করে তিনি আরাফাতের পর্বত শিখের দাঁড়িয়ে উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক অবিসরণীয় ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এ উপদেশবাণী মুসলমানদের হৃদয়ে চিরকাল সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে।

বিদায় হজের ভাষণ

হযরত মুহাম্মদ (স.) আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে বলেন :

“হে মুসলমানগণ, মনোযোগ সহকারে আমার বাণী শ্রবণ কর। কারণ, তোমাদের সাথে পুনরায় মিলিত হবার সুযোগ আল্লাহ আমাকে নাও দিতে পারেন। এ দিন এ মাস সকলের জন্য যেরূপ পবিত্র, সেরূপ তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত পরম্পরের নিকট পবিত্র এবং হস্তক্ষেপের অনুপযুক্ত।

“স্মরণ রেখ, প্রতিটি কাজের জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করতে হবে।”

“হে সাহাবিগণ, সহধর্মীদের উপর তোমাদের যেরূপ অধিকার আছে, তোমাদের উপরও তাদের অধিকার অনুরূপ। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং তাঁর আদেশমত তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করে নিয়েছ। তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে।

“সর্বদা, অন্যের আমানত হেফাজত করবে এবং পাপ কার্য এড়িয়ে চলবে।

“সুন গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হলো। খাতকের নিকট হতে কেবল আসলই ফেরত নিবে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব জাতির রক্তের বদলে রক্ত নীতি এখন হতে নিষিদ্ধ হলো।”

“দাসদাসীদের সঙ্গে হৃদয়পূর্ণ ও আন্তরিক ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার কর, যা পরিধান কর, তাদেরকেও অনুরূপ খাদ্য ও বস্ত্র দান কর। তারা যদি ক্ষমার অযোগ্য কোনো ব্যবহার করে তা হলেও তাদের মুক্তি দান করবে। স্মরণ রেখ, তারাও আল্লাহর মাখলুক এবং তোমাদের মতো মানুষ।”

“তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কারও অংশীদার করো না, অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না এবং ব্যতিচারে লিপ্ত হয়ো না।”

“হে মানবমতলি, মনোযোগ সহকারে আমার বাণী অনুধাবন করতে চেষ্টা কর। স্মরণ রেখ, সকল মুসলমান পরম্পর তাই তাই এবং তোমরা একই আভ্যন্তরে ও বশ্বনে আবদ্ধ। পৃথিবীর সকল মুসলিম একই অবিচ্ছেদ্য আত্ম সমাজ। অনুমতি ব্যৱtাত কেউ কারও কোনো কিছু জোর করে কেড়ে নিতে পারবে না।”

“স্মরণ রেখ, বাসভূমি ও বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান সমান। আজ হতে বংশগত কৌলিন্য প্রথা বিলুপ্ত করা হল। সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলিন, যে স্বীয়কার্যের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে আগ্রহী। পরম্পরের প্রাথান্যের একমাত্র মাপকাঠি হলো খোদাভীতি বা সংকর্ম।”

“পথপ্রদর্শক হিসেবে তোমাদের জন্য আল্লাহর কালাম (কুরআন শরীফ) ও তাঁর প্রেরিত সত্যের বাহক রাসূল করিমের চরিত্রাদর্শ (হাদিস) রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা কুরআন ও হাদিসের অনুশাসন মেনে চলবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না।”

“হে আমার উম্মতগণ, যারা এখানে সমবেত হয়েছে, তারা অনুস্থিত মুসলমানদের নিকট আমার উপদেশ পৌছে দিবে, আমার উপদেশের কথা বলবে। উপস্থিত ব্যক্তিগণের চেয়ে তারাই অধিক স্মরণ রাখতে সক্ষম হবে।”

নবি করিম (স.) ভাষণ প্রদানের এ পর্যায়ে উর্ধ্বে হাত তুলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন, “হে প্রভু, আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌছাতে পেরেছি?” উপস্থিত উম্মতগণ গগনভোদ্দী আওয়াজ করে বলে উঠলেন, “হ্যা, নিশ্চয়ই পেরেছেন।”

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।” (সূরা মায়দাঃ ৩)

পরিশেষে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আবেগভরা কষ্টে আবার সমবেত ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, “তোমরা সাক্ষী, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি বিদায়, আল-বিদা।”

হ্যরত আবু বকর (রা.) এই আয়াত শুনে কেঁদে ফেলেন। কারণ তিনি তাঁর ইমানী প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝে ফেলেছিলেন, রিসালাতের মিশন যখন সম্পন্ন হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলা অদূর ভবিষ্যতে মহানবি (স.) কে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিবেন।

মহানবি (স.) আরাফাত থেকে মুয়দালিফায় রওয়ানা দেন। সেখানে রাত্রি যাপন করেন। ফজরের নামাযের পর তিনি মুয়দালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে জামারায় কংকর নিষ্কেপ করেন। মিনায় পৌছে নিজের তাঁবুতে অবস্থান করেন। মহানবি (স.) মদিনা থেকে কুরবানীর জন্য ১০০ উট নিয়ে এসেছিলেন। ৬৩টি উট নিজের তরফ থেকে কুরবানী করেন। এই হিসেবে ছিল তাঁর বয়সের প্রতি বচরের জন্য একটি করে। অবশিষ্ট ৩৭টি হ্যরত আলী (রা.) কুরবানী করেন। অতঃপর মহানবি (স.) পরিত্র মাথা মুক্ত করেন। তাতে করে ইহরাম (হজের পোষাক) খুলে তিনি হজের সকল আনুষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত হন।

এই হজকে কেউ কেউ ‘হজ্জাতুল বিদা’ বা বিদায় হজ বলেন। কেউ কেউ হজ্জাতুল ইসলাম, আবার কেউ কেউ হজ্জাতুল বালাগ নামে অভিহিত করেন। মূলত তিনটি নামই এই হজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এটা ছিল মহানবি (স.) এর শেষ হজ। এই হিসেবে একে বিদায় হজ বলা যায়। কারণ এরপর আর কখনও মহানবি (স.) হজ করার সুযোগ পাননি।

বিদায় হজের তাৎপর্য

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর বিদায় হজের অভিভাবণ মুসলিম উম্মাহর জন্য সর্বকালের পথ প্রদর্শক। এই অমূল্য ভাষণে তিনি একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র জনগণের নিকট তুলে ধরেন। তাদেরকে তিনি তমসাযুগের অসাম্য, প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা, শ্রেণি বৈষম্য, সুদ প্রথার মাধ্যমে শোষণ-নির্যাতন, নারী ও দাসদাসীর প্রতি অন্যায়-অবিচার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন রীতিনীতি প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ অবসানের আহ্বান জানান। মহানবি (স.) এর বিদায় হজের ভাষণ ইসলামী রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও মানবিক অধিকারের মূলনীতি বিষয়ক একটি দলিল। এই ভাষণে মানবজীবনের আধ্যাত্মিক ও বাস্তব উভয় শিক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। বস্তুত এই শিক্ষাতেই মানবজাতির মুক্তি ও শান্তি নিহিত। হ্যরত (স.) এর এই বক্তব্যের আদর্শ বাস্তবায়িত হলে বর্তমানে সংঘাতময় বিশ্বে মানবজীবন নিঃসন্দেহে শান্তিময় হয়ে উঠবে।

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর উকাত (৮ জুন, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ)

সাহাবিদের সঙ্গে হজ সমাপনাত্তে হ্যরত (স.) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানে অতিবাহিত করেন এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। বিদায় হজের দু'মাস পর মহানবি (স.) হ্যরত ওসামা বিন জায়েদের নেতৃত্বে সিরিয়ায় একটি শান্তিমূলক অভিযান প্রেরণের নির্দেশ দেন। কেবল, ইতোপূর্বে সেখানে একজন মুসলিম দৃতকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু মহানবি (স.) আকস্মিক অসুস্থিতার সুযোগে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে তোলায়হা, মুসায়লামা প্রমুখ ভন্ড নবির আবির্ভাব ঘটায় এই অভিযান আপাত স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ক্রমে ক্রমে হ্যরত (স.) এর শিরঃপৌড়া বাড়তে থাকে, সাম্যহানি ঘটে। একদা মধ্যরাত্রে তিনি, 'জান্নাতুল বাকি' নামক সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তাঁর মৃত সাহাবিদের জন্য পারলোকিক শান্তি কামনা করেন। পিতৃব্য আবকাসের পুত্র হ্যরত ফজল এবং আবু তালেবের পুত্র হ্যরত আলীর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি শেষবারের মতো মসজিদে উপস্থিত হলেন। শেষ নামাজ আদায় করে তিনি সমবেত মুসলিমগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “হে মুসলমানগণ! যদি আমি তোমাদের কারও প্রতি অন্যায় আচরণ করে থাকি, তাহলে এখন তার জবাবদিহি করতে রাজি আছি। যদি আমি তোমাদের কারও নিকট খণ্ড করে থাকি, তাহলে সে যেন আজ আমার সম্পত্তি থেকে তা নিয়ে নেয়।” তিনি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। অবশেষে ৬৩ বৎসর বয়সে ১১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল (৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন) সোমবার হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে তিনি ইস্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর কৃতিত্ব ও সংস্কারসমূহ

ইসলামি জীবন বিধান কোনো মানুষের চিন্তার ফল নয় তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার বিধি-বিধান মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ(স.) ওহির মারফত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে সকল কার্যকরী সংস্কার ও ব্যবস্থার মাধ্যমে মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) পতনেনুর্ধ আরব জাতির মধ্যে জাগরণ আনয়ন করেন, একটি ঘৃণিত ও অজ্ঞাত আরব জাতিকে সমানের উচ্চাসনে সমাসীন করেন, লুঠনকারী আরব জাতিকে অপরের সম্পদ হিফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলেন, মদ্যপানে আসন্ত আরব জাতিকে মদ্যপানে নিরাসন্ত করে তোলেন, জ্ঞানান্ত্ব ও মূর্খ আরব জনতাকে জ্ঞান-পিপাসু করে গড়ে তোলেন, আরবের মুশরিকদেরকে তোহিদবাদীতে রূপান্তরিত করেন, দাস প্রথার বিলোপ সাধনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সভ্যতা বিবর্জিত আরব জাতিকে একটি উন্নয়নশীল সুসভ্য জাতিরূপে গড়ে তোলেন-সে সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হলো।

রাজনৈতিক সংস্কার : প্রাক-ইসলামি আরবে কোনো সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল না। এজন্য বিচ্ছিন্ন গোত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত আরববাসীদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ব্যর্থন গড়ে উঠেনি। দেশে কোনো বিধিবন্ধ নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা না থাকায় অসংখ্য গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত আরবদের মধ্যে কলহ-বিবাদ ছিল চিরাচরিত ঘটনা।

তাদের দস্যবৃত্তি রাজনৈতিক অঙ্গনে অশান্তি ও অনর্থের সৃষ্টি করে। মহানবি (স.) শতধা-বিভক্ত ও বিবদমান আরব জাতির গোত্র ভিত্তিক রাজনীতির অবসান ঘটান। তার প্রদত্ত মদিনা সনদ গোত্র প্রথার বিলোপ সাধন করে ইসলামি ভাত্তভোধের ভিত্তিতে একটি নতুন জাতি (উমাহ) প্রতিষ্ঠা করে। গোত্র ব্যবস্থার অবসানে তিনি আরবদেরকে একই রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধনে আবন্ধ করে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি আরবদেরকে একই রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধনে আবন্ধ করে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে মহানবি (স.) বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রগুলিকেও একই রাজনৈতিক গভীর মধ্যে আবন্ধ করেছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর এ প্রচেষ্টা পরবর্তীকালের বৃহত্তর ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

একমাত্র ধর্ম ও ইমানের দ্বারাই তিনি মদিনার রাজনৈতিক অঙ্গনে শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। ফলে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব পৌত্রিকতার স্থান দখল করে নেয়। মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর হ্যরাত মুহাম্মদ (স.) এই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। শাসন ব্যবস্থায় তিনি ঐশ্বীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমষ্টয় সাধন করায় ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতে থাকে। বসওয়ার্থ যথার্থই বলেছেন, “যদি কেহ ঐশ্বরিক বিধান সম্মত শাসনবিধি প্রতিষ্ঠার পৌরূর দাবি করতে পারেন, তবে তিনি মুহাম্মদ (স.) ছাড়া আর কেউ নন।” মদিনায় হিজরতের পর মহানবি (স.) সেখানে সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ক্রমে এই মসজিদই ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বস্তুত এই মসজিদ ছিল মহানবি (স.) এর প্রার্থনাগার, শিক্ষায়তন, সভাগৃহ, সরকারি কার্যালয় এবং গোত্রীয় প্রতিনিধি ও বৈদেশিক দূতদের সাথে মিলনের কেন্দ্র। এখানেই বসে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, সাহাবীদের পরামর্শ ও স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রাধিনায়ক হিসাবে মহানবি (স.) এর কার্যকলাপ আগামী দিনের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে।

শাসনকার্যের সুবিধার্থে হ্যরাত মুহাম্মদ (স.) সমগ্র আরব উপদ্বিপকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। যেমন- মদিনা, খাইবার, মক্কা, তায়িফ, ইয়ামেন, সানা, হায়রামাউত, ওমান ও বাহরাইন। প্রদেশের শাসনকর্তার উপাধি ছিল ‘ওয়ালী’। তিনি শুধু রাষ্ট্রনায়কই ছিলেন না, একাধারে তিনি ছিলেন ইমাম, প্রধান সেনাপতি ও বিচারক। শাসন পদ্ধতির কেন্দ্রীয়করণের ফলে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির শুভ সূচনা হয়।

সামাজিক সংস্কার ৪ হ্যরাত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন যুগান্তকারী সমাজ সংস্কারক। তাঁর প্রবর্তিত সাম্য ও ভাত্ত আরব সমাজে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে ধুলিস্যাঁৎ করে দেয় তিনি একটি আধুনিক ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এক অভ্যন্তরীণ বৈশ্঵িক পরিবর্তন সাধন করেন। আভিজাত্যের অহংকার ও বংশমর্যাদার দম্পত্তি বিলোপ করে তিনি মানুষে মানুষে সকল অসাম্য ও ভেদাভেদের মূলোচ্ছেদ করেন। তিনি মানবতার ভিত্তিতে সমাজ এবং ইসলামি বুনিয়াদের উপর একটি জাতি গঠন করতে সচেষ্ট হন। তিনি ঘোষণা করেন, “সকল মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকারী।” এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তিনি আরব সমাজ থেকে উচ্চ-নীচ, ধর্মী-দরিদ্র ও সাদা-কালো পার্থক্য দূরীভূত করেন।

নারীজাতির প্রতি সমান প্রদর্শন ও সমাজ জীবনে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি হ্যরাত মুহাম্মদ (স.) এর সমাজ সংস্কারের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত কোন ধর্মই নারীকে সমাজে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করেনি। এতকাল তারা ভোগের সামগ্ৰীৱলোকনে গণ্য হত। মহানবি (স.) সমাজে নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যান। তিনি বলেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহার করে। “মায়ের পদতলে সভামের বেহেশত” এই বাণীর মাধ্যমে নারী জাতির প্রতি তার শুদ্ধাবোধের গভীরতা প্রকাশ পায়। তাঁরই প্রচেষ্টায় পুরুষের পবিত্র আমানত ও কল্যাণময়ীৱলোকনে নারী সমাজে

স্থান করেছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) পারিবারিক ও বৈবাহিক আইন সংশোধন করে নারী জাতিকে ভোগের সামগ্ৰীৰ পরিবৰ্তে অর্ধাঙ্গনী ও জীবনসংজীবনীৱপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাদেরকে পিতা ও মৃত স্বামীৰ সম্পদে অধিকার এবং বিয়েতে সম্মতি প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেন। আৱব সমাজে কল্যাণ সভান ভূমিত্ব হওয়াৰ পৰ জীবন্ত প্রোথিত কৰাৰ যে বৰ্বৰ রীতি প্ৰচলিত ছিল, তিনি তা চিৰতৰে রহিত কৰেন। মোট কথা, নারীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাপ্ৰদৰ্শন ও তাৰ মৰ্যাদা বৃন্দি মহানবি (স.) এৱে প্ৰচাৰিত জীবন-দৰ্শনেৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ ছিল।

হযরত মুহাম্মদ (স.) আৱবে তথা প্ৰায় সমগ্ৰ বিশ্বে যুগ যুগ ধৰে প্ৰচলিত ক্ৰীতদাস প্ৰথাৰ মূলে কৃষ্টানাধাত কৰেন। সত্য যে, সে সময়েৱ বিৱাজমান পৰিস্থিতিৰ জন্য তিনি অবশ্য দাস প্ৰথাৰ মূলোচ্ছেদ কৰতে পাৱেননি, তবে তিনিই তাদেৱকে সৰ্বপ্ৰথম মানুষেৰ মৰ্যাদায় উন্নীত কৰেন। দাসদাসীৰ জীবন মৱণ নিৰ্ভৰ কৰত প্ৰভুদেৱ মৰ্জিও খেয়াল-খুশিৰ উপৰ। ফলে মনিবগণ ক্ৰীত দাসদাসীদেৱ প্ৰতি অমানুষিক অত্যাচাৰ কৰত। তাৱা হাটে-বাজাৱে এবং যত্নত্বে পণ্ডুবোৱে ন্যায় ক্ৰয়-বিক্ৰয় হত। মানুষ হিসেবে সমাজে তাদেৱ কোনো অধিকাৰ ছিল না। প্ৰভুৰ অনুমতি ব্যতিৱেকে তাদেৱ বিয়ে কৰা পৰ্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। মানুষেৰ প্ৰতি মানুষেৰ এৰূপ নিৰ্দয় আচৱণে মহানবি (স.) অত্যন্ত মৰ্যাদত্ব হত। তাই তাদেৱ মুক্তিৰ পথ নিৰ্দেশ কৰে তিনি ঘোষণা কৰেন, দাসদাসীদেৱ মুক্তিদানেৰ চেয়ে শ্ৰেষ্ঠতৰ কাজ আল্লাহৰ নিকট আৱ কিছুই নেই। বিদায় হজেৰ ভাষণে তিনি স্পষ্টভাৱে দাসদাসীদেৱ প্ৰতি সদাচাৰণ ও উদার ব্যবহাৱেৰ উপদেশ দেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি অনেক দাসদাসী ক্ৰয় কৰে মুক্ত কৰেন এবং অনেকে এই কাজে তাঁৰ সদাচাৰণ এবং তাদেৱকে উচ্চ পদে নিয়োগ ও সামাজিক মৰ্যাদা দানেৰ ফলে ক্ৰমান্বয়ে দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তিৰ পথ সুগম হয়।

ইসলাম-পূৰ্ব যুগে আৱবদেৱ নৈতিক জীবন বলতে কিছুই ছিল না। মহানবি (স.) তাদেৱ নৈতিক অবস্থাৰ উন্নয়নেৰ উদ্দেশ্যে হত্যা, মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুদ খাওয়া, পৰ ধন হৱণ, রাহাজানি, ব্যভিচাৰ, পুৱন্মেৰ সংখ্যাতীত স্তৰী গ্ৰহণ এবং স্ত্ৰীলোকেৰ বহুবিবাহ প্ৰথা সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰেন। এৱুপে তিনি আৱব সমাজ থেকে সৰ্বাধিক পাপাচাৰ, অনাচাৰৰ কুসংস্কাৰ দূৰীভূত কৰে এক যুগান্তকাৰী ও সুদূৰপ্ৰসাৱী বিপ্লব সাধন কৰেন।

ধৰ্মীয় সংস্কাৱ ৪ ফল ক্ৰমাৰ বলেন, “নিকৃষ্ট ভক্তিযোগ্য বক্তৃপূজা হতে কঠিন এবং অনমনীয় একেশুৱবাদ ছিল ইসলামেৰ ধৰ্মীয় সংস্কাৱ”। গৌতমিকতা, ধৰ্মীয় কুসংস্কাৱ, বক্তৃপূজা প্ৰভৃতি যখন আৱবেৰ ধৰ্মীয় জীবনকে কলুৱিত কৰেছিল, ঠিক সে সময় হযরত মুহাম্মদ (স.) বাণী নিয়ে আবিৰ্ভূত হলেন। একেশুৱবাদেৱ অমোৰ্ধ বাণী ঘোষিত হল—“আল্লাহ ছাড়া আৱ কোনো উপাস্য নেই; হযরত মুহাম্মদ (স.) তাৰ প্ৰেৰিত রাসূল।” একেশুৱবাদেৱ মূলমন্ত্ৰে রাসূলগ্নাত (স.) সমগ্ৰ ইসলাম জগৎকে একটি আত্মসংঘে আবদ্ধ কৰেন। তিনি তাদেৱকে যে ধৰ্মগ্নাত দেন তা সকল দেশেৱ, সকল যুগেৰ এবং সকল মানুষেৰ জন্য একটি সুস্পষ্ট দিক দৰ্শন। অধ্যাপক পি. কে. হিটিৱ ভাষায়, “মুহাম্মদ এমন একটি গ্ৰন্থেৰ বিশ্বাসযোগ্য উপলক্ষ হয়েছেন, গোটা মানবজীতিৰ এক-ষষ্ঠাংশ যে গ্ৰন্থটিকে সমস্ত বিজ্ঞান, জ্ঞান ও ধৰ্মতত্ত্বেৰ মূৰ্তি প্ৰকাশ বলে আজও গণ্য কৰে। যথাৰ্থ অৰ্থে ইসলামেৰ বিজয় ধৰ্ম তথা তাৱিদেৱই বিজয়।

স্যাভাৱী সত্যই বলেছেন, বিশ্বেৰ সকল ধৰ্ম প্ৰচাৱকগণেৰ মধ্যে মুহাম্মদ (স.) সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৃতিত্বেৰ অধিকাৰী। জাৱোষ্ট্রীৰ ধৰ্মেৰ দ্বিতীয়াদ, হিন্দুধৰ্মেৰ ত্ৰিতীয়াদ (ব্ৰহ্ম, বিষ্ণু ও শিব) এবং খ্ৰিস্টান ধৰ্মেৰ ত্ৰিতীয়াদ-এৱেৰ উপৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অবদান হল, আল্লাহ সম্পৰ্কীয় ধাৱণার যথাৰ্থ মৰ্যাদা দান এবং এৱে এৱে বিশুদ্ধীকৰণ।” ইপিকিউরাস বলেন, দেবতা-ভীতি হতে মুক্ত হতে না পাৱলে মানবজীতি কখনও স্বাধীন হতে পাৱে না। আৱবেৰ তথা বিশ্বেৰ মানুষকে মুহাম্মদ (স.) এই দেবতা-ভীতি হতে মুক্তি দান কৰেন।

ধর্মীয় অনুশাসন : হ্যরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তন করেন। প্রকাশ্য নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মুসলিমদের আহ্বানের জন্য হ্যরত উমর (রা.) এর পরামর্শক্রমে কোন উচ্চস্থান হতে আযান দেয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। হ্যরত বিলাল (রা.) ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত হন। নামাজের পূর্বে আযান ও ওয় এবং জামায়াতে নামাজ পড়ার প্রথা হিজরির প্রথম বছর অর্ধেৎ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে নির্ধারিত ও প্রচলিত হয়।

মদিনার মসজিদে মুসলমানগণ সর্বপ্রথম জেরজালেমের দিকে ফিরে নামায পড়তেন। কিন্তু হিজরির দ্বিতীয় বছর আল্লাহর ঐশীবানী লাভ করে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) জেরজালেমের পরিবর্তে কাঁবাকে ইসলামের কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করলেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, “হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে উর্বে দৃষ্টিপাত করতে দেখেছি, সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব সেই কিবলার দিকে যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে। এখন আপন মুখ ফিরিয়ে নিন মসজিদে হারামের দিকে” (২:১৪৪)। আরনল্ড বলেন, “আপাত দৃষ্টিতে মনে না হলেও নামাজের মধ্যে কিবলা পরিবর্তনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এটাই ছিল ইসলামের জাতীয় জীবনের প্রথম পদক্ষেপ ও ইহা মকার কাঁবাকে সমগ্র মুসলিম জাতির ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত করে। কিবলা নির্ধারণ ছাড়াও রোজা, ইন্দুল ফিতর, ইন্দুল আয়া, যাকাত ও হজ পালনের প্রত্যাদেশ মহানবি (স.) লাভ করেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার : হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবে কোন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। নগরবাসী ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আরবগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু মরহুমী বেদুইনগণ যায়াবর বৃত্তি ও লুঁঠন দ্বারা জীবিকার সংস্থান করত। তারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছিল। ঘৃণা কুসীদ প্রথা ও অন্যান্য শোষণমূলক ব্যবস্থা চালু থাকায় দেশের সম্পদ মুভিমেয় কতিপয় পুঁজিপতিদের হাতে কুক্ষিগত হয়েছিল। মহানবি (স.) তাঁর অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করেন। তিনি কুসীদ প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার ও ধন সম্পদের সমবর্টনের জন্য তিনি মুসলিম সমাজে যাকাত, সাদকাহ ও ফিতরা প্রবর্তন করে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মূলে আঘাত হানেন। রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে তিনি আল গানিমাহ, যাকাত, জিজিয়া, খারাজ ও আল-ফাই-এর পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন। বায়তুলমাল স্থাপন করে তিনি রাষ্ট্রের অর্থসম্পদে জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং দীন-দুর্ঘট্যদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। মহানবি (স.) কারিক পরিশূম, কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সন্দুপায়ে অর্থোপার্জনে উৎসাহ দিতেন। জুয়া খেলার মাধ্যমে অর্থ রোজগারকে তিনি নিষিদ্ধ করেন। এককথায়, তিনি আরবের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে নেতৃত্বকার গভীরে আবদ্ধ করেন। তিনি বলেছেন, সমাজে কারও স্থান অর্থসম্পদের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হবে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশুস্ততার ভিত্তিতেই তাঁর স্থান নির্ধারিত হবে। এভাবে দরিদ্র্য পীড়িত আরবদের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সুষ্ঠু গতিপথ খুঁজে পায়।

রাজস্ব ব্যবস্থা : হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবিকালে নিয়ন্ত্রিত উৎস হতে রাজস্ব আদায় করা হত :

(ক) আল-গানিমাহ (যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি), (খ) যাকাত, (গ) জিজিয়া, (ঘ) খারাজ (ভূমি রাজস্ব) এবং (ঙ) আলফাই (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি)

১. গণমাত বা যুদ্ধ-লব্ধ দ্রব্যাদি : অন্ত-শস্ত্র এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি কর্তৃক পরিত্যক্ত এই সমস্ত অন্ত-শস্ত্র ও রসদপত্র অধিকার করে নেওয়া হত। যুদ্ধবন্দী কাফেরগণকে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হত। উক্ত বন্দীদেরকে মুসলমান সৈন্যের দাস হিসেবে বিতরণ করা হত। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের চার-পঞ্চমাংশ মোদ্দাগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত এবং অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ মহানবি (স.) এর জন্য নির্ধারিত ছিল। এই অংশকে “খুমুস” বলা হয়।

হ্যান্ডিল মুহাম্মদ (স.) এর মদিনা জীবন

২. যাকাত : কুরআন শরীফে নামাজের পরেই যাকাত প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক সংগতিসম্পন্ন মুসলমানের একান্ত কর্তব্য দরিদ্রের মধ্যে বটেন করার উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করা।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির উপর যাকাত ধার্য করা হত। যথা-

- (ক) খাদ্য-শস্য, ফল-ফলাদি ও খেজুর,
- (খ) উট, ভেড়া, মেষ, ছাগল, গো-মহিষ ইত্যাদি,
- (গ) স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং
- (ঘ) বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি ও নগদ অর্থ।

পূর্ণ এক বছরকালের জন্য সংসারের আবশ্যকীয় খরচাদি বাদ দিয়ে বাকি সম্পত্তির (নিসাব) উপর যাকাত ধার্য করা হয়। বিভিন্ন সম্পত্তির নিসাব বিভিন্ন রকম।

৩. জিয়িয়া বা নিরাপত্তামূলক সামরিক কর : এই কর অমুসলমান প্রজাদের উপর ধার্য হতো। এর পরিবর্তে তাদেরকে যুদ্ধে যোগদান হতে রেহাই দেওয়া হতো এবং মুসলিম রাষ্ট্র তাদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করত। অমুসলমানকে রক্ষা করতে না পারলে মুসলমানগণ তাদের প্রদত্ত জিয়িয়া কর ফিরিয়ে দিত। মহানবি (স.) এর জীবিতকালে প্রত্যেক সামর্থবান অমুসলমান প্রজাকে বাসারিক এক দিনার হিসেবে জিয়িয়া কর দিতে হত। জিজিয়া নতুন কর নয় তৎপূর্বে এই কর পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যে যথাক্রমে “গেজিট” এবং “ট্রাইবিউটম ক্যাপিটিস” নামে প্রচলিত ছিল। আয়ুকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে মুসলমান সৈন্যদের ব্যয়ভার নির্বাহের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হত।

৪. খারাজ : অমুসলমান প্রজাগণকে নিজ নিজ ভূখণ্ডের উপর “খারাজ” নামক এক প্রকার ভূমি-রাজস্ব প্রদান করতে হতো। উক্ত কর পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের যথাক্রমে ‘খারাগ’ ও ‘ট্রাইবিউটম সলিং’ নামে পরিচিত ছিল। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) খারাজ ধার্য করেছিলেন উৎপন্ন শস্যের অর্বেক হিসেবে।

৫. আলফাই : মহানবি (স.) এর শাসনাধীনে ‘আল-ফাই’ নামক কিছু রাষ্ট্রীয় ভূমি ছিল। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হতে আদায়কৃত অর্থ সম্পূর্ণভাবে মুসলমান জনসাধারণের মজালের জন্য ব্যয় করা হত।

সাংস্কৃতিক সংস্কার : আরববাসীরা কাব্যামৌদী এবং কাব্য রচনা ও বর্ণনায় পারদশী হলেও তাদের রচনার বিষয়বস্তু অশীল, শ্লেষপূর্ণ ও ব্যঙ্গাত্মক ছিল। আধুনিক যুগে শিক্ষা বলতে যা বুঝায়, তা আরবদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড তা উপলব্ধি করে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) জানার্জনকে প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক করেন।

মহানবি (স.) এর উপর সর্বপ্রথম কুরআনের যে বাণী অবর্তীণ হয় তা হচ্ছে, পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে। কুরআনের এ পবিত্র বাণীর উপর ভিত্তি করে তিনি জানার্জনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেন-

১. শিক্ষিত লোকেরা নবিদের উত্তরাধিকারী। যারা শিক্ষার পথে বের হয়, তারা গৃহে না ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর পথে থাকেন।

২. পশ্চিতদের কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা অধিক পবিত্র।

৩. এক মুহূর্তের জ্ঞান-চিন্তা সারা রজনীর উপাসনা অপেক্ষা শ্রেণ্য।

প্রশাসনিক সংস্কার : মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে রাসুলে করিম (স.) এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করেন যার উপর তিনি করে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে থাকে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তা পরবর্তীকালের জন্য উদাহরণস্বরূপ। কুরআনের নির্দেশ, স্বীয় বিচারবৃদ্ধি এবং ধার্মিক ও শিক্ষিত মুসলিম সমাজের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিশের সর্বপ্রথম মসজিদ মদিনায় স্থাপন করে সেখানে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কার্য সমাধা করতেন। এ মসজিদই ছিল তাঁর বিদ্যালয়, প্রার্থনাগার, সরকারি দফতর, সভাগৃহ এবং বৈদেশিক দৃত ও গোত্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে মিলনের স্থান।

শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সমগ্র আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়; যেমন— খাইবার, তায়িফ, মক্কা, ইয়ামেন, তায়ামা, সানা, ওমান, হাজরামাউত ও বাহরাইন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে ‘ওয়ালি’ বলা হত। তিনি কেবল ইমামই ছিলেন না, প্রধান সেনাপতি, বিচারক এবং প্রশাসকের দায়িত্বও পালন করতেন। শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয়করণের ফলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়।

জাতি গঠনকারী হিসেবে হ্যারত মুহাম্মদ (স.) এর কৃতিত্ব

ইসলামের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে এডওয়ার্ড গীবন বলেন, “ইসলাম এমন একটি সরণীয় বিপ্লব যা পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপর একটি নতুন এবং চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে।” ইসলামের মহান ভ্রাতৃসংঘ এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে হ্যারত মুহাম্মদ (স.) অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি মদিনায় যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মদিনার সনদে রাষ্ট্রনায়ক এবং সংগঠক হিসেবে তাঁর বৃদ্ধিদীক্ষিত প্রতিভার ছাপ রয়েছে। বিবদমান আরব জাতিকে সুসংবন্ধ করে তিনি একটি নতুন জাতিতে পরিষেবা করেন। কৌলীন্যের পরিবর্তে ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি একটি সমাজ গঠন করেন। তাঁর নিকট গোত্র-গৌত্রের স্থলে ইসলামি ভাস্তুবোধ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মহানবি (স.) ছিলেন বিশ্বশাস্ত্রের পথিকৃৎ। সহিস্ফুতা, মহানুভবতা ও শাস্ত্রের বাণী তাঁর জীবনের কার্যাবলিকে সার্থক করে তুলেছে। তিনিই একমাত্র মহামানব যিনি তাঁর জীবদ্ধায় তাঁর কার্যের সফলতা অবলোকন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হৃদায়বিয়ার সন্ধিকে ‘ফাতহুম মুবিন’ অথবা ‘প্রকাশ্য বিজয়’ বলা হয়েছে। এ চুক্তিটি মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক র্যাদান প্রদান করে। এর ফলেই রাসুল (স.) ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন দরবারে দৃত প্রেরণ করে ইসলামের প্রতি বিদ্যমানের আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন। এভাবে মদিনার ধর্মভিত্তিক সমাজ হতে উত্তরকালে বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। অধ্যাপক পি.কে হিটি বলেন, “সংক্ষিপ্ত নশুর জীবনে মুহাম্মদ সম্ভাবনাহীন উপাদান থেকে এমন এক জাতির উচ্চ ঘটিয়েছিলেন, যারা আগে কখনও ঐক্যবন্ধ ছিল না। আর তাদের মাধ্যমে এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেছিলেন, যা আগে কেবল একটি ভৌগোলিক সীমানাকেই বোঝাত, কিন্তু এর জাতীয় চরিত্র বলতে কিছু ছিল না। বিরাট একটি অঞ্চল জুড়ে খ্রিস্ট ধর্ম ও ইহুদি ধর্মের অবসান ঘটিয়ে তিনি একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মানবজাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও সে ধর্ম অনুসরণ করে।”

মহানবি (স.) ছিলেন ‘রহমাতুল্লিল আলামিন’ অর্থাৎ বিশ্ব-বৃক্ষাবৃত্তের রহমত বা আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁর প্রতিটি কথা ও কার্যকলাপ ভবিষ্যৎ মুসলিম জীবনের পাথেয়। এ কারণে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, “একটি মহান কার্য চমৎকার এবং বিশৃঙ্খলার সাথে সুসম্পন্ন করার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে তাঁর (পৃত-পরিবত্র) জীবন।”

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী ও আদর্শ সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, তেইশটি বছরের কর্ম মুখরিত জীবন তিনি নিয়োজিত করেন মানবজাতির পরিপূর্ণ জীবন ধারা এবং ধর্মনীতির সুসংহত শৃঙ্খলা বিধানে। তিনি একদল শিক্ষিত কর্মী রেখে যান। যারা ‘সাহাবা’ নামে পরিচিত। তাঁরা তাঁর জুলন্ত কর্মসূরণ ও জীবন্ত উচ্চাদর্শের জন্য যে কোন সময় জানমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে আদর্শ ত্রাতা, ধর্মপ্রবর্তক, রাষ্ট্র নায়ক, সংস্কারক, আইন প্রণেতা, বিচারক, জাতি গঠনকারী এবং সর্বেপরি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হ্যরত মুহাম্মদ (স.) পার্থিব জীবন শেষ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাত্রা করেন। নিঃসন্দেহে বিশ্বের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে মহানবি (সা.) এর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) চারিত্রিক গুণাবলি

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি : আল্লাহর প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। এখানে তাঁকে নবুয়াতের সীলমোহরও বলা হয়। তিনি কেবল সর্বশেষ নবি নহেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবিও ছিলেন। প্রখ্যাত ইউরোপীয় চিক্ষাবিদ কার্লাইল, ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন, এইচ. জি. ওয়েলস মহানবি (স.) এর উচ্ছিসিত প্রশংসা করেছেন। মানব চারিত্রের সকল প্রকার মহৎ গুণের অন্য সমবয় ছিল মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র জীবনে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাঁর সমগ্রে বলেন, “হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনি অনুপম চারিত্রের অধিকারী। তাঁর নিষ্কলুষ চারিত্রে সকল প্রকার গুণ ও মহত্ত্বের ছাপ পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর স্বত্ত্বাজ্ঞাত সদাচার, কোমলতা, মহানুভবতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন একাধারে শিশুদের খেলার সাথী, স্নেহবৎসল পিতা, প্রেমময় স্বামী, বিশৃঙ্খল ব্যবসায়ী, রিস্তের বন্ধু, সত্যের দিশারী, ন্যায়পরায়ণ বিচারক, দক্ষ সমরকুশলী ও চিক্ষাশীল দার্শনিক। বস্তুত তাঁর জীবনাদর্শ গোটা মানবকুলের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ।

আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস : আল্লাহর প্রতি অবিচলিত ইমানের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। সুদৃঢ় ইমানই ছিল তাঁর মহৎ চারিত্রিক গুণাবলির উৎস। তাঁর প্রতিটি কাজে আল্লাহর নির্দেশের প্রতিফলন ছিল। কুরাইশদের হাতে তিনি অশেষ যাতনা তোগ করেছিলেন, লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁকে সর্বক্ষণ সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু কখনও তিনি আল্লাহর নির্দেশিত সত্য পথ হতে বিচ্যুত হন নি; বরং দ্বার্ঘাইন কঠে বলেছিলেন, “তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনেও দেয়, তখাপি মহাসত্যের সেবা ও স্মীয় কর্তব্য হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হব না।”

আত্মপ্রত্যয়, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা : চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েও মহানবি (স.) কোন দিন ধৈর্যহারা হননি বা আত্মবিশ্বাস হারাননি। তাওহিদের বাণীকে বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে তিনি বিরোধী শক্তি দ্বারা বাধ্যপ্রাপ্ত হয়ে অমানুসিক যত্নগু ভোগ করেছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, এমনকি প্রাণনাশের ভীতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা হতে এতটুকুও-বিচ্যুত হননি। তিনি সর্বদাই বিপদগ্রস্ত মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্র সংশোধনের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। তিনি অন্য ধর্মের প্রতিও সহিষ্ণু ছিলেন, জোরপূর্বক কাউকেও স্বর্ধমে দীক্ষিত করেননি।

সততা ও সত্যবাদিতা : নবুয়াত প্রাপ্তির বহু পূর্ব হতেই মহানবি (স.) তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশৃঙ্খলার জন্য আরব সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। সেই জাহেলিয়া যুগেও তিনি ছিলেন অন্যান্য আরববাসী হতে একটি ব্যতিক্রম চারিত্রি। তাঁর চারিত্রিক মাধ্যমে মুক্ত হয়ে আরবগণ তাঁকে ‘আল-আমিন’ উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কাবাঘরে কৃষ্ণপাথরকে কেন্দ্র করে বিবদমান বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উচ্চব হয়েছিল যুবক মুহাম্মদ (স.) শান্তিপূর্ণভাবে এবং সকলকে সন্তুষ্ট করে এর সমাধান করেছিলেন। এ ধরনের গোত্রীয় কলহ ও সামাজিক আরাজকতা দমনের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার নিঃস্বার্থ যুবকদের নিয়ে

‘হিলফ-উল-ফুজুল’ নামে শান্তি সংব গঠন করেছিলেন। মদিনায় হিজরতের পরও তিনি ইহুদি ও পৌত্রিকদের বহু বিবাদ-বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করেন। তিনি জীবনে কোনোদিন প্রতারণা, প্রবৃষ্টিনা ও মিথ্যার আশ্রয় নেন নি। হুদায়বিয়ার সন্ধির অঙ্গীকার রক্ষা করতে গিয়ে তিনি মক্কা হতে মদিনায় আগত মুসলমানদেরকে গ্রহণ করতে অঞ্চিকার করেছিলেন।

বদান্যতা ও নম্রতা : হযরত মুহাম্মদ (স.) আর্তের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর বদান্যতার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বিপদে ধৈর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, অনুকম্পা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। তিনি বলতেন, “আমি শান্তি প্রদানের জন্য আবির্ভূত হই নি, শান্তির দৃত হিসেবে এসেছি।” তিনি ছিলেন নম্র ও মিষ্টভাষী। তিনি কাউকে আঘাত দিয়ে কখনও কথা বলেন নি। দাসদাসীদের প্রতিও তিনি সদয় ব্যবহার করতেন।

ক্ষমার প্রতীক : হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। তাঁর সংস্পর্শে আগত শত্রুমিত্র সকলেই তাঁর নম্র বিনয়ী ও অমায়িক ব্যবহারে বিমুক্ত হয়েছে। তিনি কোনোদিন বৃঢ় আচরণ দ্বারা কাউকে মনঃকষ্ট দেন নি। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও উদার ব্যবহার দ্বারা তিনি শক্তির মন জয়ের যে দ্রষ্টান্ত স্থাপন করেন তা তুলনাহীন। সীয় ঘাটককে তিনি ক্ষমা প্রদর্শনে দ্বিধা করেন নি। মক্কা ও তায়েফ বিজয়ের সময় তিনি যে ক্ষমার আদর্শ প্রদর্শন করেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। উইলিয়াম মুইরের মতে, “যে মক্কাবাসীরা এতদিন ধরে মুহাম্মদ (স.) কে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছিল তাদের প্রতি তাঁর এ উদার ব্যবহার সত্যই প্রশংসনীয়।” বিদায় হজ উপলক্ষে তিনি আরাফাত ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সর্বকালে সর্বদেশের জন্য একটি ‘মানবিক সনদ হয়ে থাকবে। কোলীন্য, দাসপ্রথা, নরহত্যা প্রভৃতি ও অসামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি সাম্য ও মৈত্রীর এক নবযুগের সূচনা করেন।

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন : মহানবি (স.) সরল, সাধারণ এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। স্বহস্তে তিনি গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম এমনকি দুঃখদোহন, ঘরবাড়ি পরিষ্কার, জুতা মেরামতও করতেন। তার বেশভূষায় আড়ম্বরতা প্রকাশ পায় নি। বস্ততপক্ষে সাদাসিংহে জীবনযাত্রার আদর্শ দ্বারা তিনি ধর্ম ও কর্ম এবং হইলোকিক ও পারলোকিক জীবনধারার আদর্শ সমন্বয় সাধন করেন।

নির্বাতিত মানবতার আগকর্তা : আরবের অধিবাসীরা যখন জুলুম ও অবিচারে নির্বাতিত- নিষ্পেষিত, তখন হযরত মুহাম্মদ (স.) দুনিয়ায় এসেছিলেন মজলুম মানুষের আগকর্তা হিসেবে। মাত্র বাইশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি সভ্যতা বিবর্জিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পৌত্রিক আরব জাতিকে এক সুসভ্য জাতিতে পরিণত করে তাদেরকে নৈতিক ও আত্মিক পতনের অন্ধকৃপ হতে তাওহিদ, নীতিবৈধ ও ন্যায়পরায়ণতার উচ্চতম স্তরে উন্নীত করেছিলেন। সকল গোত্রায়-কলহ দূরীভূত করে গোটা আরব জাতিকে তিনি ইয়ানভিত্তিক ঐক্যের বৰ্ষনে বেঁধেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে ও তার প্রণীত আইনের কাছে আগন-পর, মুসলিম-অয়সলিম সকলেই ছিল সমান। মহানবি (স.) ছিলেন দরিদ্র, অসহায়, দুর্বল ও মজলুমের বৰ্ষু। তিনি মানুষের হাসি-কান্নার শরীক ছিলেন। শোকার্ত ও দুঃখপীড়িত মানুষকে তিনি আন্তরিক সমবেদনা প্রদর্শন করতেন এবং তাদের দুঃখ ভোগের সঙ্গী হতেন। অভাবের সময় তিনি স্কুধার্তকে নিজ খাদ্যের ভাগ প্রদান করতেন এবং প্রতিবেশী প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আন্তরিকভাবে কামনা করতেন। তিনি দাসদাসী ও অধীন লোকদের প্রতি সর্বাধিক মানবেচিত আচরণ করতেন।

পরিশেষে বলা যায়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পাপাসন্ত ব্যাডিচারে লিপ্ত আরবদের সত্যপথে পরিচালিত করে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি সুস্বদ্ধ, দিগ্নিজয়ী জাতিতে পরিণত করাই হযরত মুহাম্মদ (স.) এর কৃতিত্ব। মূলত তাঁর জীবনদর্শ সর্বদেশে, সর্বযুগে ও সর্বমানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য। তাঁর সীমাহীন প্রতিভা শুধু আরবদের স্থানীয় কার্যাবলিতেই প্রতিফলিত হয়নি, বহির্বিশ্বে ও আন্তর্জাতিক সমস্যাদির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। সীয় চরিত্রের মাঝুর্য ও তুলনাহীন কীর্তি-কলাপের জন্য তিনি ছিলেন বিশ্বের অনন্ত

কল্যাণ, মানবজাতির পরম আদর্শ ও স্মর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে যোসেফ হেল বলেন, “মুহাম্মদ (স.) এমনই একজন মহাপুরুষ ছিলেন, যাকে না হলে বিশ্ব অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। তাঁর কৃতিত্বময় ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।”

অনুশীলনী

সূজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

- ১। সাদি ও মাহদি এলাকায় প্রভাবশালী ব্যক্তি। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাদি বলল, মহানবী (স.) একটি যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জনের সৈন্য বাহিনী নিয়ে বিজয় অর্জন করেছিলেন। এ বিজয়ই ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। মাহদি বলল, এ বিজয়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী পুনরায় মুসলমানদের আরেকটি যুদ্ধ করতে ব্যাধি করে। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর জন্য কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।
 - ক. মদিনা সনদের ধারা কয়টি?
 - খ. বদর যুদ্ধের নামকরণ এমন হলো কেন?
 - গ. সাদি কোন যুদ্ধের কথা বলতে চেয়েছিল? এ যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. মাহদির বিবৃত যুদ্ধের ফলাফল ইসলামের ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।
- ২। রাশেদ ও যায়েদ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাশেদ রহিমাবাদ গ্রামের অধিবাসী। ছেট বেলা থেকেই তিনি সমাজ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এলাকাবাসী তাকে বিশ্বাস করে তার কাছে আমানত রাখতো। তাকে বিবাদ শীমাংসার জন্য ডাকতো। তার সুনামে ঈর্ষাণ্বিত হয়ে এলাকার প্রভাবশালী লোকেরা তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। পাঁচ বছর পর অবস্থার পরিবর্তন হলে তিনি এলাকায় এসে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে ক্ষমা করে দেন। রাশেদের বন্ধু যায়েদ রূপনগরের মেয়ের নির্বাচিত হয়ে এলাকার হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে সহ অবস্থান নিশ্চিত করেন। দীর্ঘদিনের বিরোধ-মিটানোর জন্য একটি গ্রহণযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন করেন। যা এলাকার সকলের মধ্যে স্বত্ত্ব ফিরিয়ে আনে।
 - ক. মুহাজির অর্থ কী?
 - খ. আনসার বলতে কী বোঝায়?
 - গ. রাসুল (সঃ)-এর জীবনের কোন ঘটনার সাথে রাশেদের কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. যায়েদের কার্যক্রমের ফলাফল মদিনা সনদের আলোকে মূল্যায়ন কর।

৩। পাংশা উপজেলার নোমান বাহিনী ও হাসান বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে নোমান বাহিনী বিজয়ী হয়। এ সংঘর্ষের বদলা নিতে হাসান বাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয় বাহিনীর মধ্যে আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে নোমান বাহিনী জয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু নোমান বাহিনীর সদস্যদের শৃঙ্খলার অভাব, নেতৃত্ব আদেশ অমান্য, নোমান সাহেবের মৃত্যুর শুরু, হাসান বাহিনীর সেনাপতির যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি কারণে নোমান বাহিনী পরাজয় বরণ করে।

- ক) বদরের যুদ্ধ কত খ্রিস্টান্দে সংঘটিত হয়েছিল?
 - খ) গনিমাত বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।
 - গ) উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সে যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ) উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ কর।
৪. বদরের যুদ্ধে পরাজিত হলেও কাফিররা দমে যায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করা। কিন্তু মহানবি (স.)-এর নেতৃত্বে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মদিনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের শক্তি ও সামর্থ্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। তখনিই মহানবি (স.) এর সাথীগণ মাত্তুমিতে গিয়ে হজ পালন করার ইচ্ছা পোষন করেন। মক্কায় যাওয়ার পথে যাতে কোনো অসুবিধায় পড়তে না হয় সে জন্য মহানবি (স.) কুরাইশদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং মিলেমিশে সবাই তাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। মহানবির এই উদারতায় দলে দলে অনেকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কায়েম হয় ইসলামি হুকুমাত।

- ক. মুতাব যুদ্ধ কত খ্রিস্টান্দে সংঘটিত হয়েছিল?
- খ. উভদের যুদ্ধের কারণটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত চুক্তিটিতে ইসলামের কোন সন্ধির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সন্ধি বিধর্মী ও মুসলমানদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে- বিশ্লেষণ কর।

৫. ইসলামের ইতিহাসে মহানবির একটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটিতে তিনি আল্লাহর কাছে মানুষের জবাবদিহিতা, নারী-পুরুষ পরম্পরের প্রতি অধিকতর আমানতের গুরুত্ব, সুদ প্রথা, দাস-দাসীদের প্রতি ব্যবহার, নরহতা, ব্যাভিচার, শ্রেণি বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে সমবেত জনসমূহের উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রদান করেন। তার এ বজ্যে বিশ্ব মুসলিম আত্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ মুসলমানগণ আত্মের অভাবে বিশ্বজুড়ে অবহেলিত ও অত্যাচারিত।

- ক. মুলতরী ওমরাহ কী?
- খ. খন্দকের যুদ্ধের কারণটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. নারী অধিকার আদায়ে উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে করনীয় ব্যাখ্যা কর।

৬. হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন যুগান্তকারী সমাজ সংস্কারক। যুগ যুগ ধরে চলে আসা মানুষে মানুষে তেদাতেদ বিলুপ্ত করে সাম্যের এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন আরব জাহানে নিগৃহীত নারী জাতিকে তিনি পূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ভোগের পরিবর্তে পুরুষের অর্ধাঙ্গনী ও জীবন সঞ্জিনী রূপে মর্যাদা পায় নারী।

ক. খাইবারের যুদ্ধ কত প্রিষ্ঠাদে সংঘটিত হয়েছিল?

খ. সাম্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাদিসটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত হযরত মুহাম্মদ (স.) কে যুগান্তকারী সমাজ সংস্কারক বলার কারণটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ভোগের পরিবর্তে অর্ধাঙ্গনী ও জীবন সঞ্জিনী রূপে মর্যাদা পায় নারী’ – উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

বঙ্গ নির্বাচনি প্রশ্ন

১. মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমানদের মহানবি (স.) কী হিসেবে অভিহিত করেন?

- | | |
|--------------|-------------|
| ক) আনসার | খ) মুশরিক |
| গ) মুহাজিরিন | ঘ) ইয়াসরিব |

২. মদিনায় মহানবি (স.) এর আগমনের ফলে মদিনাবাসী-

- i. সাম্য ও আত্মের আদর্শে উদ্বৃদ্ধ হয়
- ii. বিভিন্ন গোত্রে পরম্পর কলহে লিপ্ত হয়
- iii. ইহুদিদের সাথে সমরোতায় উপনীত হয়।

কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| ক) i ও ii | খ) ii এবং iii |
| গ) i এবং iii | ঘ) i,ii এবং iii |

৩. যুদ্ধ বিধিস্ত মদিনা নগরীর পুনর্গঠনে মহানবি (স.) কর্তৃক প্রণীত মদিনা সনদ কী প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখে?

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ক) আইনের শাসন | খ) সম্প্রীতি ও আত্ম |
| গ) অমুসলিমদের অধিকতর সুযোগ সুবিধা | ঘ) মহানবিকে সর্বশেষ মহাপুরুষের রূপে |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪-৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হিজরতের পর মহানবি (স.) মদিনায় ইসলাম ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হলে মক্কার কুরাইশ গোত্রসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন অমুসলিমদের নিকট থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে অমুসলিম ও মুসলমানদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা করা হয় পরে মক্কা বিজয়ে ইসলামের প্রসারতা আরও বৃদ্ধি পায়। মহানবি (স.) মক্কা বিজয়কে অধিক তাৎপর্য বলে মনে করেন।

৪. ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবি (স.) বিধৰ্মীদের কাছ থেকে প্রথম প্রতিরোধের সম্মুখীন হন-

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ক) উহুদের যুদ্ধে | খ) বদরের যুদ্ধে |
| গ) নাখলার খড় যুদ্ধে | ঘ) খন্দকের যুদ্ধে |

৫. মহানবি (স.) এর মহানুভবতায় ইসলামের তাওহিদে দীক্ষিত হন খ্রিস্টান গোত্র-

- i. বানু হানিফা
- ii. বানু নাজির
- iii. বানু হারিস

কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| ক) i ও ii | খ) ii এবং iii |
| গ) i এবং iii | ঘ) i,ii এবং iii |

৬. ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.) মক্কা বিজয়কে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন কেন?

- | | |
|--|--|
| ক) মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে | |
| খ) মক্কার গোত্র কলহ দূর হবে | |
| গ) মুসলিম ও বিধৰ্মীদের মধ্যে সহাবস্থান বৃদ্ধি পাবে | |
| ঘ) ইসলাম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে | |

৭. বিদায় হজের অমূল্য ভাষণে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আহ্বান জানান-

- i. ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আত্ম বন্ধনে আবদ্ধ হবার
- ii. বংশগত কৌলীন্য প্রথা বিলুপ্ত করা
- iii. শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার

কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক) i | খ) ii |
| গ) i এবং iii | ঘ) ii এবং iii |

৮. হিলফ-উল-ফুজুলের উদ্দেশ্য কী ছিল?

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ক) আরবদের গোত্রীয় কলহ দূর করা | |
| খ) আরবদের সুসভ্য জাতিতে পরিণত করা | |
| গ) আল্লাহর বাণী পৌছানো | |
| ঘ) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা | |

তৃতীয় অধ্যায়

খুলাফায়ে রাশেদিন

প্রথম পরিচেদ

খলিফার পরিচয়, যোগ্যতা ও নির্বাচন

খুলাফায়ে রাশেদিনের পরিচয় ৪ খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। পবিত্র কুরআনের ভাষায় প্রত্যেক মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে হয়রত মুহাম্মদ (স.) এর মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর নেতাকে খলিফা বলা হয়। এ খলাফত হচ্ছে মিনহাজুন নবুওয়্যাত বা নবুয়তের পদ্ধতি। ব্যাপকার্থে খলাফত হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামের সরকার পদ্ধতিকে খলাফত বলা হয়। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন হয়েছিল খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে। আর তাঁদের ত্রিশ বছরের (৬৩২-৬৬১ খ্রি:) খলাফত কালই ছিল ইসলামি শাসন ব্যবস্থার আদর্শ সোনালী যুগ। মহান আল্লাহর সর্বপ্রথম হয়রত আদম (আ.) কে পৃথিবীর খলাফত দান করেছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যেও এ খলাফত পুরুষানুক্রমে চলতে থাকে- যা বিশ্বনবি হয়রত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। মুসলমানদের জন্মতের ভিত্তিতে তাদের যে নেতা নির্বাচিত হয়, তাঁকে ইমাম বা খলিফা বলে। কারণ তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর নবির প্রতিনিধি এবং মুসলমানদের নেতা।

হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন বিশিষ্ট সাহাবি আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্রের শাসন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে গেছেন, তাঁরা খুলাফায়ে রাশেদিন বা সত্যপথগামী খলিফা নামে পরিচিত। তাঁরা হলেন-

১. হয়রত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)
২. হয়রত উমর ফারুক (রা.)
৩. হয়রত উসমান (রা.) এবং
৪. হয়রত আলী (রা.)

মহানবি (স.) এই খলাফতের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে- “তোমাদের উপর আমার আদর্শের অনুসরণ ও খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শের অনুসরণ অত্যবশ্যক।” খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবন ও তাঁদের ত্রিশ বছরের খলাফত যুগের নজিরবিহীন কৃতিত্বের প্রমাণ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে অনুমান করা যায়।

প্রশাসন ৪ খলিফা ছিলেন প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। শুরা বা উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ইবনে খালদুনের মতে, “খলাফত হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান যা মহানবি (স.)-এর মিশনের প্রতিনিধি করে। সে কারণে খলিফার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

- নির্বাচন পদ্ধতি ৪ খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল গণতান্ত্রিক। খুলাফায়ে রাশেদিনের খলিফাগণ

যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে খলিফাদেরকে তিনটি উপাধিতে আখ্যায়িত করা হতো। তা হলো খলিফা, ইমাম ও আমিরুল মুমিনীন। আল মাওয়ারদীর মতে, খলিফা পদের জন্য প্রাথমিক ৩টি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। তাঁকে কুরাইশ বংশোদ্ভূত, মুসলমান, পুরুষ, প্রাপ্ত বয়স্ক, চরিত্রবান, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, শাসন কার্য পরিচালনার উপযোগী এবং কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তদুপরি তাঁকে মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য উপযুক্ত সাহসের অধিকারী হতে হবে।

এ যুগের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল দুটো। একটি সরাসরি নির্বাচন যেমন হ্যরত আবু বকর (রা.) প্রথম খলিফা হিসেবে জনগণের সরাসরি সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় হলো নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক মনোয়ন দান। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, শিক্ষিত, ন্যায়বান, আদর্শবান কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে খলিফাগণ মৃত্যুর পূর্বে একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতেন। খলিফার মৃত্যুর পর তাঁরা পরবর্তী যোগ্য লোকদের মধ্য থেকে খলিফা নির্বাচন করতেন। এ পদ্ধতিতে হ্যরত উমর (রা.), হ্যরত উসমান (রা.) ও হ্যরত আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। আদর্শবান ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ একজন খোদাতারী, সৎ, যোগ্য, পদের প্রতি লোভহীন, সাহসী, কর্মী, সংযমী, উচ্চাবনীয় ও বিশ্লেষণী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করতেন। সকলে তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন। প্রশাসক বা কোন দায়িত্বশীল নিয়োগের ক্ষেত্রে সে আমলে মনোনয়ন দান করা হত সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে। কারণ জাতীয় স্বার্থকেই তাঁরা বড় করে দেখতেন।

খলিফাদের বেতন ভাতা : খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে খলিফাদের কোনো বেতন দেয়া হত না। সরকারি অর্থে বা বাইতুল মালে তাদের কোনো প্রকার দাবি ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণের মতো সরকারি ভাতা গ্রহণ করে তারা সরকার পরিচালনার কাজ করতেন। অবশ্য তাঁরা অনেকেই এ ভাতা মৃত্যুর আগে নিজ সম্পত্তি থেকে বাইতুল মালে ফেরত দিয়ে গেছেন।

জীবনযাত্রা : খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে খলিফাদের জীবনযাত্রা ছিল সাধারণ ও অনাড়ম্বর। খলিফাগণ মসজিদে বসেই রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন ৪ সাম্যবাদের মূর্ত প্রতীক হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। তার কোনো পুত্র সন্তানও তাঁর ইন্তিকালের সময়ে জীবিত ছিলেন না। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু হয়। খুলাফায়ে রাশেদিনের চারজন খলিফা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন তার একটি বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল।

হ্যরত আবু বকর (রা.) এর খলিফা নির্বাচন ৪ হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর আনসারগণ সাকিফা নামক মিলনায়তনে একত্রিত হন এবং খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করেন। আনসারগণ চেয়েছিলেন- খলিফা দু'জন হোক। একজন আনসারদের মধ্য থেকে অন্যজন মুহাজিরদের মধ্য থেকে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, খলিফা দু'জন হলে তা সাংঘাতিক মতান্মেকের কারণ হতো। শুধু আনসারদের মধ্যে থেকেও খলিফা নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না।

খিলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। মহানবি (স.) এর চাচাত ভাই ও জামাতা হিসেবে একদল মুহাজির হ্যরত আলী (রা.) কে রাসুলের উত্তরাধিকারী বলে প্রচারণা চালান। এদিকে আনসারগণ সাঁদ বিন আবু উবায়দাকে খলিফা নির্বাচনের দাবী জানান। এই বিষয়ে যখন বাক-বিত্ত শুরু হলো তখন হ্যরত আবু বকর (রা.) খুবই উত্তম পন্থায় আনসারদের বুকাতে সক্ষম হলেন। হ্যরত উমর (রা.) এর উদ্দীপনায় সবাই এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, হ্যরত আবু বকর সিদ্ধিক (রা.)-এর উপর

খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। অতঃপর মুহাজিরদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম হযরত উমর (রা.) এবং আনসারদের মধ্য হতে হযরত বাসির ইবনে সাদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর হস্ত ধারণ করে বাইআত গ্রহণ করলেন। তারপর উপস্থিত জনতা বাইআত গ্রহণ করেন। মোট কথা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভালোভাবে সমাধা হয়ে গেল এবং মুসলমানগণ হযরত নবি করিম (স.) এর কাফল-দাফনে মনোনিবেশ করেন।

বয়োজেষ্ট্যতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি, নিঃযোর্ধ্ব আত্মত্যাগ, সামাজিক কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য ইসলামি রীতিতে হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। তাকে খলিফা নির্বাচনে রাসূল(স.)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও পরোক্ষ ইঙ্গিত ছিল। খলিফা নির্বাচিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের সাম্যবাদ ও আত্মত্ববোধে মুসলিম জাহানকে উদ্বৃদ্ধ করেন।

খলিফার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি :

আল্লাহ তায়ালার প্রত্যাদেশ লাভ ব্যতীত খলিফাকে নবৃত্তের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই তাঁকে ঐ সমস্ত আত্মিক, দৈহিক ও চারিত্বিক গুণাবলিতে গুণাবিত হওয়া উচিত, যার দ্বারা একজন নবি গুণাবিত হয়ে থাকেন। তবে, নবির সমস্ত গুণাবলির প্রতিবিম্ব খলিফার মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। খলিফা নির্বাচনের জন্য ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খালদুন ৪টি শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন—

- ন্যায়পরায়নতা :** একজন খলিফার মধ্যে ন্যায় পরায়নতা সত্যবাদিতা ও সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে।
- দৃঢ়চিন্তাতা :** ইসলামি শরিয়তের বিধান বাস্তবায়ন, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ, জ্ঞান, কলাকৌশল, প্রজ্ঞা, প্রত্যয় ও সাহস অবশ্যই থাকতে হবে।
- ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুস্থিতা :** একজন খলিফা শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। বিকলাঙ্গ হওয়া ঠিক নয়। তার ঢোখ, নাক, কান, কঠুমুর, হাত-পা ইত্যাদির সুস্থ ও সবল থাকতে হবে।
- হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের মোগ্যতা :**

নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফত প্রাপ্তি ন্যায়সংজ্ঞাত ও গুরুত্বপূর্ণ :

- ১। পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত।
- ২। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব।
- ৩। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য।
- ৪। হযরত আবু বকরের প্রতি মহানবি (স.) এর পূর্ণ আস্থা।
- ৫। মহানবি (স.)-এর কথা ও কাজের দ্বারা হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রতি ইঙ্গিত।
- ৬। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) এর মর্যাদা।
- ৭। ইসলামের সেবায় হযরত আবু বকর (রা.) এর আর্থিক আত্মত্যাগ।

দ্বিতীয় খলিফা হ্যরত উমর (রা) এর নির্বাচন

ইসলামি শরিয়ত মতে হ্যরত আবু বকর (রা.) দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে যান। খিলাফত নিয়ে যাতে কোন রকম দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি না হয়, এজন্য তিনি অন্তিম অবস্থায় প্রথ্যাত সাহাবি হ্যরত আবদুর রহমান (রা.), হ্যরত উসমান (রা.) হ্যরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং আরও বিশিষ্ট সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে যোগ্যতার বিবেচনায় হ্যরত উমর (রা.)-কে দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

হ্যরত উমরের (রা.) কঢ়া মেজাজের জন্য হ্যরত তালহা (রা.) তার সম্মতি দিতে ইতস্তত করলে হ্যরত আবু বকর (রা.) হ্যরত তালহাকে বলেন যে, রাষ্ট্রের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করলেই তিনি কোমল ও দয়ালু হয়ে যাবেন। হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তিকালের পর দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে হ্যরত উমর (রা.) এর মনোনয়ন ঘোষণা করা হলে জনসাধারণ তাঁর নিকট স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এভাবে হ্যরত উমর (রা.) গণতান্ত্রিকভাবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন।

তৃতীয় খলিফা হ্যরত উসমান (রা.) এর নির্বাচন

হ্যরত উমর (রা.) নিজ জীবন্দশায়ই খিলাফতের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দায়িত্ব হ্যরত উসমান (রা.), হ্যরত আলী (রা.), হ্যরত তালহা (রা.), হ্যরত যুবাইর (রা.), হ্যরত সাদ (রা.) এবং হ্যরত আবদুর রহমান বিন আউফকে নিয়ে গঠিত এক পরিষদের উপর ন্যস্ত করেন। আর তার ইন্তিকালের তিনদিনের মধ্যেই মনোনয়ন সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। এ সকল সাহাবাগণের মধ্যে সবাই ছিলেন ইসলামের খেদমতে সমানভাবে নিবেদিত। শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে কেউই একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার মত বিশেষত্ব দেখাতে পারেননি। জনগণের নিকট বেশি শুল্কাভাজান ছিলেন হ্যরত আবদুর রহমান (রা.)। কিন্তু খিলাফতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণে তিনি রাজি ছিলেন না। হ্যরত আলী (রা.) ছিলেন মহানবি (স.) এর জামাতা ও চাচাত ভাই। শিক্ষা-দীক্ষা ও শোর্যবীর্যে তার তুলনা ছিল না। পারস্য বিজয়ী বীর হ্যরত সাদ (রা.) এর ইসলামের জন্য অবদান ছিল অসামান্য। এ সময় হ্যরত তালহা (রা.) রাজধানী মদিনায় ছিলেন না। হ্যরত উসমান (রা.) ৭০ বছরের প্রৌঢ় হলেও ইসলামের খেদমতে অকাতরে দান করেন এবং মহানবি (স.) এর দু'কন্যা রোকেয়া ও উমে কুলসুমের জামাতা হয়ে যুন্নুরাইন খেতাবে ভূষিত ছিলেন। হ্যরত সাদ (রা.), হ্যরত তালহা (রা.) ও হ্যরত যুবাইর (রা.) খিলাফতের প্রত্যাশী ছিলেন না। এমন অবস্থায় হ্যরত আবদুর রহমান (রা.) হ্যরত উসমান (রা.) ও হ্যরত আলীর (রা.) এর নাম প্রস্তাব করেন। হ্যরত সাদ (রা.) হ্যরত উসমান (রা.)-কে সমর্থন করেন। হ্যরত যুবাইর (রা.) হ্যরত উসমান (রা.) ও হ্যরত আলী (রা.) উভয়ের নাম প্রস্তাব করেন। হ্যরত উসমান (রা.) হ্যরত আলীকে এবং হ্যরত আলী (রা.) হ্যরত উসমান (রা.)-কে সমর্থন দিলেন। হ্যরত আবদুর রহমান (রা.) ভোটদানে বিরত রইলেন। ফলে হ্যরত উসমান (রা.) এর পক্ষে একটি ভোট বেশি পড়ে এবং খলিফা নির্বাচিত হলেন। প্রত্যেকেই তার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। হ্যরত তালহা (রা.) ফিরে এলে হ্যরত উসমান (রা.) তাঁকে খলিফা পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি হ্যরত উসমান (রা.) এর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। জনসাধারণ সবাই তার প্রতি আনুগত্যের শপথে গ্রহণ করেন। এভাবে হ্যরত উমর (রা.) এর মৃত্যুর ৪৮ দিনে ২৪ হিজরির ১লা মহরম (৬৪৪ খ্রি:) হ্যরত উসমান (রা.) ইসলামি জগতের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) এর নির্বাচন

খলিফা হযরত উসমান (রা) এর হত্যাকাণ্ডের পর আরবের সর্বত্র বিশ্বজগতে দেখা দেয়। খিলাফতের পবিত্রতা ও মর্যাদা বিনষ্ট হয়। এ সময় তিনটি দলে উগ্রপন্থীয়া বিভক্ত হয়ে স্ব-স্ব দলের মনোনীত ব্যক্তিকে খলিফা পদে বরণ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। এবূগুলিয়ের পূর্ণ পরিস্থিতিতে হযরত উসমান (রা) এর উত্তরাধিকারী তথা পরবর্তী খলিফা নির্বাচন খুবই কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করে।

বিদ্রোহী কুফাবাসীয়া হযরত জুবাইর (রা), বসরাবাসীয়া হযরত তালহা (রা) এবং মিসরীয়রা ইবনে সাবার নেতৃত্বে হযরত আলীকে খলিফা হিসেবে সমর্থন করে। পরিশেষে হযরত উসমান (রা) এর হত্যার ৫ম দিনে মিসরীয় বিদ্রোহীয়া হযরত আলী (রা) এর নাম প্রস্তাব করেন। কুফা ও বসরার বিদ্রোহীয়াও হযরত আলী (রা) কে সমর্থন জানান মদিনার প্রভাবশালী নাগরিকগণের অনুরোধে হযরত আলী (রা) খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হন। জনসাধারণও তাঁর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহন করেন। এভাবে গণতান্ত্রিক উপায়েই ইসলামের চতুর্থ খলিফা হিসেবে হযরত আলী (রা) (২৩ জুন, ৬৫৬ খ্রি) নির্বাচিত হন।

এক নজরে খুলাফায় রাশেদিনের সময়কাল।

খলিফা	খেলাফতের সূচনা	সমাপ্তি	সময়কাল
হযরত আবু বকর (রা.)	১৩ই রবিউল আউয়াল ১১ হিজরি	২২ শে জমাদিউল উখরা ১৩ হিজরি	২ বছর ৩ মাস ৯ দিন
হযরত উমর ফারুক (রা.)	২৩ শে জমাদিউল উখরা ১৩ হিজরি	২৬ শে জিলহজ্জ ২৩ হিজরি	১০ বছর ৬ মাস ৩ দিন
হযরত উসমান (রা.)	১লা মুহররম ২৪ হিজরি	১৮ই জিলহজ্জ ৩৫ হিজরি	১১ বছর ১১ মাস ১৭ দিন
হযরত আলী (রা.)	২৪ শে জিলহজ্জ ৩৫ হিজরি	১৭ই রম্যান ৪০ হিজরি	৪ বছর ৮ মাস ২৩ দিন
হযরত ইমাম হাসান (রা.)	২২ শে রম্যান ৪০ হিজরি	বরিউল আউয়াল ৪১ হিজরি	৬ মাস ৮ দিন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ)

হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ : ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)। নবি-রাসূলগণের পরই তাঁর মর্যাদা। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি অন্যান্যদের জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন না বরং পুত্র-পুত্র চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি আজীবন রাসূলুল্লাহর পাশে ছিলেন ছায়ার মতো। নবুয়াতের আগে ও নবুয়াত লাভের পরে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে সমানভাবে সমান ও মর্যাদা দিয়ে তিনি তাঁকে অনুসরণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর জীবন-চরিত্র আরও উন্নততর হয়ে উঠে। প্রাথমিক জীবনে তিনি মানবতার সেবা করতেন। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি আরও বেশি দুর্গত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ইসলামের সেবায় তিনি তাঁর সমুদয় ধন-সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ। উপনাম ছিল আবু বকর। আতিক ও সিদ্ধিক ছিল তার উপাধি। তার পিতা হলেন হ্যরত ওসমান ওরফে আবু কুহাফা এবং মাতা ছিলেন হ্যরত সালমা ওরফে উম্মুল খায়ের। তার পিতামাতা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশের ‘তাইম’ গোত্রে ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর চেয়ে তিনি বছরের ছোট ছিলেন।

হ্যরত আবু বকর (রা.) জাহেলিয়াতের যুগে বিরাট ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। এ উপলক্ষে তিনি একাধিকবার সিরিয়া ও ইয়ামেন সফর করেন। আঠার বছর বয়সে প্রথম বারের মতো তিনি বিদেশ সফর করেন। কুরাইশ বংশের সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন গোত্র আরবের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যের জিম্মাদার ছিলেন। রক্তপণ আদায়ের জিম্মাদারী তাঁর উপর ন্যাত ছিল। বংশ গণনায়ও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই হ্যরত আবু বকর (রা.) উত্তম স্বভাব চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে থেকেই তিনি মূর্তিপূজা ও মদ্যপানকে ঘৃণা করতেন।

উচু মর্যাদা : আরবে যথারীতি কোন বাদশাহ বা শাসনকর্তা ছিল না। হ্যরত আবু বকর (রা.) কুরাইশ বংশের সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। হ্যরত আবু বকর (রা.) জ্ঞান-বুদ্ধি, বৈর্য ও সহনশীলতায় অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন। অবশ্য ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কাব্য চর্চা পরিত্যাগ করেন। ইবনে সায়াদ নবি করীম (স.) এর শোকগাঁথায় হ্যরত আবু বকর (রা.) এর কবিতার উদ্বৃত্তি দিয়েছেন।

স্বভাব-চরিত্র : আবু বকর (রা.) উত্তম স্বভাবের ছিলেন। হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর প্রকৃতি ছিল হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর সাথে সামঝস্যশীল। সমবয়সী ও একই স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী হওয়ার কারণে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ও হ্যরত আবু বকর (রা.) এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর এই সম্পর্ক এত নিবিড় হয় যে, হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেন- আমাদের এমন কোনোদিন অতিবাহিত হয়নি, যেদিন রাসুলুল্লাহ (স.) সকাল-সম্মায় আমাদের গৃহে পদার্পণ করেননি।

ইসলাম গ্রহণ : হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর যখন ওহি নাযিল হয় তখন হ্যরত আবু বকর (রা.) বাণিজ্য উপলক্ষে ইয়ামেনে ছিলেন। যখন তিনি ফিরে আসেন তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করতে যান। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কোনো নতুন খবর আছে? তারা উত্তর দিল, “হ্যাঁ এক নতুন খবর আছে, আর তা হলো আবু তালিবের ইয়াতীম ভাতিজা নবুয়তের দাবী করেছে। এ শুনে হ্যরত আবু বকরের অন্তর কেঁপে উঠল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাঁর নিকট হতে চলে যাওয়ার পর তিনি সরাসরি নবি (স.) এর খেদমতে গিয়ে হাজির হন এবং তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। শেষ পর্যন্ত ঐ বৈঠকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবি (স.) বলেছেন, আমি যখন তাঁর নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করি, তিনি কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সাথে তা গ্রহণ করছিলেন। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান।

ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ : ইসলামের জন্য এ আত্মত্যাগকারী ব্যক্তি অনেক দৃঢ়-কষ্ট ভোগ করেছেন। হযরত আবু বকর (রা) নিজের জন্য কখনো ভাবতেন না। তিনি ভাবতেন যেন নবি করীম (স) এর কোন কষ্ট না হয়। হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন আমি দেখি নবি (স) কে কুরাইশরা বেঠেন করে আছে। কেউ তাকে ধরে টানছে, আবার কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। সবাই সমস্যের বলছে— তুমি সেই ব্যক্তি, যে সব খোদাকে এক করে দিয়েছে। হযরত আলী (রা) বলেন ঐ দৃশ্য এত ভয়ানক ছিল যে, আমাদের কারও নবি করিম (স) এর নিকট যাওয়ার সাহস হয়নি। ঠিক তখনই হযরত আবু বকর (রা) এগিয়ে আসলেন, কুরাইশদের ধাক্কা দিয়ে নবিজীকে মুক্ত করলেন।

তিনি সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তার সমুদয় অর্থ ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। তিনি অনেক দাস-দাসীকে তাদের মনিবদ্দের নির্যাতন হতে মুক্ত করার বিপুল অর্থে খরিদ করে মুক্ত করে দেন। হযরত বিলাল (রা) কে মুক্ত করা সম্পর্কে হযরত উমর (রা) মন্তব্য করেছেন : “হযরত আবু বকর (রা) আমাদের নেতা, তিনি আমাদের নেতাকে আখাদ করেছেন।”

হযরত আবু বকর (রা) এর আর্থিক ত্যাগ সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন, “আবু বকর-এর সম্পদ দ্বারা আমার যে উপকার হয়েছে, অন্য কারো সম্পদ দ্বারা সেরূপ হয়নি।” অন্য এক জায়গায় রাসুলুল্লাহ (স) অত্যন্ত করণা ও কৃতজ্ঞতার সাথে বলেন, “নিঃসন্দেহে জান ও মালের দিক দিয়ে আমার উপর আবু বকর (রা) এর চেয়ে অধিক অনুগ্রহ অন্য কারো নেই।” যখন হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম জমা ছিল। কিন্তু যখন তিনি মদিনায় পৌছেন তখন তাঁর নিকট পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। তিনি ছিলেন নবি করিম (স) এর হিজরতের সাথী ও গুহার সাথী। তিনি নবি করিম (স) এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) এর প্রথম ভাষণ

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার প্রথম ভাষণে হযরত আবু বকর (রা) বলেন : হে মুসলমানগণ! আমাকে নেতা নির্বাচন করেছেন, যদিও আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। যদি আমি ভালো কাজ করি, আমাকে সাহায্য করবেন, যদি অন্যায় ও খারাপ কাজের দিকে যাই, আমাকে সংশোধন করে দিবেন। শাসকদের নিকট সত্য প্রকাশ করাই উত্তম আনুগত্য। সত্য গোপন রাখ্যদোহীতার শামিল। যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করে না, তারা লাষ্টিত অভিশপ্ত হয়। যে জাতির মধ্যে খারাপ কাজ ব্যাপক হয়, তাদের উপর আল্লাহ বালা-মুসিবত ব্যাপক করে দেন।’

হযরত আবু বকর (রা) গণতান্ত্রিক পন্থায়ই খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স) রোগ শয্যায় শায়িত থেকে তাঁকে নামাযের ইমায়তির ভার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে এই প্রচল্ল ইঙ্গিত ছিল যে, তাঁর তিরোধানের পর আবু বকর খিলাফত প্রাপ্ত হবেন।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ :

হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন।

- ভগুনবিদের আবির্ভাব
- স্বর্ধম ত্যাগীদের বিদ্রোহ
- যাকাত অঙ্গীকারকারীদের গোলযোগ

এছাড়াও হযরত উসামা ইবনে যায়েদের ঘটনা, যাকে রাসুল (স) আপন জীবদ্ধশায় মুতার যুদ্ধের শহীদাননের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সিরিয়া হামলার শুধু আদেশই দেলনি, নিজ হাতে তাঁর পতাকা বেঁধে দিয়েছিলেন। এতে অধিকাংশ বড় সাহাবীর অংশগ্রহণের নির্দেশ ছিল। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় সেনাবাহিনীর মদিনার বাইরে যাওয়া কম বিপদজ্ঞনক ছিল না। দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতায় হযরত আবু বকর (রা) এ সমস্যার সাফল্যজনক মোকাবেলা করেছিলেন।

মূলত তখন সঞ্চক্টের এক পাহাড় খলিফার সামনে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (স.) এর ইনতেকালের পর মুসলমানদের এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে, যদি আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রা.) এর মাধ্যমে আমাদের উপর করণা না করতেন, তাহলে আমরা ধূংস হয়ে যেতাম। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) এর ইনতেকালের পর আমার পিতার উপর এমন সব আকমিক বিপদ আপত্তি হয় যে, যদি তা কোন বিরাট পাহাড়ের উপর নায়িল হত তা হলে সে পাহাড়ও টুকরা টুকরা হয়ে যেত। একদিকে মদিনায় মুনাফিকদের উৎপত্তি, অন্যদিকে আরবের প্রায় সর্বত্র ইসলাম ত্যাগের হিড়িক।

রিদ্বা বা স্বর্ধম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

মহানবি (স) এর ইনতিকালের পর মক্কা ও মদিনা ব্যতীত সমগ্র আরবে ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে স্ব-ধর্ম-ত্যাগী মুরতাদ, ভন্ড নবির আবির্ভাব যাকাত প্রদানে অনিচ্ছা প্রভৃতি স্পর্শকাতর বিষয়সমূহ মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের ভীত নড়বড় করে তোলে। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) অভ্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসবের সমাধানকল্পে যুদ্ধ মোষণা করেন। ইতিহাসে একেই ‘রিদ্বার যুদ্ধ’ বলা হয়। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সহকালীন খিলাফতের বেশিরভাগ সময় এ যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন।

রিদ্বা যুদ্ধের কারণ

ইসলাম প্রসারে বিষ্ণু ৪ রাসুল (স) এর ইনতিকালের পূর্বে আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও জীবনাদর্শের মূল অনুশাসন সম্পর্কে তাদের অনেকেই অজ্ঞ ছিল। এছাড়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকা, যোগাযোগের অভাব, সময়ের স্বল্পতা, সংঘবন্ধতাবে ইসলাম প্রচারের অভাবে এসব লোকজন ইসলামের বিরোধিতা শুরু করে।

মদিনার প্রাধান্য ও অঙ্গীকার ৪ রাসুলের জীবদ্ধশায়ই মদিনা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র ও রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়ার পৌরব অর্জন করে। কিন্তু তার ইন্দেকালের পর মক্কায় একশ্রেণির লোক ও অন্যান্য কুকুরী মহল মদিনার প্রাধান্যকে অঙ্গীকার করে। ঐতিহাসিক পি.কে.হিটি বলেন - , হিজাজ রাজধানীর প্রাধান্য ও তাদের ঈর্ষার এবং বিদ্রোহের (রিদ্বা যুদ্ধের ও) অন্যতম কারণ ছিল।

ব্যক্তি স্বার্থে আঘাত ৪ আরববাসীদের মধ্যে গোত্রপীতি, স্বজনপীতি, স্বাতন্ত্রবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নেতৃত্বের লোভ ছিল। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠার ফলে এসব বিলীন হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় ভাত্তভোধ, সাম্য-মৈত্রীর সুমহান আদর্শ। ফলে বেদুইনদের মনে দারুণ আঘাত হানে। তারা যেহেতু গোত্রের দলপতিকে অম্বের মতো অনুসরণ করতো, তাই গোত্রপতির ধর্ম ত্যাগের সাথে সাথে তারাও ধর্মত্যাগী হয়ে বিদ্রোহ করে।

নবুয়ত প্রাণির আকাঙ্ক্ষা : নবুয়তের পদ ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তাই কতিপয় লোক সম্মান ও পদমর্যাদার লোভে মিথ্যা নবুয়ত দাবী করে আর মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে আরবাসীদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।

ইসলামের বৈশ্঵িক পরিবর্তনের বিরোধিতা : প্রাক ইসলামি যুগে আরবে এমন কোনো অন্যায় কাজ ছিল না যা আরববাসীরা করতো না। রাসুল (স.) ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাস্তীয় জীবন পর্যন্ত সকল স্তরে আমূল পরিবর্তন করেন। শতধা বিচ্ছিন্ন একটি জাতিকে সুশৃঙ্খল সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেন। এতে বেদুইনরা খুশি হতে পারেননি। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর আর্থপর বেদুইনরা ইসলামের বিধানের বিরোধীতা শুরু করে।

ইসলামের নৈতিক অনুশাসনের বিরোধিতা : ইসলামের নৈতিক অনুশাসন, রুচিসম্মত ও মার্জিত জীবনযাত্রায় স্বাধীনচেতনা অনুশাসনযুক্ত আরববাসীরা অভ্যস্থ ছিল না। চিরদিনই তারা ছিল দূরস্থ বাধা-বন্ধনহীন। তাই ইসলামের সালাত, যাকাত, সাওম প্রভৃতি নৈতিক অনুশাসনকে তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। বরং নিজেদের উপর এগুলোকে ভুলুম মনে করলো। আর এ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ইসলাম ত্যাগ করতে উদ্ধৃত্য হল।

যাকাত প্রদানে অধীক্ষিতি : রিদ্বা যুদ্ধের অন্যাতম কারণ ছিল যাকাত প্রদানে অধীক্ষিতি। আরবের কতিপয় লোক মনে করলো, এ যাকাত ব্যবস্থা নবির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। নবি মেহেতু ইন্তেকাল করেছেন, তাই এর প্রয়োজন নেই ফলে তারা আবু বকর (রা) এর খিলাফতের সময় যাকাত দিতে অধীক্ষাকার করলো।

অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ : এক দিকে ইসলাম ত্যাগী বেদুইন স্বার্থান্বেষী গোত্রপতি ও ভঙ্গবিদের অপতৎপরতা শুরু হয় অন্যদিকে বিধীনীদের মধ্যে ইহুদি ও স্থ্রীয়ান সম্প্রদায়ের লোকেরা এ মোক্ষম সুযোগ বুঝে ইসলামের বিরোধিতা বাড়িয়ে দেয় এবং এদের ইরানে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে।

বিচার বৃক্ষের অভাব : পরিবেশের অভাবে আরবদের মন ও মানিক সুষ্ঠুভাবে বিকাশ লাভ করতে পারেনি। ফলে বিচার-বৃক্ষ তাদের খুব কম ছিল। তারা অনেকেই আবেগে আপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও পরে অস্থির ঘে়য়ালী মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এর বিরুদ্ধাচরণ করে।

এসব কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মানুষ ইসলাম ত্যাগ করে পুরোনো ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করে। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) এই আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করেন।

রিদ্বা যুদ্ধের ফলাফল

ইসলামের অখণ্ডতা বজায় : ইসলামি যুগে আরব বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও এলাকায় বিভক্ত ছিল। ইসলাম এসে অখণ্ড জাতি হিসেবে আরবকে মর্যাদার আসন দেয়। কিন্তু নবিজীর ইন্তেকালের পর আরববাসীরা বিভক্ত হয়ে পড়লে পুনরায় আবু বকর ইসলামের অখণ্ডতা বজায় রাখতে সক্ষম হন।

স্থায়ী মর্যাদা জাতি : মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার ভঙ্গবিদের ওপর জয়লাভের পর ইসলাম অবশ্যম্ভবী ধর্মসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করলো।

মুসলমানদের ইমানী শক্তি বৃদ্ধি : রাসুল (স.) এর ইন্তিকালের অঞ্চলের মধ্যেই ইসলামের এ ধরনের বিপর্যয় দেখে অনেক মুসলমানের মনেও সংশয় ছিল কিন্তু হ্যরত আবু বকর (রা) এর দ্রৃঢ় প্রতিরোধের মুখে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত হলে মুসলমানদের ইমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়।

রাষ্ট্রীয় ভিত্তি সুদৃঢ় : মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে শক্ত হাতে ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের দমন করা হলে এ রাষ্ট্রের শক্তি ও ভিত্ত আরো সুদৃঢ় হয়, যা বিরোধীদের কাছে অপরাজেয় মনে হয়েছিল।

জয়ের দিগন্ত উন্নোচন : অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশ্বজ্ঞান দমনের পর আববের বাইরে ইসলামের শক্তি সম্প্রসারণ করার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হ্যরত আবু বকর (রা) ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং এরই সাথে ইসলামের জয়ের দিগন্ত উন্নোচিত হয়।

পরোক্ষ ফজাফল

রিদ্বার যুদ্ধে মুসলমানরা নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করে সামরিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী হয়। রিদ্বা যুদ্ধের সময় রোমান ও পারসিকরা সীমান্ত প্রদেশে ধর্মত্যাগীদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তাই পরবর্তীকালে খলিফাগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে এর প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হন। ফলে অঙ্গদিনের মধ্যেই পারস্য ও রোমান সামাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে।

ভঙ্গবিদের দমন : এসব কারণে আববের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম ত্যাগ করে পুরোনো ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য আন্দোলন করে। প্রথম খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা) এ আন্দোলনকারীদের কঠোর হাতে দমন করেন।

আসওয়াদ আনসী ও তুলাইহাকে দমন : ভঙ্গবিদের আবির্ভাবে হ্যরত আবু বকর (রা) বিচলিত না হয়ে ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণ করে বিদ্রোহৰত সকল অঞ্চলে ১১টি মুসলিম সেনাদল প্রেরণ করেন। খলিফা প্রথমে ভঙ্গবি আসওয়াদ আনসীর সমর্থক বিদ্রোহী ‘আবস’ ও ‘জুবিয়ান’ গোত্রদ্বয়কে যুলকাশা ও রাবারজার যুদ্ধে পরাজিত করেন। আসওয়াদ আনসী শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। এভাবে আসওয়াদ আনসী ও তার সমর্থক গোষ্ঠী নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

এরপর হ্যরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করা হয় তুলাইহা ও তার সমর্থক বিদ্রোহী তামিম ও ইয়ারবু গোত্রদ্বয়কে দমন করার জন্য। হ্যরত খালিদ (রা) অত্যন্ত সফলতার সাথে এ গোত্রদ্বয়কে পরাজিত করে তুলাইহাকে দমন করেন। খলিফার নির্দেশে তোলায়হা বহু অনুচররসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

মুসাইলামা ও সাজাহকে দমন : ভঙ্গবিদের মধ্যে মুসাইলামা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। সে মহিলা ভঙ্গবি সাজাহকে বিয়ে করে বানু হানীফা গোত্রের চল্লিশ হাজার লোকের একটি বিদ্রোহী দল গঠন করে ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। হ্যরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। মুসাইলামাসহ হানীফা গোত্রের প্রায় দশ হাজার ধর্মত্যাগী যুদ্ধে নিহত হয়। ঐতিহাসিক ‘তাবারী’ একে ‘মৃত্যুর বাগান’ বলে উল্লেখ করেন। জোসেফ হেল বলেন, “কঠিনতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহের মধ্যে ইয়ামামার যুদ্ধ অন্যতম।” মুসলমানদের পক্ষে বহু সাহবী এবং সন্তর জন হাফিজ-ই-কুরআন শাহাদাতরবণ করেন। এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর ইসলামের অতিতৃ নির্ভর করছিল। এ যুদ্ধের পর সাজাহ বনু হানীফা গোত্রের লোকজনসহ ইসলাম গ্রহণ করে।

কুরআন সংকলন

মহানবি (স) এর আমলে পরিত্র কুরআন লিখিত বৃপ্ত পায়নি। তখন তা সাধারণত হাফিজগণই মুখস্থ রাখতেন। কিন্তু হাফিজদের মৃত্যুর পর তা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে হ্যরত উমরের পরামর্শে ওহি লেখক সাহবি হ্যরত যায়দ বিন সাবিতের নেতৃত্বে পরিত্র কুরআনকে একত্রে পুষ্টক আকারে সংকলিত করা হয়। কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন হ্যরত আবু বকর (রা.) এর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমর কীর্তি।

ইসলামের প্রতি হ্যরত আবু বকর (রা.) এর অবদানের স্বীকৃতি দেখা যায় প্রথ্যাত সাহাবি ইবনে মাসউদের বক্তব্যে : “মহানবির (স.) ইন্তিকালের পর আমরা এমনি অবস্থায় প্রতিত হয়েছিলাম যে, যদি আল্লাহ তাআলা আবু বকর (রা.) এর মাধ্যমে আমাদের অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।”

“শুধু আবু বকরের জন্যই ইসলাম বেদুইনদের সাথে আপস করতে না গিয়ে অঙ্কুরেই নিশ্চিহ্ন বা বিনষ্ট হয়ে যায়নি।

ব্রহ্মত ইসলামের সকল বিপর্যয়ের ধার্কা প্রথমেই হ্যরত আবু বকর (রা.) কে সামলাতে হয়। তাঁর চরিত্রে রয়েছে অনেক মহৎ গুণের সমারোহ। তিনি একাধারে বিদ্বান, সিদ্ধীক উপাধিপ্রাপ্ত, দৃঢ়চেতা সাহসী শাসক। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তাঁর মূল্যায়ন করেছেন এভাবে : “Like his master, Abu Bakar was extremely simple in his habits gentle but firm, he devoted all his energies to the administration of new born state and to the good of people.” অর্থাৎ ইসলামের প্রতি তাঁর এ সকল অবদানের কথা বিবেচনা করেই হ্যরত আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের ত্রাণ কর্তা বলা হয়।

রিদ্বা যুদ্ধের সমালোচনা

হ্যরত আবু বকর (রা.) খিলাফত কালে ভড়নবি ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধকে অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ রিদ্বা বা স্বর্ধমত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। একমাত্র Cambridge Medieval History গ্রন্থের প্রণেতা উইলিয়াম বেকার এ ব্যাপারে ভিন্নতম পোষণ করেন। তাঁর মতে যারা বিদ্রোহী হয়েছিল তারা প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেনি। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর বিরাট ব্যক্তিত্বের ভয়ে তারা শুধু যুদ্ধে ইসলামের কথা উচ্চারণ করেছিল। তারা ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য আকৃষ্ট হয়নি। কাজেই তাদের রিবুন্দে পরিচালিত যুদ্ধকে কোন ক্রমেই রিদ্বা যুদ্ধ বলা উচিত নয়। বেকারের এই মতবাদকে সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না কারণ :

- ১। স্বর্ধমত্যাগীদের আন্দোলন যে সমগ্র আরব উপদ্বিপক্ষে প্রভাবিত করেছিল তার কোন প্রমাণ উইলিয়াম বেকার দিতে সমর্থ হননি।
- ২। যারা হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন্তশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা বিদ্রোহীদের কোন লোভ লালসায় প্রভাবান্বিত হয়ে ইমানের পথ থেকে বিচ্ছুত হননি।
- ৩। মুনাফিকদের জোর জবরদস্তির ফলে সাময়িকভাবে মদিনার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তারা কেন্দ্রীয় শাসনকে অস্বীকার করতে সাহসী ছিল না।
- ৪। তার আনুগত্য বর্জন করেছিলেন এমন কোনো নজির পাওয়া যায়নি।
- ৫। এ বিদ্রোহের সময় মক্কা নগরীসহ কতিপয় অঞ্চলে শান্তি বিবাজমান ছিল। ফলে এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীগণ সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলাম গ্রহণ ও মহানবির আনুগত্যে অবিচল ও অটুট ছিল।

তত্ত্ব নবি

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়ত লাভের সাফল্য, বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও সমান এবং প্রতিপন্থি লাভ প্রত্যক্ষ করে আরবের অনেক লোকের মনে নবুয়ত লাভের প্রেরণা তৈরুভাবে জেগে উঠে। জাগতিক-সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় তারা শুধু মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, তারা কখনো ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়নি।

মহানবি (স) এর জীবনের শেষ দিকে আরবের বিভিন্ন অংশে কতিপয় ভদ্র নবির আবির্ত্ব ঘটে। মহানবি (স) এর ওফাতের পর তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং ইসলামের ধর্ষণ সাধনে লিপ্ত হয়। যে সমস্ত ধর্মত্যাগী মুসলমান নিজেদেরকে নবি বলে দাবি করেন তাদের মধ্যে ইয়ামের আনসী গোত্রের নেতা আসাদ আনসি, ইয়ামামার বনু হানিফা গোত্রের মুসায়লামা, বনু আসাদ গোত্রের তোলায়হা, বানু ইয়ারবু গোত্রের মহিলা সাজাহ ভদ্র নবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে ভদ্রনবিদের পরিচয় দেয়া হল :

আসাদ আনসি : ভদ্র নবিদের মধ্যে ইয়ামের আনসি গোত্রের নেতা আসাদ আনসি সর্বপ্রথম নবৃত্ত দাবী করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাসুল (স.) এর জীবিতাবস্থায় হিজরি দশম সালে সে নবৃত্তের দাবিদার হয়। সে ইয়ামেন মুসলিম শাসন কর্তাকে বিতাড়িত ও হত্যা করে রাজধানী সানআও নাজরানে কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করে। অতপর সে পার্শ্ববর্তী গোত্র প্রধানদের সহায়তায় একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে এবং সমগ্র দক্ষিণ আরব তার দখলিভূত করে নেয়। মহানবি (স.) এ বিদ্রোহ দমনের জন্য হয়রত সাদ বিন জাবালকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ভদ্র নবি আসাদ মহানবি (স.) এর মৃত্যুর দু-এক দিন পূর্বে ইয়ামের নিহত শাসন কর্তার এক আত্মীয় ফিরোজ দায়লামী কর্তৃক নিহত হয়। মহানবি (স.) এর মৃত্যুর পর ইয়ামেন পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রথম খলিফা হয়রত আবু বকর (রা) মুহাজির নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের ধর্ষণ করে দেন।

মুসায়লামা : মধ্য আরবের ইয়ামামার বনু হানিফা গোত্রের মুসায়লামা নিজেকে নবি বলে দাবি করে। স্বরচিত বাণীকে ঐশীবাণী বলে প্রচার করে নিজেকে নবি বলে প্রকাশ করে। সে মহানবি (স.) কে জানায় যে, ধর্ম প্রচারে ও আরব উপনীপ শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সে তাঁর সমতুল্য। মহানবি (স.) তাকে ভদ্রামী, ধর্মদ্রোহীতা ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্যে নির্দেশ দেন। কেননা, সে প্রতিনিধি আগমনের বর্ষে মহানবি হয়রত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভদ্র মুসায়লামা মহানবি (স.) এর নির্দেশে কর্ণপাত করেনি। বরং পবিত্র কুরআনের বাণী নকল করে নিজস্ব পন্থতিতে নামাজ ব্যবস্থা চালু করে।

তোলায়হা : উত্তর আরবের বানু সাদ গোত্রের তোলায়হা নামক এক ব্যক্তিও নিজেকে নবি বলে দাবী করে। মদিনার বেদুইনদের সাথে বড়যন্ত্র করে সে যাকাত বিরোধী এক আদোলন গড়ে তোলে। মহাবীর হয়রত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) বুজাখার যুদ্ধে পরাজিত করেন। ফলে সে পালিয়ে গিয়ে সিরিয়ায় আত্মগোপন করে। খলিফা হয়রত আবু বকর (রা) বানু সাদ গোত্রকে ক্ষমা করে দেন। এ সুযোগে তোলায়হা ফিরে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

সাজাহ : প্রথম খলিফা হয়রত আবু বকর (রা) হয়রত ইকবামা ও সুরাহবিল কে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। তারা এ যুদ্ধে মুসায়লামার বিরাট বাহিনী কাছে পরাজিত হন। অতঃপর হয়রত আবু বকর (রা) খালিদ বিন ওয়ালিদকে এ বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। এ সময় মধ্য আরবের বনু ইয়ারবু গোত্রের প্রিষ্ঠান রমনী সাজাহ মুসায়লামার সাথে যোগদান করেন তাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। মহাবীর খালিদের সাথে ৬৩৩ প্রিষ্ঠানে ইয়ামামার যুদ্ধে সে অসংখ্য অনুচরসহ নিহত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বহু কুরআনে হাফিজ সাহাবি শাহাদাত বরণ করে।

মদিনা রক্ষার ব্যবস্থা

বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনীকে বিভক্তকরণ : সমগ্র আরবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে নব প্রতিষ্ঠিত শিশু ইসলামি সাম্রাজ্য চরম বিশ্বজ্ঞান দেখা দেয়। বিভিন্ন স্থানে তারা বিদ্রোহ করে যাকাত আদায় বন্ধ, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের হত্যা প্রভৃতি নাশকতামূলক কার্যক্রম চালায়। কৃতিম ধর্ম প্রচারকদের প্ররোচনায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়। অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাতে থাকেন। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ এবং ভঙ্গবিদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্র বিপন্ন হয়ে উঠে। তাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে ও ভঙ্গবিদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে হ্যরত আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি বিভাগে এক একজন সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এরপর এক একটি দল আরবের বিভিন্ন অংশে পাঠান।

১. মহাবীর হ্যরত খালিদ বিন উয়ালিদকে প্রথমে তোলায়হা ও পরে মালিক বিন নুবায়াবার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।
২. হ্যরত ইকরামা বিন আবু জাহেল (রা.)-কে মুসায়লামাতুল কায়্যাব এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। হ্যরত সুরাহবিল (রা.) হ্যরত ইকরামা (রা.) এর সাহায্যার্থে পরে যোগ দিয়েছিলেন।
৩. মোহাজির বিন আবি উমাইয়া (রা.)-কে আসাদ আনসি ও কায়েস ইবনে আসের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ইয়ামেন ও হাজরামাউত এ প্রেরণ করেন।
৪. খলিফা আবু বকর (রা.) আমর ইবনুল আসকে আরব ও সিরিয়া সীমান্তে ওয়াদীয়হ এবং হাবিসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।
৫. খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.) খালিদ ইবনে সাঈদকে স্থানীয় গোত্রসমূহ দমনে সিরিয়া পাঠান।
৬. খলিফা আবু বকর (রা.) আলা ইবনে হাজরামীকে আল হাতাম ইবনে দাবিয়ার বিরুদ্ধে বাহরাইন প্রেরণ করেন।
৭. সুয়ায়দ ইবনে মাকরানকে খলিফা আবু বকর (রা.) ইয়ামেনের নিম্নাঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করেন।
৮. হ্যরত আরফাজাহ ইবনে হাযচামাকে লাকিত ইবনে মারিক আল-আয়দির বিরুদ্ধে মাহরায় প্রেরণ করা হয়।
৯. খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.) হুয়ায়ফা ইবনে মুহসিনকে বনু সালাম ও হাওয়াজিন গোত্রদ্বয়ের দমন করার জন্যে প্রেরণ করেন।
১০. হ্যরত তুরাইফাকে খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.) আরবের নিম্নাঞ্চল অভিযানে প্রেরণ করেন।
১১. খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.) সুরাহবিল ইবনে হাসনাহকে ইয়ামামায় ইকরামার সাথে প্রেরণ করেন।
১২. মদিনাকে রক্ষা করার নিমিত্তে একটি বাহিনীকে খলিফা তার সঙ্গে রাখেন। মদিনা হতে প্রধান সেনাপতিরপে তিনি বিদ্রোহ দমন অভিযান দক্ষতা ও দৃঢ়তার সাথে পরিচালনা করেন।

খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা) এর বিজয় অভিযানসমূহ

পারস্য অভিযান :

রিদা যুদ্ধের সময় পারস্যবাসীরা বাহরাইনের বিদ্রোহীদের উস্কানী ও সাহায্য অব্যাহত রেখেছিলেন। হ্যরত আবু বকর (রা) ইসলামি সম্রাজ্যের মধ্যে সকল বিদ্রোহ দমন করে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেন। পারস্য অভিযান ছিল এ ধরনের ঘটনারই ফসল। খলিফা ইসলামি সীমানা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধান কল্পে পারস্য সীমান্ত বিদ্রোহ রোধ করার চিন্তা করেন। এজন্য ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি হ্যরত মুসান্নার নেতৃত্বে ৮,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু খলিফা আবু বকর (রা) এতে নিশ্চিত হতে না পেরে বিখ্যাত সেনাপতি মহাবীর হ্যরত খালিদের নেতৃত্বে আরও ১০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী হ্যরত মুসান্নার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। হ্যরত খালিদ বাহিনী ইউফ্রেটিস নদীর উপকূলে অবস্থিত মুসান্না বাহিনীর সাথে মিলিত হন। সম্মিলিত বাহিনী ইসলামের নীতি মোতাবেক প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তারা ইসলাম গ্রহণে অঙ্গীকৃতি জানায় এবং জিয়িয়া দিতেও অঙ্গীকার করে। সম্মিলিত ইসলামি বাহিনী মুসান্না ও খালিদের নেতৃত্বে উবাল্লার হাকির নামক স্থানে পৌছলে পারস্য বাহিনী প্রধান হরমুজ তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে। এজন্য এ যুদ্ধকে শৃঙ্খলার যুদ্ধ (Battle of Chains) বলা হয়। অতপর হরমুজে মহাবীর খালিদের সঙ্গে সংঘটিত এক বৈত্যুদ্ধে নিহত হলে হরমুজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়।

মুসলিম বাহিনী এবার জনেকা পারসিক রাজকুমারীর দ্বারা রক্ষিত একটি দুর্গ জয় করেন। পারসিক সেনাপতি বাহমান হ্যরত মুসান্না ও হ্যরত খালিদের নিকট পরাজয় বরণ করে। এ যুদ্ধটি ওয়ালাজারা যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। অপর একটি যুদ্ধে পারস্য বাহিনী মহাবীর খালিদ এর নিকট পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি হিরা দখল করেন। হিরার অধিবাসীগণ খলিফার বশ্যতা স্বীকার করে জিজিয়া প্রদানের সম্মত হয়। অঙ্গীকারে একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। হিরা অধিকারের পর খালিদ উভর দিকে অগ্রসর হয়ে আনবার, আইনুত তামুর ও দুমায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করেন।

সিরিয়া অভিযান :

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবিত থাকাবস্থায় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার প্রেরিত দৃতকে সম্মান করতেন। কিন্তু পরে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষাণ্বিত ও শংকিত হয়ে বিরুদ্ধাচারণ করেন। মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর ওফাতের পর রোম সম্রাট সিরিয়ার আরব গোত্রগুলোকে বিদ্রোহের প্ররোচনা ও সাহায্য দান করে এবং তারা ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চালায়। খ্রিস্টান শাসনকর্তা সুরাহবিল মৃত্যু মুসলিম দৃতকে হত্যা করে এতে মুসলিম রাষ্ট্রের অভিত্তি রক্ষা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। ফলে খলিফা আবু বকর (রা) রোমানদের ব্যাপারে আশংকা মোখ করেন। হ্যরত আবু বকর (রা) সাহাবিদের ডেকে একত্রিত করেন। পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত মোতাবেক, হ্যরত আবু বকর সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন।

হ্যরত আবু বকর (রা) ইসলামি বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। হ্যরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে প্রথম অংশের নেতৃত্ব দিয়ে ফিলিস্তিনে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হ্যরত আবু ওবায়দা (রা)-কে দ্বিতীয় অংশের নেতৃত্ব দিয়ে হেমসের দিকে প্রেরণ করেন। ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রা) কে তৃতীয় অংশের নেতৃত্বে দিয়ে দামেস্কে প্রেরণ করেন এবং সুরাহবিল ইবনে হাসানাহ (রা) কে চতুর্থ অংশের নেতৃত্বে নির্দেশ দিয়ে জর্দানের দিকে যাওয়ার আদেশ দেন।

হযরত আবু ওবায়দা (রা) জাবিয়ায়, হযরত সুরাহবিল ইবনে হাসানা (রা) বসরায় এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা) আরবায় সৈন্য বাহিনী নিয়ে উপনীত হন। হযরত আবু ওবায়দা (রা) ছিলেন এ অভিযানের সর্বাধিনায়ক। খলিফা পরে হিরা থেকে মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদকেও মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদানের নির্দেশ দেন। সম্রাট হিরাক্সিয়াসের ভাতা থিওডোরাসের নেতৃত্বে ২,৪০০০০ সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা হয়। এ বিশাল সৈন্য বাহিনীর মোকাবিলায় মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০,০০০০ হাজার। আজনাদাইনের প্রাতঃরে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে মুসলিম বাহিনীর নিকট থিওডোরাস পরাজিত হয়। সম্রাট হিরাক্সিয়াস এন্টিয়াকে পলায়ন করেন। ফলে সমগ্র প্যালেস্টাইন মুসলিম আধিপত্যে চলে আসে। অতপর মুসলিম বাহিনী দামেক অবরোধ করে দক্ষিণ সিরিয়া দখল করেন।

হযরত আবু বকর (রা) এর ইতিকাল

৭ই জ্যান্দিউস সানি, ১৩ হিজরি হযরত আবু বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হন। মৃত্যুপথের যাত্রী হযরত আবু বকর (রা) জীবনের অভিযন্ত সময় উপস্থিত হয়েছেন মনে করে সাহাবায়ে কিরামগণের পরামর্শ নিলেন। অধিকাংশ সাহাবিগণ হযরত উমর (রা)-কে খলিফা নির্বাচনের পক্ষে রায় প্রদান করেন। খলিফা হযরত আবু বকর (রা) হযরত উসমান (রা)-কে ডেকে হযরত উমরের খিলাফত সম্পর্কে একটি চুক্তিপত্র লেখালেন। ইসলামে খিলাফত সম্পর্কে এটাই প্রথম চুক্তিপত্র ছিল। জনসাধারণকে এ চুক্তিপত্র পড়ে শুনানো হয়। সবাই তা মেনে নিলেন। খলিফা হযরত উমর (রা) কে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অভিযন্ত অনুরোধ জানালেন।

আজনাদাইনের যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ পাওয়ার পর হিজরি ১৩ সালের ২১ জ্যান্দিউস সানি সোমবার সন্ধিয়ায় ৬৩ বছর বয়সে ইসলামের ত্রাণকর্তা হযরত আবু বকর (রা) ইতিকাল করেন। হযরত উমর (রা) জানায় ইমামতি করেন। হযরত আয়েশার হুজুরা মোবারকে রাসুলুল্লাহ (স) এর পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর খিলাফত কাল ছিল দুই বছর তিন মাস নয় দিন মাত্র।

ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসাবে হযরত আবু বকর (রা)

হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি এক সংকটময় মৃহূর্তে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল মাত্র দুই বছর তিন মাস নয় দিন। কিন্তু এ স্বল্প সময়ে তিনি ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় এক অভাবনীয় পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। তাঁর শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে অনেক্য, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, ভক্তনবিদের আবির্ভাব, যাকাত প্রদানে অঙ্গীকার, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ সহ কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা)-ই তখন একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি কঠোর হস্তে সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করেন এবং ইসলামি শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ভিত্তি স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, “এরূপ সংকটের দিমে হযরত আবু বকরের মতো খলিফা না থাকলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র কোনোটাই রক্ষা পেত না। ইসলাম ধর্ম ও সমাজ অনিবার্য ধর্মসের কবলে পতিত হত।” তিনি খিলাফত লাভের পূর্বে এবং পরে ইসলামের খিদমতের জন্য যে অসামান্য অবদান রেখেছেন সে প্রেক্ষিতে তাঁকে ন্যায় সজ্ঞাতভাবে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

সিদ্ধিক উপাধি ও ইসলামের সেবক

খলিফা হযরত আবু বকর (রা) মহানবি (স) এর জীবন সহচর ছিলেন। নেতৃস্থানীয় ও বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিঃসংকোচে মিরাজ শরীফে বিশ্বাস স্থাপন করেন বলে মহানবি (স) তাঁকে “সিদ্ধিক”

উপাধিতে ভূষিত করেন। ইসলামের সেবায় তিনি সর্বস্ব বিলিয়ে দেন। তিনি অনেক ক্রীতদাসদাসীকে নিজ অর্থে ক্রয় করে মুক্তিদান করেন। মদিনায় মসজিদ নির্মাণ ও তাৰুক যুদ্ধে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। হ্যরত উমর (রা) বলেন, “আবু বকর (রা)-কে ইসলামের খিদমতের ব্যাপারে কেহই অতিক্রম করতে পারবে না।”

মহানবির বিশৃঙ্খলা : হ্যরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবির বিশৃঙ্খলা। মহানবি (স.) এর কঠিনতম মুহূর্তে তিনি তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। হিজরতের মহাসংকট কালেও মহানবি (স.) তাকে বিশৃঙ্খলাগুপে গ্রহণ করেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক, খায়বার, তাৰুক প্রভৃতি যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন- “যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরাগুপে গ্রহণ করতাম তা হলে আবু বকরকে বন্ধুরাগুপে গ্রহণ করতাম।” হ্যরত (স.) তার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইসলামের ধারক ও বাহক এ মহাপুরুষ জাকাত প্রদানে অঙ্গীকৃতি দানকারী বেদুইন গোত্রগুলোকে ইসলামি বিধান অনুযায়ী কর প্রদানে বাধ্য করেন। খলিফা হওয়ার পর তিনি আরব উপস্থিপ হতে সকল ভূভাগী এবং অনেসলামিক কার্যক্রমের অবসান ঘটান। ইসলামের এ ঘোরতর দুঃসময়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠোর হচ্ছে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করেন। মাওলানা মুহম্মদ আলী যথার্থেই বলেছেন, “প্রতিকূল ঝড় সংকূল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের তরীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই প্রাপ্ত।”

ভূমনবিদের দমন : ইসলামের ইতিহাসের মহা সংকটময় মুহূর্তে ও সমস্যা সংকূল সময়ে হ্যরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ভূমনবিদের আবির্ভাব, যাকাত বিরোধী আন্দোলন ও স্বর্ধমত্যাগীদের বিদ্রোহ ইসলামী শিশু রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে প্রচড় আঘাত হানে। ফলে ইসলাম পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। হ্যরত আবু বকর (রা), খিলাফত লাভের পর থেকেই অধিকাংশ সময় স্বর্ধমত্যাগী বা রিদ্বার যুদ্ধে মনোনিবেশ করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হিতি বলেন, “হ্যরত আবু বকর (রা) এর স্বরূপকালীন খিলাফতের অধিকাংশ সময়ই তথাকথিত রিদ্বা যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিল। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ইয়ামামা ও অন্যান্য যুদ্ধে মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং কতিপয় ইতিহাস বিখ্যাত সমর নায়কগণ অভিযান চালান। ফলে ভূমনবিগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং ইসলাম নিশ্চিত ধ্বন্সের হাত হতে রক্ষা পায়। ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয় এবং ইসলামি রাষ্ট্র স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

বেদুইনদের দমন : হ্যরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফত কালে বেদুইনগণ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করলে তিনি কঠোরহচ্ছে বেদুইনদের ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ দমন করে ইসলামকে বিপদমুক্ত করেন। তার নিকট থেকে তখন কিঞ্চিত পরিমাণ শৈথিল্য প্রদর্শিত হলে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যেত।

বহির্বিশ্বে ইসলামের প্রসার : খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.) এর ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় ইসলাম ও ইসলামের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়। এখন শুধু আরবের ভিতরই ইসলাম নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হয়নি। বহির্বিশ্বেও ইসলাম বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মৌকাবেলা করে দ্রুতগতিতে সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়। হিতি বলেন, বিশুজয়ে বের হওয়ার পূর্বে আরববাসীদেরকে নিজেদের দেশকে জয় করতে হয়েছিল।

খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

বিশ্বমুক্তি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপরের পর হযরত আবু বকর (রা) ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন বিভিন্ন গুণে গুণাদিত এক মহাপুরুষ। মহানবি (স.)-এর উপরের মধ্যে তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে মদিনার শিশু রাষ্ট্রে সংকটাপন অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। ইসলামের প্রতি তাঁর অবদান, অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়। নিম্নে তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হল :

বিশ্বনবি (স.) এর পরেই তাঁর স্থান : তিনি ছিলেন মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলির বাস্তব প্রতিচ্ছবি। মহানবি(স.) এর সকল গুণে তিনি গুণাদিত ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের মহানবি (স.) এর পরেই তাঁর স্থান। উমাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন তিনি। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) দৃঢ় ও কঠোর নেতৃত্বের ফলে মদিনার ইসলামি শিশু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা পায়। তাই তাকে ইসলামের “আগকর্তা” বলা হয়।

ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক : সর্ব প্রথম যে চারজন নারী ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত আবু বকর (রা), তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্যে চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কুরাইশদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি চল্লিশ হাজার দিবাম মহানবি (স.) এর খেদমতে ও ইসলাম প্রচারে ব্যয় করেন। তিনি নগদ অর্থে মুশরিকদের নিকট থেকে মুসলিম কৃতদাস-দাসীদের ক্রয় করে স্বাধীন করে দেন। তাবুক যুদ্ধে সর্বোচ্চ এনে মহানবি (স.) এর হাতে তুলে দেন। হযরত উমর (রা) বলেন- “হযরত আবু বকরকে ইসলামের খেদমতের ব্যাপারে কেউ অভিক্রম করতে পারবে না।”

সিদ্ধিক উপাধি : ইসলামের আগকর্তা হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। মহানবি (স.) এর প্রতি তাঁর শুদ্ধী ও ভালোবাসা ছিল অক্ষতিমূলক ও অস্তীনী। রাসূল (স.) তাঁকে সিদ্ধিক বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেন। ইসলাম ও মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্য পৌত্রিকদের হস্তে তিনি প্রতৃত হন। হিজরতের সময়ে তিনি রাসূল (স.) এর সঙ্গী হিসেবে মদিনায় হিজরত করেন।

অগাধ পাণ্ডিতের অধিকারী : খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবি (স.) এর অস্তরঙ্গ বল্দু সুখ-দুঃখের সাথী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান। যে কোন সমস্যা অনুধাবনে ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ছিলেন অতুলনীয় বৃত্ততা-ভাষণে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বৎশ ধারাবাহিকতা জ্ঞানে তিনি ছিলেন আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বপ্ন ব্যাখ্যায় আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইসলামি জ্ঞানে তাঁর মর্যাদা ছিল সকলের উর্বৈ।

তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক : হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ এবং এবাদত ও তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক। তিনি কখনো কখনো নামাযে সারাবাত কাটিয়ে দিতেন। অধিকাংশ সময় রোয়া রাখতেন। একাগ্রচিন্তে নামায আদায় করতেন। তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখলে প্রাণহীন কাষ্ঠ দড়ের মতো মনে হত। কুরআন শরিফ তিলাওয়াতের সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে অঞ্চ গড়িয়ে পড়ত। তিনি অস্ফুট স্বরে এমনভাবে ফুপিয়ে কাঁদতেন যে, আশেপাশে মানুষ জড়ে হয়ে যেত। এ কারণে তাঁকে “আওয়াহুম মুনীব” নামে আখ্যায়িত করা হতো।

ইসলামের ধারক এবং বাহক : ইসলামের ধারক এবং বাহক হিসেবে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ধর্মীয় অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। কোন প্রকার ভীতি, বিদ্যেভাব ও বিরলদ্বারণ তাঁকে কর্তব্যচূত করতে পারেনি। তিনি ইসলামের পূর্ণ অনুসারী বিধায় মহানবি (স.) এর অস্তিমকালে তাঁকে ইমামতি করার আদেশ দেন। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি আরব ভূখণ্ড থেকে বিদ্রোহ ও ভদ্রবিদের কঠোর হস্তে দমন করেন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর স্বহস্তে মদিনা রক্ষার দায়িত্বাতের গ্রহণ করেন। যাকাত প্রদানে অর্ধিকারকারী বেদুইন গোত্রদের বিরলদ্বে তিনি অভিযান প্রেরণ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। তারা ইসলামি বিধান অনুযায়ী কর দিতে বাধ্য হয় ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে তিনি আরব ভূ-খণ্ড থেকে দুর্বীতি, প্রতারণা, ভঙ্গামী এবং অনেসলামিক কার্যকলাপ ধ্বংস করে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। মৌলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, “প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের তরীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।”

সফল রাষ্ট্র নায়ক : প্রথম খলিফা হয়েরত আবু বকর (রা) খলিফত লাভ করার পরই আরব উপনিষদের মধ্যে বিশ্বজ্ঞলা, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, অর্তবিপ্লব, হিংসা, বিদ্রে প্রভৃতি মহামারী আকার ধারণ করেছিল। তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলে অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধান করেন। নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে বহিশত্র থেকে রক্ষা করেন এবং এক্য ও ধর্মগ্রন্থিত বজায় রাখতে সক্ষম হন।

এখানেই হয়েরত আবু বকর (রা) রাষ্ট্র সংগঠক হিসেবে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কেন্দ্রীয় শাসন গোত্র শাসনের উর্ধ্বে স্থান দান করেন ফলে সমগ্র আরব গোত্র কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন হয়ে যায়। খলিফা হয়েরত আবু বকর (রা) বিশ্ব জয়ের পূর্বে আরব দেশ ও আবরণবাসীদের প্রথম জয় করেছিলেন। কারণ, সুসংগঠিত রাষ্ট্র ব্যতীত পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করা সম্ভব নয়। হয়েরত উমর (রা) এর খলিফত কালে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ও ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ হয়েরত আবু বকর (রা) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং বলিষ্ঠ সামরিক ব্যবস্থার জন্যই সম্ভব পর হয়।

গণতন্ত্রের অনুসারী : রাষ্ট্রীয় কার্য-নির্বাহে খলিফা হয়েরত আবু বকর (রা) গণতন্ত্রের অনুসারী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্র নায়ক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করতেন না। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি যে যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করেন তা তাঁর গণতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ আস্থারই বহিপ্রকাশ। তিনি মসলিম আস-শুরা বা মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মোতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তিনি জনগণকে পূর্ণ স্বাধীনতার ও সমাধিকার দান করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের গোড়াপত্তন করেন।

মহানবি (স.)-এর উপযুক্ত প্রতিনিধি : মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর তিরোধানের পর ইসলামি রাষ্ট্র যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল হয়েরত আবু বকর (রা) ছিলেন তাঁর সম্পূরক। তিনি বিভ্রান্ত ও পথব্রহ্ম মুসলিম জাহানকে সঠিক পথ প্রদর্শনে সমর্থ হন। আরব বিশ্বের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ, অরাজকতার অবসান ঘটাতে সক্ষম হন। মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.) এর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে যাবতীয় কাজ সৃষ্টিভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হন। হয়েরত আলী (রা) বলেন, “রাসুলে কারীমের পর আবু বকর শ্রেষ্ঠ মুসলমান ছিলেন।”

আল কুরআন সংকলন : আল কুরআন বর্তমানে যেভাবে বিন্যস্ত রয়েছে এভাবে মহানবি (স.) এর যুগে বিন্যস্ত ছিল না। তখন হাফিজদের বক্ষে বিন্যস্তভাবে রক্ষিত ছিল। লিখিত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ ছিল। ইয়ামামার যুদ্ধে যখন বহু সংখ্যক হাফিজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন তখন হয়েরত উমর (রা) এর পরামর্শে বিভিন্ন পত্রকে মহানবি (স.) এর বিন্যসে অনুযায়ী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হয়েরত জায়েদ বিন সাবিত (রা) যিনি মহানবি (স.) এর সময় কাতিবি ওই ছিলেন-এ কাজের দায়িত্ব নিলেন, তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এ বিক্ষিত পত্রগুলোকে একত্র করে কুরআন মাজিদকে সঠিকভাবে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এজন্য প্রথম খলিফা হয়েরত আবু বকর (রা) কুরআন সংকলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.) ও ইসলামের প্রতি হয়েরত আবু বকর (রা) এর অক্লান্ত সেবা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অন্যান্য অবদানের কথা বিবেচনা করে তাঁকে ন্যায়সংজ্ঞাতভাবে ‘ইসলামের আগকর্তা’ বলা হয়।

দীন-দুঃখীর বস্তু ৪ হ্যরত আবু বকর (রা.) দীন-দুঃখীর দুর্দশা দূর করার জন্য সর্বপ্রথম ‘বায়তুলমাল’ প্রতিষ্ঠা করনে। তিনি রাত্রির অস্থকারে গোপনে খাদ্যসামগ্রী বহন করে নিয়ে গিয়ে গৱাব ও অনাথদের দুরবস্থা ও অভাব মোচন করতেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “তিনি তাঁর শিক্ষাদাতা মহাপুরুষের ন্যায় আচার ব্যবহারে অত্যন্ত আড়ম্বরহীন ছিলেন। তিনি বিনোদ অথচ দৃঢ় ছিলেন এবং নতুন রাষ্ট্রের শাসনকার্যে এবং জ্ঞান সাধনের উপকারার্থে তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।

প্রথম খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.) এর শাসন ব্যবস্থা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ৪ বর্তমান যুগে সর্বাধিক উন্নত ও মার্জিত রাষ্ট্রীয় নীতি হল গণতন্ত্র। তবে আসল ব্যাপার এই যে, পরিত্র কুরআন, হাদিস ও খুলাফায়ে রাশেদিনের কার্যক্রম দ্বারা যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সম্মান পাওয়া যায়, প্রকৃত বিচারে সেটা বর্তমান গণতন্ত্র নয়, সৈরতন্ত্র নয়, ধর্মতন্ত্র নয়, আবার ব্যক্তিতন্ত্রও নয়; বরং তা সকল ধরনের রাষ্ট্রচিক্ষার একটি সমন্বিত রূপ। হ্যরত আবু বকরের (রা.) সামনে যখন কোন বিষয় উপস্থিত হত; তখন তিনি সর্বপ্রথম তার সমাধান পরিত্র কুরআনে অনুসন্ধান করতেন। পরিত্র কুরআনে না পেলে হাদিসে খোঝ করতেন। যদি হাদিসেও না পাওয়া যেত তা হলে তিনি বিশেষ সত্তা আহ্বান করতেন।

মজলিসে শূরা ৪ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন হ্যরত আবু বকর (রা.) তাঁদের পরামর্শ সত্ত্বে পরামর্শদাতা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হতো তখন তিনি মজলিশে শূরায় তাদের পরামর্শ নিতেন।

রাষ্ট্রীয় নীতি ৪ দু'বছর তিনি মাসের শাসনামলে খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.) ইসলামি রাষ্ট্রকে দৃঢ় করতে যথাযথ রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মোটেই অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেন এবং পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

রাষ্ট্রীয় পদে নির্বাচন ৪ যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক পদে নিয়োগ করার উপর রাষ্ট্রের উত্তম ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। আর সেই ব্যক্তিই যোগ্য, যিনি লোকদের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। সেই দূরদৃশী আবু বকর (রা.) এসব গুণাবলির অধিকারী ছিলেন।

নির্বাচনের ব্যাপারে হ্যরত আবু বকর (রা.) এর মূলনীতি

হ্যরত আবু বকর (রা.) এর মূল নীতিগুলো নিম্নরূপ

ব্যক্তি নির্বাচন ৪ হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর যুগে যে ব্যক্তি যে পদে নিয়োজিত ছিলেন, হ্যরত আবু বকর (রা.) তাকে সেই পদেই বহাল রাখেন। কোন কাজের জন্য হ্যরত আবু বকর (রা.) এই ব্যক্তিকে সর্বাঙ্গে নির্বাচন করতেন যিনি রাসূলল্লাহ (স.) এর পরিত্র সাহচর্য থেকে অধিক জ্ঞান আহরণের সুযোগ পেয়েছেন।

স্বজনশৌখীতি থেকে দূরে থাকা ৪ সঠিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্বজনশৌখীতির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দূরে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। হ্যরত আবু বকর (রা.) এ নীতি কঠোরভাবে পালন করতেন। তিনি তাঁর প্রশাসকদেরকেও এই ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিতেন।

প্রশাসকদের মনঃভূষ্টি ও মর্যাদার দিকে লক্ষ রাখা : একটি রাষ্ট্রে শিষ্টাচার ও সুশাসনের সবচেয়ে বড় কথা হলো সেখানকার প্রশাসকদের সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণতাবে রক্ষা করা এবং তাদের সাথে ঘোচাচারমূলক ব্যবহার না করা। হ্যরত আবু বকর এ দুটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাছাড়া তিনি শাসনকর্তা নিয়োগকালে তাঁদের তীক্ষ্ণ প্রতিভার দিকটি বিবেচনা করতেন।

নির্বাচন সতর্কতা : যেসব লোক কোনো কারণে একবার নির্ভরশীলতা হারিয়েছে আবু বকর (রা) তাদেরকে ক্ষমপ্রার্থী হওয়ার পরও কোন দায়িত্বশীল পদ প্রদান করতে সংকোচ বোধ করতেন। সততা, অকপটতা এবং ইমানের দৃঢ়তা ইত্যাদিতে তাদের পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের কোনরূপ দূর্বলতা থাকলে খলিফা তাদের নির্বাচনে সতর্ক থাকতেন।

পরীক্ষামূলক নিয়োগ : বর্তমান যুগের সাধারণ নিয়মানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দক্ষতা ও উন্নত কার্যবলি সম্পর্কে বিশ্বাস না জন্মে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সংশ্লিষ্ট পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। স্থায়ী পদেন্মতির জন্য শর্ত হল উন্নত কার্যবলি। হ্যরত আবু বকর (রা) এসব নিয়মাবলি পুরুষানুপুর্জভাবে পালন করতেন।

পদচূড়ি : নিয়োগের পর কেউ অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে আবু বকর (রা) তাকে বিনা দিধায় পদচূড়ি করতেন। এজন্য একবার হ্যরত খালিদ ইবন সাউদকে পদচূড়ি করা হয়।

বাইতুল মাল : রাসুলুল্লাহ (স.) -এর যুগেই বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যক্রম শুরু হয়। হ্যরত আবু বকর (রা) এর সকল ব্যবস্থাপনা হ্যরত আবু ওবায়দার (রা) ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি বাইতুল মালের আমাদানি ও ব্যয়ের হিসাব রাখতেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

ফাতাওয়া বিভাগ : ইফতা অর্থাৎ শরীয়তের আহকাম প্রচার ও ফাতাওয়া প্রদানের জন্য তাকওয়া ছাড়াও ফিকহী জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এটা এমন একটা সম্পদ যা শুধু আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছে প্রদান করেন। আবু বকর (রা)-এর ফাতাওয়া বিভাগে যাঁদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের নাম হল- হ্যরত আলী (রা), হ্যরত মুয়ায় ইবনে জাবাল (রা), হ্যরত উবাই ইবনে কাব (রা), হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) এবং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)।

পুলিশ বিভাগ : তখনকার দিনে দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে পুলিশ বিভাগের মতো পৃথক কোন বিভাগ ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে এর বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবুও উপস্থিত চাহিদা মেটানোর জন্য কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তিকে এই কাজে নিয়োগ করা হয়।

হ্যরত আবু বকর (রা)-এর ভাতা : প্রথমত তিনি সরকারি কোষাগার থেকে নিজে কোন ভাতা গ্রহণ করতেন না। ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকলে শাসনতাত্ত্বিক কাজ বিশ্ব হওয়ার আশংকায় মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ভাতা গ্রহণ করতেন। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে তিনি তা ফেরত দিয়ে গেছেন।

অর্থ ব্যবস্থা : হ্যরত আবু বকর (রা) তাঁর সংক্ষিপ্ত খিলাফতের সময় প্রধানত আরব উপদ্বিপের অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব, জাতীয় ঐক্য এবং বাইরের আক্রমণ হতে এর নিরাপত্তা বিধানে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সে কার্যপদ্ধতি ও সরলতা পাওয়া যায়, যা রাসুলুল্লাহ (স.) -এর পবিত্র যুগে ছিল। অতএব হ্যরত আবু বকর (রা) এর যুগের অর্থ ব্যবস্থা জানতে হলে যহং রাসুলুল্লাহ (স.) এর যুগের অর্থ ব্যবস্থা জানতে হবে।

সেনা বিভাগ ৪ রাসুলুল্লাহ (স.) এর সময় নিয়মতাত্ত্বিক কোনো সেনাবিভাগ ছিল না। সমস্ত সাহারা ইসলামি মুজাহিদ ছিলেন। যখন আবশ্যক হতো সাহাবিগণ নিজেরাই ইসলামি ঝাভার নীচে সমবেত হতেন। খলিফার যামানায় ও সেই অবস্থা ছিল- যখন প্রয়োজন হতো মুসলমানগণ বীরত্বের সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। তবে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে যেতে হত, তখন সেনাবাহিনীকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তা ঠিক করে দিতেন। সমগ্র সেনাবাহিনীর জন্য একজন সিপাহসালার নিযুক্ত করতেন।

হ্যরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে গণিমাত্রের সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য নির্ধারিত ছিল। খলিফা নিজে সেনাবাহিনীর দেখাশুনা করতেন। ত্রুটি সংশোধন করতেন এবং পরম্পর আত্ম, একতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিক্ষা দিতেন।

অমুসলিম নাগরিকদের সাথে আচরণ ৪ বিধৰ্মী ও জিম্মীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করার জন্য খলিফা পরামর্শ দিতেন। এ সময় জিয়িয়ার পরিমাণও ছিল সামান্য, বহু সংখ্যক জিম্মী জিয়িয়ামুক্ত ছিল। অমুসলিমগণ নিজ ধর্ম ও নাগরিক স্বাধীনতা পূর্ণভাবে ভোগ করত ও তাদের জান মালের পূর্ণ নিরাপত্তা ছিল।

ইসলামের প্রচার

ইসলামের প্রচার-প্রসারে নায়েবে রাসুলের পদমর্যাদায় থাকায় হ্যরত আবু বকর (রা.) এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল, ইসলামের তাবলীগ তথা প্রচার ও প্রসার। এই উত্তম কাজে তিনি ইসলামের সূচনা পর্ব থেকে আয়ত্য জড়িত ছিলেন। রোমান ও ইরানীদের মোকাবেলায় যে সমস্ত সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। যেমন- হ্যরত মাহমার চেষ্টায় ইরাকের বনী ওয়ালের সমস্ত মৃত্যুজুক এবং স্থ্রীলোক মুসলমান হয়েছিল। হ্যরত খালিদ (রা.) এর দাওয়াতে ইরাকী-আরবের অধিকাংশ গোত্র মুসলমান হয়েছিল।

নবি পরিবারের সাথে ব্যবহার

নবি করিম (স.) এর আজ্ঞায় স্বজনদের সাথে সুন্দর ব্যবহার, রাসুলুল্লাহ (স.) এর খণ্ড পরিশোধ, ওয়াদা প্ররূপ করা খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) সর্বপ্রথম এই দায়িত্ব আদায় করেন। তিনি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর স্ত্রীগণের সুখ শান্তি ও সুবিধার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখতেন।

তিনি রাসুলুল্লাহ (স.) এর আজ্ঞায়দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি তাঁর শাসনামলে হ্যরত আজী (রা.) কে বলেছিলেন “নিচ্যই আমাদের আজ্ঞায়দের সাথে ভালো ব্যবহার করার চেয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) এর আজ্ঞায়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করবো, এটি উত্তম।” (বোখারী)

চরিত্র

হ্যরত আবু বকর (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.) এর প্রিয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সঠিক সিদ্ধান্ত ও সমস্যা অনুধাবনে তিনি ছিলেন অন্যন্য। তিনি যে সমস্যায় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাই গৃহীত হয়েছে। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ছিলেন অতুলনীয়। বক্তৃতা-ভাষণে ছিলেন অপ্রতিদ্রুতী, বৎসজ্ঞানে পদ্ধিত, স্মৃতি ব্যাখ্যায় আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী ইসলামি জ্ঞানে তাঁর মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ। তিনি ছিলেন বিচক্ষণতায় ও গাম্ভীর্যে আকর্ষণীয় অত্যন্ত বৃদ্ধিমান এবং একজন কুশলী রাস্তানায়ক।

হয়রত আবু বকর (রা.) জন্মগতভাবে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সততা, সাধুতা, পবিত্রতা, দয়া, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলি ছিল। অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত রচিসম্পন্ন ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন তিনি। ভোগবিলাস ও জাঁকজমক তাঁর নিকট ছিল অপচন্দনীয়।

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন নবি চরিত্রের পূর্ণ প্রতিবিম্ব। এবাদত, ধার্মিকতা, খোদাইতি ও পৃণ্যের এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। তাঁর এবাদতের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি সারারাত নামায পড়ে কাটাতেন। দিনে অধিকাংশ সময় রোয়া রাখতেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সাথে প্রীতি ও সম্ভাব রাখতেন। তাঁর চাল-চলন ছিল সাদাসিধে, মোটা কাপড় ব্যবহার করতেন। বাহ্যিক কোন জাকজমক ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি খুবই সম্পদশালী ছিলেন, কিন্তু পরে সমস্ত সম্পদ ইসলামের খেদমতে বিলিয়ে দেন। এজন্য কোনো সময় দরিদ্রতার কারণে দুই তিন দিনও তাঁকে অনাহারে থাকতে হতো। তাঁর এমনও সময় এসেছে যে, গায়ের জামা ও পরনের কাপড় ছিল না। একটি কম্বল, বোতাম ও ঘুন্টি ছাড়া কঁটা দিয়ে আটকিয়ে পরতেন।

মুসলিম উমাহ এ ব্যাপারে একমত যে, নবিগণের পর সমস্ত বনী আদম-এর মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন সর্বোত্তম। রাসুল (স.) বলেছেন, আমি প্রত্যেকের উপকারের প্রতিদান দুনিয়াতেই পরিশোধ করে দিয়েছি, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) এর উপকারসমূহ আমার উপর রয়ে গিয়েছে, তাঁর প্রতিদান আল্লাহ তায়লা পরকালে দিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত উমর (রা.) ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রাথমিক জীবন : খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আদী গোত্রের এক সম্মান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার ডাক নাম ছিল আবু হাফস। উপাধি ছিল ফারুক। পিতার নাম খাতাব এবং মায়ের নাম হাতায়া। বৎসরার উর্বরতন নবম পুরুষ কাব পর্যন্ত গিয়ে মুহাম্মদ (স.) এর বংশের সাথে মিশেছে। তাঁর গোত্রবর্ণ ছিল ঈয়ৎ রক্তিম, মাথা ভাঁজ বিশিষ্ট, গাল স্বল্প মাংসল, দাঢ়ি ঘন, দেহ দীর্ঘকায় ছিল। বাল্যকাল হতেই তিনি সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। শক্তিশালী, তেজস্বী এবং কুস্তিগীর হিসেবে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। প্রাচীন আরব ঐতিহাসিক বালাজুরীর বর্ণনা মতে, মহানবি (স.)- এর আবির্ভাবের প্রাককালে কুরাইশ বংশের মাত্র সতেরজন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে হযরত উমর (রা.) ছিলেন অন্যতম। তিনি একজন খ্যাতনামা বক্তা ও কবি ছিলেন। পেশাগতভাবে ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া ও পারস্য ভ্রমণ করে বহু খ্যাতিসম্পন্ন লোকের সংস্পর্শে আসেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতা ও চিন্তা ধারা সম্প্রসারিত হয়।

ইসলাম গ্রহণ : প্রথম দিকে হযরত উমর (রা.) ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং কুরাইশ বংশের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে নবদীক্ষিত মুসলমানদের নির্যাতন করতেন। এমন কি একদা তিনি রাসুলল্লাহ (স.) কে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে ভগ্নি ফাতিমা এবং ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামে দীক্ষিত তাঁর ভগ্নি ফাতিমার কর্তৃত কুরআনের সুমিষ্ট আয়াত শ্রবণ করে তিনি বিগলিত হয়ে যান। অতঃপর তিনি মন্ত্রমুক্তের ন্যায় রাসুলল্লাহ (স.) এর কাছে উপনীত হয়ে

ইসলাম গ্রহণ করেন। হ্যরত উমর (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি মক্কার বিখ্যাদেরকে একত্রিত করে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং মহানবি (স.) কর্তৃক ‘ফারক’ বা সত্য-মিথ্যার প্রতেকারী উপাধি লাভ করেন। নবুয়তের সম্মত বছরে হ্যরত উমর (রা) এর ইসলাম গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইসলামের চরম শত্রু পরম ভক্তে ‘পরিণত হওয়ার ফলে ইসলামের শক্তি বহুগণ বেড়ে যায়।

খিলাফত গ্রহণের পূর্বে ইসলামের সেবা : হ্যরত উমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা প্রকাশে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তিনি নিজেও ইসলাম প্রচারে যোগ দেন এবং তাঁর প্রভাবে অনেক গোত্রে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) মদিনায় হিজরতের পূর্বে তিনি বিশজন হিজরতকারীর একটি দল নিয়ে মদিনায় গমন করেন। তিনি সর্বপ্রথম আযান ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন এবং পরবর্তীকালে তা ঐশীবাণী দ্বারা অনুমোদিত হয়। তিনি মদিনায় হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর সুখ-দুঃখ ও সমস্যাবলীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, হুনাইন, খাইবার প্রভৃতি যুদ্ধগুলিতে যোগদান করে তিনি অসাধারণ বীরত্ব, যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। খন্দকের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের আক্রমণের প্রতিরোধে তিনি যে অপূর্ব সমরকুশলতার পরিচয় দেন এর স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর নামানুসারে তথায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়। হুদায়বিয়ার সম্মিলনে সারবত্তার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। ইসলামের স্বার্থের প্রতি অত্যন্ত স্বচেতন ছিলেন বলে তিনি এই চুক্তির বিরোধীতা করেছিলেন। কেননা আপাতদৃষ্টিতে এ সম্মিলনে প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু মহানবি (স.) এ সম্মিলনে অন্তর্নিহিত সারবত্তার কথা বুঝালে তিনি এতে সমত হন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি কুরাইশ নেতা আবু সুফয়ানকে বন্দী করেছিলেন। তাবুক অভিযানে তার শুমলৰ্ক সম্পদের অর্ধাংশ যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। এছাড়া তিনি তাঁর খাইবার অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেছেন। আল্লাহর রাসূলের প্রতি তাঁর সুগভীর শুল্ক ও তালোবাসা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে তিনি পাগলের ন্যায় বিক্ষুল হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম খলিফা মনোনয়নের সময় যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উভ্যে হয়েছিল তা দূরীকরণে হ্যরত উমর (রা.) এর যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি প্রথম খলিফা হিসেবে হ্যরত আবু বকর (রা.) এর নাম প্রস্তাব করে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি তাঁর প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে উচ্চত বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেন। তিনি বিচারকের দায়িত্ব ও পালন করেন।

খিলাফত লাভ : ইসলামের প্রথম খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.) জীবদ্ধশায় তাঁর উত্তরাধিকারী ইসলামি রাষ্ট্রের পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যাবার জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন। পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে এর জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে খিলাফতের একটি মৌমাংসা করে যেতে চাইলেন। অতীতের অভিজ্ঞতা হতে তিনি হ্যরত উমর (রা.) কে খিলাফতের গুরুদায়িত্বের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করতেন। কেননা কঠোরতা, ন্যায়নিষ্ঠাও জাগতিক কর্তব্য সম্বলে হ্যরত উমর (রা.) সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবু তার নির্বাচনের স্বপক্ষে জনমত যাচাই করার জন্য অন্যান্য সাহাবাদের পরামর্শ নিতে চাইলেন। সর্বপ্রথম তিনি হ্যরত আবদুর রহমান বিন আউফের পরামর্শ গ্রহণ করেন। হ্যরত আবদুর রহমান (রা.) বললেন, হ্যরত উমরের যোগ্যতা সম্বলে কোনো সন্দেহ নেই তবে তাঁর স্বত্বাব বড় কঠোর প্রকৃতির। এর উত্তর হ্যরত আবু বকর (রা.) বললেন, তাঁর নিজের উপর দায়িত্ব আসলে আপনা হতেই তিনি উদার হয়ে উঠবেন। এরপর তিনি হ্যরত উসমান (রা.)-এর সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। হ্যরত উসমান (রা.) হ্যরত উমরের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। এরপর হ্যরত আবু বকর (রা.)

অন্যান্য আনসার ও মুহাজিরদের মতামত নিলেন। তাঁরা সকলেই হয়রত উমর (রা)-এর মনোনয়নকে সমর্থন করেন। হয়রত তালহা (রা) মনোনয়নের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বললেন যে, তাঁর মতে হয়রত উমর (রা) সাহাবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।” এরপর তিনি হয়রত উসমান (রা)-কে ডেকে এনে হয়রত উমরের (রা) এর পক্ষে একটি মনোনয়ন পত্র লিখে নিলেন। মনোনয়নপত্র সম্পাদনের পর হয়রত আবু বকর (রা) উপস্থিত জনতাকে সম্মোধন করে বললেন, “ভাইসব! আমি আমার কোনো আত্মীয়-সঙ্গকে খলিফা মনোনীত করিনি; বরং হয়রত উমর (রা)-কে মনোনীত করেছি যাতে আপনারা এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন।” এ কথা শুনে উপস্থিত জনতা সমবেত কঢ়ে বলে ওঠল, “আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং মনোনয়ন মেনে নিলাম।” অতঃপর খলিফা হয়রত আবু বকর (রা) এর ইন্তেকালের পর ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে হয়রত উমর (রা) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফারপে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

হয়রত উমর (রা) এর রাজ্য বিস্তার

খিলাফত লাভের পরপরই হয়রত উমর (রা) তাঁর পূর্ববর্তী খলিফা হয়রত আবু বকর (রা)-এর সীমান্ত নীতি অনুসরণ করেন। ফলে মাত্র দশ বছরের মধ্যে ক্ষুদ্র আরব উপদ্বিপকে উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ করে তিনি তৎকালীন বিশ্বের দুই প্রাণক্ষেত্র পারস্য ও বায়জাটাইন সাম্রাজ্য মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এ সময়ে বিস্যৱকর ও দুঃসাহসিক সামরিক অভিযানগুলি সম্পর্কে অধ্যাপক পি. কে হিটি বলেন, “খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আল-আসের ইরাক, পারস্য ও মিসর অভিযানগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক অভিযানসমূহের অন্যতম এবং এগুলি নেপোলিয়ন, হ্যানিবল ও আলেকজান্দ্রের পরিচালিত যুদ্ধগুলির সাথে তুলনীয়।”

পারস্য বিজয়

আরবের পূর্বদিকে পারস্য সাম্রাজ্য অবস্থিত। ইরাক (মেসোপটেমিয়া) হতে আমুদরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান ইরান নিয়ে পারস্য সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। হয়রত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে ইরাক ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। মুসলমানরা যখন যুদ্ধের তখন খলিফা হয়রত আবু বকর (রা) ইন্তেকাল করেন। নতুন খলিফা হয়রত উমর (রা) এ সকল অভিযানের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য বিশেষভাবে তৎপর হন।

পারস্য বিজয়ের কারণ

হয়রত উমর (রা) এর শাসনকালে কতিপয় কারণে পারস্যবাসির সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভবী হয়ে পড়ে। এ সংঘর্ষের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

প্রথমত : মুসলমানদের কোন প্রকার উন্নতি এবং ইসলামের সমৃদ্ধি পারস্যবাসি কোনোভাবেই সহ্য করতে পারত না এবং সর্বপ্রকারে তাঁদের ধর্ম সাধনের চেষ্টায় লিঙ্ক ছিল।

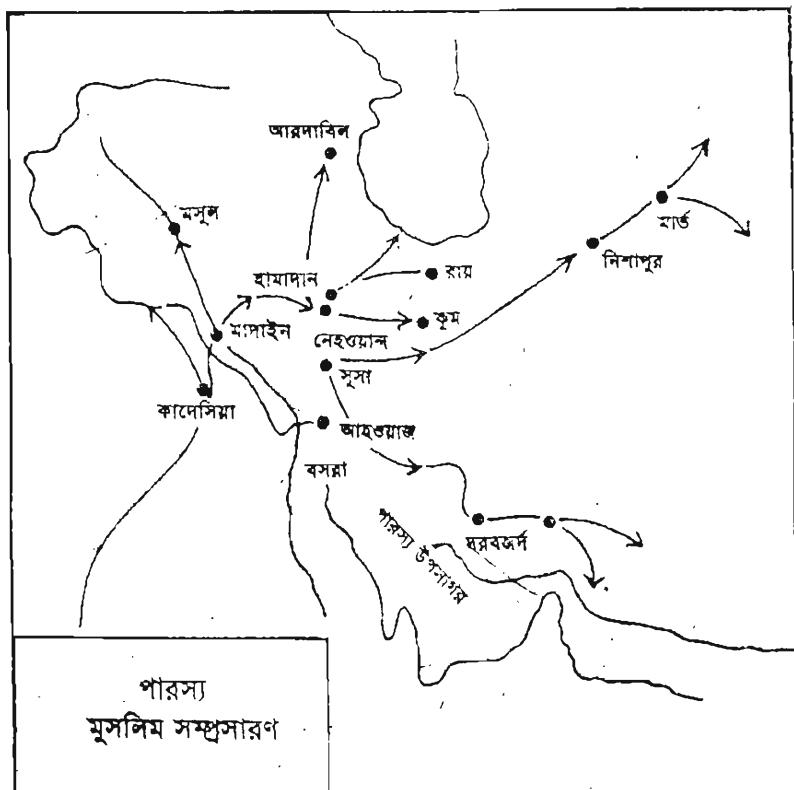
দ্বিতীয়ত : মহানবি (স.) কর্তৃক প্রেরিত মুসলিম দৃতকে অপমানিত করায় পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজ মুসলমানদের বিরাগভাজন হন। এভাবে আন্তর্জাতিক নীতির অবমাননা করায় এর প্রতিশেধ ব্যবস্থাপ্রয়োগ পারস্য বিজয় মুসলমানদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত : রিদ্বা যুদ্ধের সময় বাহরাইনে যখন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তখন পারস্যবাসী বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য প্রদান করেন। পারস্যবাসীদের বিদ্বেষপূর্ণ ও শক্রতামূলক আচরণের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মুসলমানগণ বাধ্য হন। এ হতে বুঝা যায় যে, খলিফা উমর (রা) সাম্রাজ্যবাদী নীতি দ্বারা পারস্য বিজয়ে উদ্বৃদ্ধ হননি, পারস্যবাসীর শক্রতা তাঁকে অন্তর্ধারণে বাধ্য করেছিল।

চতুর্থত : ইরাকের উপর দিয়ে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীদ্বয় প্রবাহিত হওয়ার ফলে এটা অত্যন্ত উর্বর এবং সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ইরাকের সাথে আরববাসীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পারস্যবাসীরা আরব মুসলিম বণিকদের অব্যাহতভাবে তাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে দিতে রাজি ছিল না। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও আরবগণ পারস্য বিজয়ে উদ্বৃদ্ধ হয়েছিল।

পঞ্চমত : ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাক প্রদেশ ছিল আরব ভূখণ্ডের সংলগ্ন। এজন্য আরববাসীর সাথে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। কাজেই রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিরাপত্তার জন্যই এতদ-অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা নেহায়েত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক পি. কে. হিটি বলেন, “অন্য কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া তৎক্ষণাত্ ঘটিত ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর ইসলামি সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়।” এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে উদ্বৃদ্ধ হয়ে আরববাসী মুসলমানগণ কখনও পারস্যদেশ জয় করেনি। পারস্যবাসীদের শত্রুতা সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরকে অন্তর্ধারণ করতে হয়েছিল।

ষষ্ঠতঃ অতি প্রাচীনকাল হতে পারস্য-সভ্যতা বিশ্বে সুবিদিত ছিল। সভ্যতার লীলাভূমি মেসোপটেমিয়া (ইরাক) ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বিশেষ। এছাড়া সমসাময়িক যুগে সমগ্র বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে হেলেনিক সভ্যতার সুম্পন্ত ছাপ পরিলক্ষিত হত। কাব্য ও সংস্কৃতিশ্রিয় আরববাসী এ শিক্ষা ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী হতে আশা পোষণ করত। সুতরাং রাজ্য বিজ্ঞারের পাশাপাশি তারা এ উদ্দেশ্য দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়।



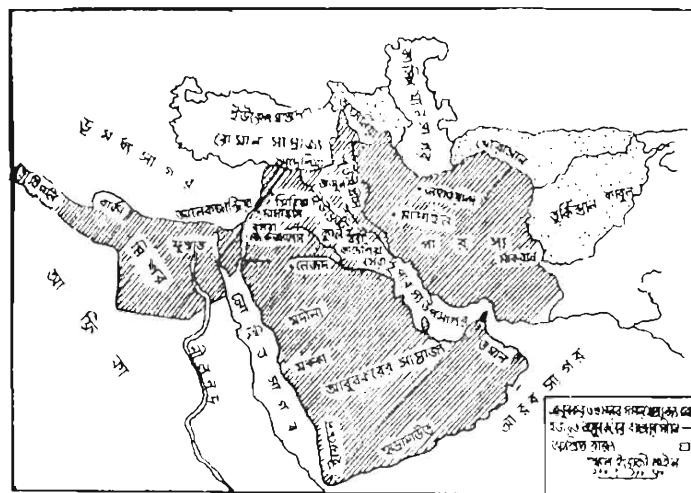
চিত্রঃ পারস্যে মুসলিম সম্প্রসারণ

পারস্য বিজয়ের ঘটনাবলি

নামারিকের মুদ্ধ (সেপ্টেম্বর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) : হ্যরত উমর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ আগস্ট খিলাফতে অবিষ্টিত হয়ে হ্যরত আবু বকর (রা)-এর বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। খলিফা আবু বকর (রা)-এর শাসনকালে হ্যরত মুসান্না (রা) ও হ্যরত খালিদের নেতৃত্বে পারস্য সাম্রাজ্যবাহীন হীরারাজ্য আরবদের অধিকারে আসে এবং হীরাবাসি মুসলমানদেরকে বার্ষিক কর দানে রাজী হয়ে সম্প্রতি করেছিল। কিন্তু হীরারাজ্য হারিয়ে পারস্যবাসী উন্নাদ হয়ে ওঠে এবং হীরারাজ্য পুনরুজ্বারের জন্য তৎপর হয়। অতঃপর হ্যরত উমর (রা) হ্যরত মুসান্নার সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য হ্যরত আবু ওবায়দার (রা) এর নেতৃত্বে অন্য একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। পারসিকগণ সেনাপতি রক্ষণের নেতৃত্বে নামারিক নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীর সমুখীন হয়। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করে মুসলমানগণ হীরারাজ্য পুনর্দখল করে।

জসর বা সেতুর মুদ্ধ (অক্টোবর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) : নামারিকের যুদ্ধে পরাজয়ে অতি মাত্রা ক্রুদ্ধ হয়ে রক্ষণ আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করে এবং বাহমান নামক জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত সৈন্যদলের নেতৃত্বে নিয়োগ করেন। যৃত ও লৃপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি হ্যরত আবু ওবায়দার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে দুই পক্ষীয় সৈন্যবাহিনী সেতু (জসর)-এর যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। এ যুদ্ধে পারসিকদের প্রচড় আক্রমণের ফলে হ্যরত আবু ওবায়দা (রা) ও তাঁর ভাতা এবং আরও সুযোগ্য মুসলিম সেনানায়ক পরাজিত ও নিহত হন। এ যুদ্ধে ৬,০০০ মুসলিম যোদ্ধা শহীদ হন। যুদ্ধের পূর্বে ও পরে মুসলিম বাহিনী নৌকা দ্বারা সেতু নির্মাণ করে ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করেছিল বলে একে সেতুর মুদ্ধ' বলা হয়। সেনাপতি আবু ওবায়দার মৃত্যুর পর হ্যরত মুসান্না (রা), তাঁর স্থলাভিসিক্ত হলেন। পারসিক সেনাপতি বাহমান যখন বিজয় লাভের আনন্দে উন্নাদ হয়ে উঠলেন, তখন তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনে বিদ্রোহের সংবাদ পেলেন। সুতরাং তিনি মুসলমানদের পশ্চাদ্বাবন পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে বিশ্বগুল রাজধানী রক্ষার্থে দ্রুত অগ্রসর হলেন। এ সংকটাপন্ন অবস্থায় হ্যরত মুসান্না (রা) উলিসে তাঁর রাজধানী স্থাপন করে পূর্ব বিজিত স্থানসমূহ রক্ষা করতে লাগলেন।

বুওয়ায়েবের মুদ্ধ (৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে) : জসর যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে হ্যরত উমর (রা) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং প্রতিশোধের জন্য নতুন সেনাবাহিনী গঠন করতে লাগলেন। বহু মুসলিম ও খ্রিস্টান তাঁর বলিষ্ঠ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামি পতাকাতলে সমবেত হল। ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কুফার অদূরে 'বুওয়ায়েব' নামক স্থানে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। সেনাপতি হ্যরত মুসান্না (রা) শত্রুপক্ষকে বিদ্রোহ করেন। পরাজিত পারস্যবাহিনী আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের চেষ্টা করল; কিন্তু পলায়নের পথ না পেয়ে তাদের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল। তাদের সেনানায়ক মিহরান যুদ্ধে নিহত হলেন। এ বিজয় দ্বারা মুসলিম আধিপত্যের সীমাবেধ মাদায়েন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুসলমানগণ মেসোপটেমিয়ার নিম্নগুল ও ব-হীপ অঞ্চলেও তাদের কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিজয়ের কিছুদিন পরেই ইসলামের বীর সেনানী হ্যরত মুসান্না (রা) প্রাণ ত্যাগ করেন (এপ্রিল ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে)। ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে সেনাপতি হিসেবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।



চিত্ৰ ৩ উমৰ (রা) এৰ রাজ্য

কাদেসিয়াৰ যুদ্ধ (নভেম্বৰ ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে) : পারসিকগণ বুওয়ায়েবেৰ যুদ্ধেৰ শোচনীয় পৱাজয় ভূলতে পাৱল না। তাৰা আৱাৰ মুসলমানদেৱ বিৰুদ্ধে যুদ্ধেৰ প্ৰস্তুতি শুৰু কৱল। হয়রত উমৰ (রা) পৱিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়ে জিহাদেৱ প্ৰস্তুতি প্ৰণয় কৱলেন। হয়রত সাঁদ ইবন আবি-ওয়াকাসকে মুসলিম বাহিনীৰ সিপাহসালার মনোনীত কৱা হলো। তাকে যুদ্ধ শুৰু কৱাৰ পূৰ্বে কাদেসিয়াৰ প্রান্তৰে তাৰু ফেলে দৃত মারফত পারস্যেৰ দৰবাৰে ইসলামেৰ দাওয়াত প্ৰেৱণে নিৰ্দেশ দেয়া হলো। ইসলামেৰ পয়গামসহ পারস্যেৰ দৰবাৰেৰ মুসলিম দৃত প্ৰেৱিত হল; কিন্তু পারস্যৱাজ ইয়াজদিগার্দ দৃতকে অপমান কৰে দৰবাৰ হতে তাড়িয়ে দিলেন। পারস্যৱাজেৰ এ অশোভন আচৰণেৰ ফলে যুদ্ধ তৃৰাণিত হলো। মহাবীৰ কুস্তমেৰ নেতৃত্বে পারস্যেৰ ফৌজ মুসলিম বাহিনীৰ মোকাবেলা কৱার জন্য যুদ্ধ তৃৰাণিত হলো। মহাবীৰ কুস্তমেৰ নেতৃত্বে পারস্যেৰ ফৌজ মুসলিম বাহিনীৰ মোকাবেলা কৱার জন্য প্ৰেৱিত হলো। সেনাপতি কুস্তমকে ইসলাম আনয়নেৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হলে তিনি এ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰে সম্ভাৱ আৱবকে ছিল বিছিন্ন কৰাৰ সংকল্প ঘোষণা কৱৱেন। তিনি ১,২০,০০০ সুসজ্জিত সৈন্যেৰ বিৱাট বাহিনীসহ মুসলমানদেৱ বিৰুদ্ধে অগ্রসৱ হলেন। অপৰদিকে মুসলিম সৈন্যবাহিনীৰ সংখ্যা ছিল ষাট হাজাৰ। তন্মধ্যে বদৱ যুদ্ধে অংশগ্ৰহণকাৰী ৯৯ জন সাহাবাৰ মোট ১০০০ সাহাবা ছিলেন। মুসলিম সেনাপতি হয়রত সাঁদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়াৱ তিনি তাৰ স্থলে হয়রত খালিদ বিন আৱতাফাকে নিয়োগ কৱেন এবং নিজে যুদ্ধক্ষেত্ৰে নিকটবৰ্তী একটি পুৱাতন রাজপ্রাসাদেৱ ছাদে ওঠে শায়িতাবস্থায় যুদ্ধ পৱিদৰ্শন কৱতেন। প্ৰয়োজনমতো হয়রত খালিদ-বিন আৱতাফাকে নিৰ্দেশ দিতেন। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দেৰ নভেম্বৰ মাসে কাদেসিয়া প্রান্তৰে তুমুল যুদ্ধ আৱস্থা হলো। এ যুদ্ধ তিনিদিন স্থায়ী ছিল। আৱৰদেৱ নিকট প্ৰথম দিনে যুদ্ধ ইয়াউমুল আৱমাছ অৰ্থাৎ বিশৃঙ্খলাৰ দিন, দ্বিতীয় দিনেৰ যুদ্ধ ইয়াউমুল আগওয়াস অৰ্থাৎ- সাহায্যেৰ দিন এবং তৃতীয় দিনেৰ যুদ্ধ ইয়াউমুল উন্নাস অৰ্থাৎ দুর্দশাৰ দিন নামে পৱিচিত। তৃতীয় দিন সাৱাৰাত যুদ্ধ চলেছিল বলে ঐ বাত “লাইঙ্গাতুল হাৰীৰ” অৰ্থাৎ গোলযোগপূৰ্ণ বাত নামে পৱিচিত। দ্বিতীয় দিনে যুদ্ধে সাহাবীৰ কাকা যুদ্ধেৰ ময়দানে অবতৱণ কৱেই পারস্যবাসীকে মল্যযুদ্ধে আহমান জানালেন। পারস্যেৰ প্ৰসিদ্ধ বীৰ বাহমান হয়রত কাঁকাৰ বিৰুদ্ধে ছুটে আসলেন। কিন্তু হয়রত কাঁকা (রা) সহজেই তাকে ধৰাশায়ী কৰে পৱপাৱে পাঠিয়ে দিলেন। পারস্যবাহিনী বীৱত সহকাৰে যুদ্ধ কৱেও অবশেষে পৱাজিত হলেন। কুস্তম নিজে লড়াইয়েৰ ময়দান হতে পলায়ন কৱতে গিয়ে নিহত হলেন। কুস্তমেৰ মৃত্যুতে পারস্যবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল এবং মুসলিম বাহিনীৰ নিকট আজসুমৰ্গণ কৱতে বাধ্য হয়।

কাদেসিয়া যুদ্ধের গুরুত্ব : ইসলামের ইতিহাসে কাদেসিয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রাপ্তি। এ যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর হতেই পারসিকদের যুদ্ধস্মৃতি প্রশংসিত হতে থাকে। কারণ (ক) টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম দিকস্থ উর্বর ভূমি মুসলিম কর্তৃত্বাধীনে আসে এখান হতে তারা উন্নতর উর্বর ভূমির মালিক হয়। ইতোপূর্বে তারা এ ধরনের ভূমির একান্ত অভাব অনুভব করেছিল। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি সাধিত হয়। (খ) ইরাকের কৃষককুল মুসলমানদের বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়েছিল; কারণ পারস্য শাসনাধীনে উন্নত এলাকার কৃষককুল উচ্চ করভারে জর্জরিত হচ্ছিল এবং সামন্ত রাজা কর্তৃক নিগ্রহীত হয়েছিল। সুতরাং রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইরাকের কৃষককুল মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করার ফরে পারসিক শক্তির মাঝারিক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। মুসলমানগণ কর্তৃক উন্নতর শাসন প্রবর্তনের ফলে এখানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (গ) সর্বোপরি কাদেসিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুসলমানদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস এতই দৃঢ় ও বৃদ্ধি পায়েছিল যে, তারা পরবর্তী বৃহত্তর সংগ্রামে অজেয় হয়ে ওঠে।

মাদায়েন বিজয় (মার্চ, ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) : আলেকজান্ড্রার সেনাপতি সেলিউকাসের বংশধরগণ কর্তৃক নির্মিত পশ্চিমাংশ সেলুসিয়া ও পারস্য রাজগণ কর্তৃক নির্মিত পূর্বাংশ টেসিফোন নামে পরিচিত নগরীয়ত্বকে “মাদায়েন” (দুই শহর) বলা হত। দজলা ও ফোরাত নদীর সঙ্গমস্থল হতে ১৫ মাইল উজানে দজলার উভয় ভূখণ্ডব্যাপী এ নগরী অবস্থিত। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হযরত উমর (রা.) এর নির্দেশ ক্রমে সেনাপতি হযরত সাদ ইবন আবি-ওয়াক্স (রা.) মাদায়েনের দিকে যাত্রা করলেন। প্রথমে তিনি নগরীর পশ্চিমাংশের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে পারসিকগণ মুসলিম সেনাবাহিনীকে বাধা দিয়ে পরাজিত হয়। হযরত সাদ (রা.) এবার সেনাবাহিনীসহ নদী অতিক্রম করে পূর্ব তীরে পৌছলেন। এখানকার জনগণ পূর্বেই পালিয়ে গিয়েছিল। ফলে একরকম বিনা বাধাতেই মুসলমানগণ মাদায়েন দখল করেন। পারসিকদের সঞ্চিত বিপুল ধন সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হল। সেনাপতি হযরত সাদ (রা.) মাদায়েনকে ইরাকের রাজধানীতে পরিণত করেন।

জালুলার যুদ্ধ (ডিসেম্বর ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) : কাদেসিয়ার রণক্ষেত্রে পরাজয়বরণ করে পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ সাসানী বংশী সম্রাট ইয়াজিদিগাদ তাঁর বিধিবন্ধন এবং বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীসহ পারস্যের পার্বত্য প্রদেশ হুলওয়ানে পলায়ন করেন। পারসিকগণ যৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার ও পরাজয়ের প্লান মুছে ফেলার মানসে মাদায়েনের একশত মাইল উন্নরে হুলওয়ান নামক স্থানে বিপুল সংখ্যায় ইয়াজিদিগাদ এর সাথে মিলিত হল। তথা হতে জালুলা নামক একটি দুর্ভেদ্য দূর্গের দিকে তারা অগ্রসর হল। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সেনাপতি হযরত সাদ ইবন আবি ওয়াক্স (রা.) এর অনুমতিক্রমে সেনাপতি হযরত কাকাকে ১২০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে জালুলা নামক প্রান্তরে পারসিকদের মোকাবেলা করতে নির্দেশ দেন। আটদিন অবরোধের পর জালুলার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করলে হুলওয়ান তাদের দখলে আসে। অতঃপর ট্রাইমিস নদীর তীরবর্তী টাকরিট দূর্গ এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত হিত ও কিরিকিসিয়া দূর্গগুলো মুসলমানদের অধিকারে আসে। এরপে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সমগ্র মেসোপটেমিয়া (ইরাক) মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

কুফা ও বসরা প্রতিষ্ঠা (৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) : ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্স (রা.) কুফা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং খলিফা উমর (রা.) এর নির্দেশে হিরার নতুন রাজধানী কুফায় নির্মাণ করলেন। ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কুফা নগরীর সুবিধা ছিল এই যে, কোন সময় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সহজেই শহর পরিত্যাগ করে সেনা ছাউনীকে মরণভূমিতে উঠিয়ে নেয়া যেত। একই বছর উবান্নার নিকট শাতআল আরবে বসরা শহর প্রতিষ্ঠা করে অপর একটি সেনানিবাস নির্মাণ করেন। ইরাকে বসরা ও কুফা নগরী প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্বদিকে সামরিক অভিযান প্রেরণে যথেষ্ট সুবিধা হয়। উপরন্তু, আরব

ভূখণ্ডের তুলনায় ইরাক সুজলা সুফলা ছিল। এর জলবায়ুও ছিল স্থান্ধকর। এ কারণে মুসলমানগণ দুটি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল। পরবর্তীকালে এ স্থান দুটি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে এ দুটি শহরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখানে অনেক জ্ঞানী-গুণী, কবি-সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও দরবেশ বসবাস করতেন।

নিহাওয়ানদের যুদ্ধ (৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে) ৪ হুলওয়ান বিজিত হলে পারস্য সম্রাট ইয়াজিদিগার্দ খলিফা উমর (রা) এর নিকট সম্মত প্রত্তাব করেন এবং যথারীতি মুসলমান এবং পারসিকদের মধ্যে সম্মিলিত স্বাক্ষরিত হয়। সম্মিলিত শর্তানুযায়ী পারস্য পৰ্বতমালা দুই সাম্রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে শিগগির মুসলিম সৈন্যগণ পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করতে বাধ্য হন। এদিকে পারস্য সম্রাট ইয়াজিদিগার্দও সম্মিলিত শর্ত ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তিনি জুবজান, রাই, ইস্পাহান ও হামাদান প্রভৃতি অঞ্চল হতে সৈন্যবাহিনী সংঘবন্ধ করে ফিরোজানের নেতৃত্বে ১,৫০,০০০ পারসিক সৈন্যের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী আলবুর্জ পাহাড়ের পাদদেশের প্রেরণ করলেন। খলিফা হ্যারত উমর (রা) পারস্য বাহিনীর মোকাবেলার জন্য প্রায় ৩০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করে হ্যারত নুমান বিন মুকরানকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। প্রথমে অবশ্য খলিফা স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পারসিক বাহিনীর সাথে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে নিহাওয়ানদের যুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে সেনাপতি নুমান (রা) পারস্য বাহিনীকে বিপর্বন্ত করেন এবং মুসলিম বিজয় সুনির্ণিত হয়। যুদ্ধে হ্যারত নুমান (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

পারস্য বিজয়ের ফলাফল

- পারসিকদের উপর আরবগণের (মুসলমানগণের) বিজয় লাভ হল আর্যদের উপর সেমেটিকদের বিজয়ের অনুকরণ। এতে জোরাস্তুর ধর্মের উপর ইসলামের প্রেরিত সাফল্য সূচিত হল। অটোরেই পারস্যের আগ্নি উপাসকগণ ইসলামের প্রাপ্তিক্ষেত্রে ও উদারতায় মুক্ত হয়ে দলে দলে ইসলাম র্ধম গ্রহণ করতে লাগল।
- এ বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ ইরাকে (মেসোপটেমিয়া) এবং অকসা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বময়কর্তা হয়ে দাঁড়ায়। পারস্য বিজয় দ্বারা মুসলমানগণ উক্ত দেশের সহজাত ও গৌরব ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসেছিল। এ বিজয়ে মুসলমানগণ উক্ত দেশের অগণিত ও অপরিমিত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদের অধিকারী হয় এবং এর ফলে আরবগণ তাদের বিজয় অভিযান সিদ্ধ নদ পর্যন্ত প্রসারিত করতে প্রেরণা লাভ করে।
- পারসিকগণের সংস্পর্শে এসে মুসলমানগণ তাদের সামরিক কৌশল আয়ত্ত করে নিল। তৎকালে পারস্য ছিল সুশৃঙ্খল ও সুসংহত সামরিক শক্তির মধ্যে অন্যতম।
- সাহিত্য, শিল্প, দর্শন এবং ভেজবিজ্ঞান প্রভৃতিতে পারসিকগণ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। তাদের সংস্পর্শে এসে আরবগণ এসব বিষয়ে প্রভৃতি জ্ঞানার্জন করে। অতি প্রাচীনকাল হতে ইরাক ছিল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও লীলাভূমি। প্রথম তিনি শতাব্দীতে যে সমস্ত পদ্ধতিগণ ইসলামের জ্ঞানভাবারে অসামান্য দান রেখে গিয়েছেন তাদের অনেকেই ছিলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী পারসিক।

রোমান (বাইজান্টাইন) সাম্রাজ্য বিজয়

আরবদেশের উত্তর-পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্য অবস্থিত। পূর্বে-রোমান সাম্রাজ্যকে “বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য” বলা হত। এ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, জর্ডান ও মিশর নিয়ে গঠিত ছিল। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে আরবের অধিবাসীরা বসতি স্থাপন করেছিল। অতি প্রাচীনকাল হতে আরবদের সাথে এ অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে

মুসলমানদের সঙ্গে এ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কারণে এ সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং মুসলমানগণ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য হন। নিম্নে এ সমস্ত কারণ উল্লেখ করা হলো।

রোমানদের সাথে যুদ্ধের কারণ

রাজনৈতিক : হ্যারত মুহাম্মদ (স) তাঁর জীবদ্ধশাহী রোমান সম্রাট হিসাক্তিয়াসের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে দৃত প্রেরণ করেছিলেন। রোমান সম্রাট তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু বাঞ্ছিত অসুবিধার জন্য তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি। অনুরূপভাবে সিরিয়ার বানু গাছান গোত্রীয় খ্রিস্টান শাসনকর্তার নিকটও মুসলিম দৃত প্রেরিত হয়। কিন্তু সেই দৃত সিরিয়া যাবার পথে মুতার খ্রিস্টান দলপতি সোরাহবিল কর্তৃক নির্মতাবে নিহত হয়। সুরাহবিল এ হত্যাকান্দের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নীতিবোধ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়। এ হত্যাকান্দের ফলশ্রুতিতে মহানবি (স) এর সময় মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হ্যারত আবু বকর (রা) এর খিলাফতকালে প্রতিহিস্সা নিবারণার্থে সিরিয়া সীমান্তে হ্যারত উসামা (রা) এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। উপরন্তু রিদ্বা যুদ্ধের সময় খ্রিস্টান মহিলা ভড় নবি সাজাহকে সাহায্য করায় মুসলমানদের সাথে বাইজান্টাইনদের সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং উভয় শক্তির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আসন্ন হয়ে ওঠে। বক্তৃতপক্ষে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইসলামের নিরাপত্তা এবং ইসলাম সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ীকরণের জন্য রোমান সাম্রাজ্যের মুসলিম সাম্রাজ্যভূক্তি হওয়াই একান্ত বিধেয় ছিল এবং পরবর্তীকালে বাস্তবিকই এর প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

অর্থনৈতিক : বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভূমির উর্বরতা, ঐশ্বর্য ও বৈত্তির প্রাচীনকাল অনুর্বর আরব ভূখণ্ডের অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরবদের সঙ্গে এ সকল অঞ্চলের বাণিজ্যিক লেনদেনও দীর্ঘকালের। কালক্রমে রোমানদের সাথে মূলমানদের বিরোধ দেখা দিলে তারা বাণিজ্যিক কার্যকলাপে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই নিজেদের স্বার্থে মুসলমানদের পক্ষে রোমান বিজয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বলতে গেলে অর্থনৈতিক কারণেই আরবগণকে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য করে এবং এ আক্রমণের ফলে আরবদের সাথে বাইজান্টাইনগণের সংঘর্ষ বাধে। পরিণামে এ সংঘর্ষ বৃদ্ধাকার সংগ্রামে পরিণত হয়।

ভৌগোলিক : ভৌগোলিক দিক দিয়ে সিরিয়ার এবং প্যালেস্টাইন প্রক্রতপক্ষে আরবের অঙ্গৰ্ত। এই দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিসমূহ বৃত্তত আরব জাতিরই একাংশ। সীমান্তে বসবাসকারী আরবীয় গোত্রসমূহ হ্যারত মুহাম্মদ (স) এর ইতিকালের পর আত্মিয়তার সূত্রে আবদ্ধ আরববাসীদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে যথাসাধ্য প্ররোচিত করত এবং প্রায়ই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে আক্রমণ চালাত। বাইজান্টাইন সম্রাট এ সমস্ত আক্রমণকারীদের পক্ষ সমর্থন করতেন। সীমান্ত সংঘর্ষ প্রতিহত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকে বিপদমুক্ত ও সুদৃঢ় করার জন্যই মুসলমানদেরকে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অন্তর্ধারণ করতে হয়।

সামরিক : সামরিক দিক দিয়ে কিলিসমা বর্তমান সুয়েজ শহর রোমানদের নৌ ঘাঁটি ছিল। কিলিসমা হেজাজ প্রদেশের অতি সন্ত্রিক্ষে অবস্থিত বিধায় শত্রুগণকে হেজাজের এত নিকটে অবস্থান করতে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এতে মুসলমানদের সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে। তাই কিলিসমা হতে শত্রু বিতাড়ন করে নিজেদের অবস্থা সুরক্ষিত করতে মুসলমানগণের পক্ষে মিসর অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল।

সিরিয়া বিজয়ের ঘটনাবলি

দামেস্ক বিজয় ৪ খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর খিলাফতকালে সিরিয়ায় একটি সুপরিকল্পিত যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৬৩৪ খ্রিঃ আজনাদাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এন্টিওকে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য একটি নতুন সৈন্যবাহিনী সংঘটিত করেন। মহাবীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) দ্রুত আজনাদাইন হতে দামেস্ক রওয়ানা হন। দামেস্ক ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশের রাজধানী বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবেও এ নগরীর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সুদৃঢ় ছিল। হযরত খালিদ (রা) প্রায় ৬ মাস দামেস্ক অবরোধ করে রাখলে নগরীর অধীবাসীরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। সম্রাট হিরাক্লিয়াস আপ্রাণ চেষ্টা করেও এই অবস্থার কোনো উন্নতি বিধান করতে পারেননি। অবশেষে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) একদল দুঃসাহসী মুসলিম যোদ্ধার সাহায্যে রাতের অব্ধকারে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং দ্বাররক্ষীদের হত্যা করে দামেস্ক নগরী মুসলমানদের নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দামেস্ক সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের করতলগত হয়। এই বিজয় হযরত আবু ওবায়দা (রা), হযরত আমর ইবন আল আস (রা) ও হযরত সুরাহবিল (রা) সেনাপতি হযরত খালিদকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

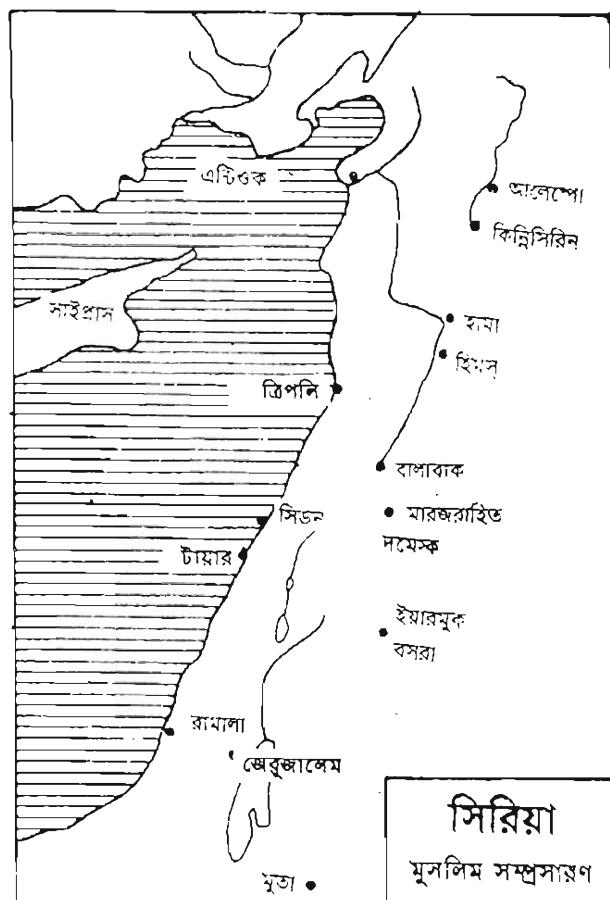
ফিহলের যুদ্ধ ৪ দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলমানগণ জর্দান অভিযুক্তে অগ্রসর হলে সম্রাট হিরাক্লিয়াস এন্টিওক থেকে ৫০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী দামেস্ক পুনরুদ্ধারের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সতর্কতার ফলে তারা দামেস্ক প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়ে জর্দানে অবস্থান করতে থাকে। মুসলিম বাহিনী “ফিহল” নামক স্থানে তাবু স্থাপন করেন। মুসলমানদের দৃঢ়সংকল্প ও মনোবল দেখে রোমানগণ বিচলিত হয়ে ওঠে। তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলন প্রস্তাব দেয়। কিন্তু রোমানদের অযৌক্তিক প্রস্তাব সম্মিলিত সন্ধির শর্ত মুসলমানগণ প্রত্যাখ্যান করলে ফিহলে উভয়পক্ষের এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রোমানগণ পরাজিত হয়। মুসলমানগণ রোমানদের জীবন, সম্পত্তি ও গির্জার হেফাজতের নিষ্পত্তি দেন। উল্লেখ্য যে, উইলিয়ম মুইরের বর্ণনা মতে দামেস্ক বিজয়ের পূর্বে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

হিমস অধিকার ৪ জর্দান অধিকার করার পরে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার বিখ্যাত ও প্রাচীন নগরী হিমসের দিকে অগ্রসর হয়। সামান্য বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর মুসলমানগণ প্রচড়ভাবে হিমস আক্রমণ করলে নগরীর অধিবাসীগণ আত্মসমর্পণ করে। হিমস অধিকৃত হলে খলিফা হযরত উমর (রা) মুসলিম সেনাপতিদেরকে আর সম্মুখে অগ্রসর হতে না দিয়ে বিজিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা পুর্ণগঠন করার নির্দেশ দেন তিনি হযরত আবু ওবায়দাকে হিমসের হযরত আমর ইবন আল আসকে জর্দানের এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে দামেস্কের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ৪ দামেস্ক, জর্দান ও হিমসের ন্যায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের পতনে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে আবেশীয়, সিরিয়া রোমীয়ও আরব শোগ্নীয় প্রিস্টোনদের নিয়ে গঠিত ২,৪০,০০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী আতা খিওড়োরাসের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। অপরপক্ষে মাত্র ৩৫,০০০ সৈন্যের এক মুসলিম বাহিনী হযরত আবু ওবায়দার অধিনায়কত্বে ইয়ারমুকের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে। হযরত আমর ইবন আল আস (রা) ও হযরত খালিদ-বিন ওয়ালিদ (রা) তার সাথে মিলিত হন। ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইয়ারমুকে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রোমীয়দের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং ঐতিহাসিক বালাজুরীর মতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে সত্ত্ব হাজার এবং ঐতিহাসিক তাবারীর মতে এক লক্ষের অধিক রোমান সৈন্য নিহত অথবা আহত হয়। মুসলমানদের পক্ষে তিনি হাজার সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন।

যুক্তির শর্ত : ইয়ারমুকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী যুদ্ধ। কাদেসিয়ার যুদ্ধ যেমন চিরকালের জন্য পারস্যের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়, ইয়ারমুকের যুদ্ধ ঠিক তেমনি সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। এ যুদ্ধের পর সমৃদ্ধিশালী সিরিয়া চিরদিনের জন্য রোমান সাম্রাজ্যের হস্তচ্যুত হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধ রোমানদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দেয়। তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনিষ্ট হয়ে পড়ে তারা বিভিন্ন শর্তে মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ যুদ্ধের সাফল্য মুসলমানদের পরবর্তী বিজয়ের পথ প্রশস্ত ও সুগম করে।

দেনাপতি হযরত খালিদের পদচূড়ান্তি ও সমষ্টি সিরিয়া বিজয় : ইয়ারমুকের যুদ্ধের অব্যবহিত পর খালিফা হযরত উমর (রা) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেন এবং তদস্থলে হযরত আমর (রা) কে নিযুক্ত করেন। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে উক্তর সিরিয়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। তিনি হযরত সুরাহবিলকে জর্দান, হযরত ইয়াজিদকে লেবানন এবং হযরত আমর ইবন আল আসকে প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেম অভিযুক্ত প্রেরণ করে তিনি দ্রুতগতিতে বালবেক, এডেসা, এন্টিওক, আলেপ্পো কিন্তিসিরিন প্রভৃতি স্থান দখল করে সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করেন।



চিত্র : সিরিয়ায় মুসলিম সম্প্রসারণ।

প্যালেস্টাইন বিজয়

জেরুজালেম অধিকার (আনুয়াবি, ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) : সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন বিজয়ের ধারাবাহিকতায় জেরুজালেমের পতন এবং মুসলমানগণ কর্তৃক এর কর্তৃত লাভ ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইয়ারমুক যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হ্যরত আমর ইবন আল আস কর্তৃক প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেম অবরোধের সংবাদ পেয়ে রোমান শাসনকর্তা আরতাবুন পালিয়ে যান। রোমানগণ শত চেষ্টা করেও তাদের পবিত্র শহর (এটি মুসলমানদেরও পবিত্র শহর) রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। অবশেষে অবরুদ্ধ নগরীর অধিবাসীবৃন্দ মুসলিম সেনাপতির নিকট এশর্তে আত্মসমর্পণ করতে স্বীকৃত হলো যে, মহান খলিফা হ্যরত উমর (রা.) স্বয়ং জেরুজালেম এসে সম্মিলিতে স্বাক্ষর করবেন। সেনাপতি হ্যরত আবু ওবায়দা (রা.) এ সংবাদ খলিফা হ্যরত উমর (রা.) কে জানাল, তিনি সকলের সাথে পরামর্শ করে একজন ভূত্য সহকারে উষ্ট পৃষ্ঠে চড়ে জেরুজালেম রওয়ানা হন। পালাত্রমে খলিফা ও ভূত্যাটি উটের পিঠে চড়তে চড়তে জেরুজালেম শহরে উপস্থিত হলেন। শহরে প্রবেশকালে পালানুয়ায়ী তখন খলিফা হ্যরত উমর (রা.) উটের রশি টানছিলেন আর ভূত্য উটের পিঠে বসা। এ দৃশ্য অবলোকন করে খ্রিস্টানগণ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েন। অতঃপর খ্রিস্টানদের সাথে সম্মিলিত সাক্ষর করে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হ্যরত উমর (রা.) নগরীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে তাদের ধর্মগুরু সাফেরিয়াস সম্মিলিতে সাক্ষর করেন। জিজিয়া করদানের প্রতিশ্রূতিতে জেরুজালেমবাসিগণ তাদের ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও জানমালের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ফিরে পায়। এ শহরের পতনের ফলে সমগ্র প্যালেস্টাইনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের যে সম্মিলিত স্বাক্ষর হয়, তাতে হ্যরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), হ্যরত আমর ইবন আল আস (রা.), হ্যরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) এবং হ্যরত মুয়াবিয়া (রা.) স্বাক্ষী ছিলেন।

জাজিরা (৬৩৮ খ্রিঃ)

রোমানদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমান সম্রাটের শত্রুতার অবসান ঘটেনি। ৬৩৮ খ্রিঃ রোমান সম্রাটের প্ররোচনায় ৩০ হাজার জাজিরাবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুসলিম আধিপত্য খর্ব করার চেষ্টা করে। অতঃপর নিরাপত্তা বিধানের জন্য হ্যরত আবু ওবায়দা (রা.) অভিযান পরিচালনা করে ৬৩৮ খ্�রিষ্টাব্দে জাজিরা দখল করেন।

আর্মেনিয়া ও সাইপ্রিসিয়া দখল : রোমানদের প্ররোচনায় কুর্দ ও আর্মেনিয়ানরাও আরব শাসনে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাদের বিশৃঙ্খল কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানগণ উভর মেসোপটেমিয়া আর্মেনিয়া ও এশিয়া মাইনরে রোমান শক্তির কেন্দ্র সাইপ্রিসিয়া অধিকার করেন।

এরপে মাত্র ছয় বছরের মধ্যে (৬৩৮-৬৪০ খ্রিঃ) সমগ্র সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। খলিফা হ্যরত উমর (রা.) ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে হ্যরত মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন।

মিসর বিজয়

অভিযানের কারণ :

প্রথমত : বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে মিসর ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্যালেস্টাইন বিজয়ের পর আরবদের মিসর অভিযান অবশ্যম্ভবী হয়ে পড়ে। কেননা রোমানগণ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন হতে বিভাড়িত হলেও মিসর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তখনও তাদের কর্তৃত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই মিসর হতে রোমানদের সাম্রাজ্য পুনরুন্মোক্ষণের অভিযানের আশঙ্কা ছিল।

ংষ্টীয়ত : মিসর ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিদ্যু হেজাজের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থেই মিসর দখল করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ত্রৃতীয়ত : মিসরে রোমানদের শক্তিশালী নৌ ঘাটি সেনানিবাস ও দুর্গ অবস্থিত থাকায় সুয়েজ ও আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য গঠনের জন্য মিসর বিজয় অবশ্যস্তাৰী হয়ে পড়ে।

চতুর্থত : নীলনদের দেশ বলে মিসর ছিল কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ। নীলনদের প্রচুর পানিযুক্ত পানিশ্রবাহ মিসর ভূমিকে উর্বরতা দান করে। এই জন্য মিসরকে “নীলনদের দান” বলা হয়। অন্বর আরবদেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তারা প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং কৃষি সম্পদে ভরপুর মিসর হস্তগত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন। উল্লেখিত কারণ ছাড়াও রোম সম্রাটের আচরণ মুসলমানদের মিসর বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। রোমান সম্বাট, জাফিরার জনগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দান করেছিলেন এবং মিসরের মধ্য দিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এসব কারণে খলিফা হ্যরত উমর (রা) কাল বিলম্ব না করে হ্যরত আমর ইবন আল আসকে মিসরের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মিসরের বিজয়ের ঘটনা

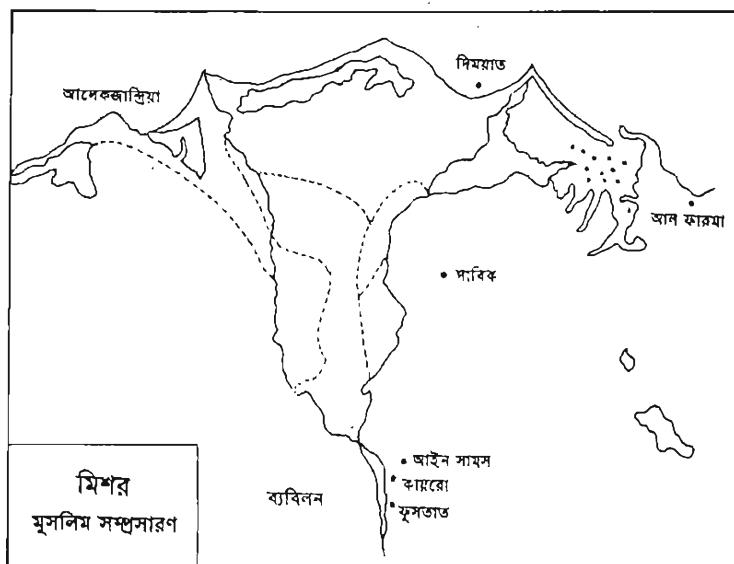
হেলিওপলিসের যুদ্ধ : হ্যরত আমর ইবন আল-আস (রা) ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ৪,০০০ সৈন্যসহ মিসরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ওয়াদি আল-আরিশ নামক স্থান দখল করেন। এরপর তিনি ফারামা, বিলবিল এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর জয় করে ব্যাবিলন নামক দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। এ সময় খলিফা হ্যরত উমর (রা) হ্যরত জুবাইর ইবনে আল-আওয়ামের নেতৃত্বে ১০,০০০ সৈন্য হ্যরত আমর (রা) এর সাহায্যার্থে মিসরে পাঠালেন। ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে আমর ইবন আল-আস (রা) ২৫,০০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীকে হেলিওপলিসের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। যুদ্ধে পরাজিত রোমান সেনাপতি থিওডোরাস আকেলজান্দ্রিয়ায় আত্মগোপন করেন এবং মিসরের শাসনকর্তা সাইরাস ব্যাবিলন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল মুসলমানগণ দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করে ব্যাবিলন দখল করে নেয়।

আলেকজান্দ্রিয়া দখল : মিসর অভিযানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আকেজান্দ্রিয়ার পতন। সেনাপতি হ্যরত আমর ইবন আল-আস (রা) বাইজান্টাইনের সামরিক ঘাঁটি আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করলেন। বাইজেন্টাইন সেনাপতি থিওডোরাস মুসলিম আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যথাসাধ্য ঢেক্ট করেন। এবার মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০,০০০ আর শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০,০০০। নতুন রোমান সম্বাট কনস্টান্স দুর্গ হতে বহু ক্ষেপণাত্মক নিষ্কেপ করেও মুসলিম সেনাবাহিনীর গতিরোধ করতে পারলেন না। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার পতনের পর উভয়পক্ষে সন্ধি হল। সন্ধির শর্তানুসারে রোমান সম্বাট মুসলমানদের বার্ষিক ১৩,০০০ দিনার দিতে অজীকারাবদ্ধ হলেন। চুক্তি অনুযায়ী জিয়িয়ার বিনিময়ে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা হয়।

খুলাফায়ে রাশেদিন

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আলেকজান্দ্রিয়া পতনের সাথে সাথেই ব্রাহ্মণ সম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রদেশ মিসর চিরকালের জন্য তাদের হস্তচ্যুত এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। উপরন্তু মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিভাগের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আলেকজান্দ্রিয়াকে মুসলমানগণ উক্ত আফ্রিকার বিরুদ্ধে সামরিক ঘাঁটি ও নৌবহরের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার সাধন করেছিল। অনেকগুলো জনকল্যাণমূলক সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ায় সেখানকার কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

ফুন্তাত নগরীর প্রতিষ্ঠা : আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর হ্যরত আমর ইবন আল-আস (রা) ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাবিলনের নিকট একটি সুন্দর শহর নির্মাণ করেন। এটাই বিখ্যাত ফুন্তাত শহর। বর্তমান কায়রো (আর-কাহিরা) প্রতিষ্ঠিত হ্বার পূর্ব পর্যন্ত ফুন্তাত নগরী মিসরের রাজধানী ছিল।



চিত্র : মিসরে মুসলিম সম্প্রসারণ।

মিসর বিজয়ের তত্ত্ব : মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিভাগের ক্ষেত্রে মিসর বিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলমানগণ উক্ত আফ্রিকায় অভিযানকালে মিসরকে সামরিক ঘাঁটি ও নৌ বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া হ্যরত আমর ইবন আল-আস (রা) মিসরের বাসিন্দাদের অবস্থার উন্নতি সাধন, রাজস্ব নির্ধারণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য উৎসাহ দান এবং মিসরের অযুসলিম প্রজাদের সাথে উদার ও সদয় ব্যবহার দ্বারা মিসরীয়দের জীবনে অভূতপূর্ব সুখ ও সমৃদ্ধি এনেছিলেন। মিসরবাসী ইতোপূর্বে আর কখনও এরূপ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে জীবনব্যাপন করতে পারেনি। উপরন্তু মিসর বিজয়ের পর হ্যরত আমর ইবন আল-আস হ্যরত খলিফা হ্যরত উমর (রা)-এর নির্দেশে খাল খনন করে নীলনদ ও লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেন। (৬৪২ খ্রিঃ) ফলে মিসর হতে আরবের সামুদ্রিক বন্দর ইয়ানবু পর্যন্ত যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। মুসলমানদের অর্থনৈতিক ভিত্তও সুদৃঢ় হয়।

রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলাফল

প্রথমত : প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী হয় এবং এর ফলে বাধ্য হয়ে তাদের নৌ-বাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। সুতরাং প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ প্রবল নৌ-শক্তির অধিকারী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়ত : সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন বিজয় মুসলমানদেরকে এশিয়া মাইনরের উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। তবে প্রাকৃতিক বাধার জন্য উক্ত অঞ্চলের অধিক দূর পর্যন্ত তারা অগ্রসর হতে পারেনি। উক্তর দিকে টুরাস পর্বত পর্যন্ত তারা আগতত উপনীত হয়েছিল। সুতরাং বহুদিন পর্যন্ত উক্ত পর্বত রোমান এবং মুসলমান সাম্রাজ্যবয়ের সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

তৃতীয়ত : প্রাচীনকাল হতে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিসর সমৃদ্ধিশালী এবং উর্বর ভূমিখন্ড হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্য অধিকার আর মুসলমানগণ আর্থিক দিক দিয়ে ঘাট্ট হয়ে উঠেছিল এভাবে মুসলমানগণ আর্থিক দৈন্য ও অভাব অন্টনযুক্ত হল এবং তারা তাদের জীবনযাত্রা, শিক্ষা-সংস্কৃতির মান উন্নয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল।

চতুর্থত : রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানগণ সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিসর অধিকার করে রোমান সাম্রাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল। রোমানগণ তিনটি সুন্দর ও উর্বর প্রদেশ মুসলমানদের নিকট হারিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে একেবারে পজ্জু হয়ে পড়েছিল।

পঞ্চমত : রোমানদের সান্নিধ্য লাভের ফলে মুসলমানগণ তাদের উন্নত সামরিক কলাকৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হন এবং এই লক্ষ জ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা পরবর্তীকালের বিজয়াভিযান সমূহে সাফল্য ছিনিয়ে আনেন।

ষষ্ঠত : মুসলমানদের এ বিজয় তাদেরকে গ্রিক ও রোমান সত্ত্বার সংস্পর্শে নিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে এ সমস্ত দেশ ছিল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও লীলাভূমি। এ বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ (আরবগণ) গ্রিক এবং রোমানদের জ্ঞান ভাস্তরের অধিকারী হয়েছিল। মুসলমানরা এর সাথে ইসলামি সভ্যতার সংযোগ সাধন করে বিশু সভ্যতার গতিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল।

পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যবয়ে বিজয়ে মুসলমানদের সফলতার কারণসমূহ

প্রবল পরাক্রান্ত পারসিক ও রোমানদের বিরুদ্ধে মুঠিমেয় আবরণদের বিস্ময়কর সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে আমরা প্রলুক্ত না হয়ে পারি না। কারণ তাদের সৈন্যদল ও অর্থবলের সাথে মুসলমানদের সৈন্যবল ও অর্থবলের কোনো তুলনাই চলে না। আমরা এখনে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী পারসিক ও রোমানদের পরাজয়ের পরিস্রেক্ষিতে মুসলমানদের (আবরণদের) সাফল্যের কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখবো।

আবরণদের জাতীয়তাবোধ : আবরণগণের সাফল্যের মূলে রয়েছে তাদের ইসলাম চেতনা। আমরা জানি যে, ইসলাম উচ্চজ্ঞতা ও পাপাসন্ত আবরণ সত্ত্বাগণকে ভাস্তুর বশ্যনে আবদ্ধ করেছিল। আবরণগণ ইসলামের শাশ্঵ত ও সন্তান বাণীতে অনুপ্রাপ্তি হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। মরুচারী আবরণগণ আল্লাহ ও রাসুলের উপর ইমান আনয়ন এবং কুরআন ও সুরাহর নির্দেশ মোতাবেক নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে লাগল। ইসলামের আদর্শবাদে বিশুস স্থাপন করে পারম্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে গিয়ে আবরণগণ এক নতুন পথে অগ্রসর হল। প্রতিটি আবরণ ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়কে জাতীয় জয়-পরাজয়ের আলোকে বিচার করত। এ মহান ইসলামি চেতনায় উদ্ভূত আবরণগণ জাতীয়তাবোধ শূন্য পারসিক এবং রোমানদের বিরুদ্ধে যে সাফল্য লাভ করে, তা একজন সুনির্ণিত ছিল।

আদর্শের প্রেরণা : পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইসলামের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল আদর্শের জন্য মুসলমানদের মরণপণ সংগ্রাম, যুদ্ধে জয়লাভ বা মৃত্যুবরণ করলে ইহকালে গাজি এবং পরকালে শাহাদাত লাভের আশায় মুসলমানগণ শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করত। পক্ষান্তরে পারসিক ও রোমান সৈন্যদের সম্মুখে অনুপ্রেরণা লাভের এরূপ কেনো আদর্শ ছিল না।

অর্থনৈতিক কারণ : অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেই আরবগণ তাদের উষ্ণর বাসভূমি পরিত্যাগ করে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের শস্য-শ্যামলা, উর্বর ভূমির দিকে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়েছিল। কেননা, নিজ দেশে জীবনের চেয়ে জীবনধারণের প্রশ্ন তাদের নিকট বড় হয়ে দেখা দিল। তাই জীবন মরনের সমিক্ষস্থলে দাঁড়িয়ে আরবগণ যুদ্ধ করত। এ উভয় সাম্রাজ্যের ধন ঐশ্বর্য ও সম্মতি আরবদের নিকট লোভনীয় ছিল। কারণ আরবগণ মনে করত যে, পারসিক ও রোমানদের উপর বিজয় লাভের অর্থই হচ্ছে তাদের দারিদ্র্য পীড়িত জীবনের অবসান এবং সুখময়, প্রাচুর্য-শোভিত জীবনের শুভ সূচনা।

শাসকদের অত্যাচার ও ষেছাচারী শাসন : পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের জনগণ তাদের বৈরাচারী শাসনকার্যের যথেষ্টারিতায় অতিষ্ঠ ও উত্তৃত হয়ে পড়েছিল। অত্যাধিক করভারে জর্জরিত প্রজাগণকে চরম ও শোচনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সমস্ত কারণে শাসকবর্গের প্রতি তারা সহানুভূতিহীন ও বীতশুন্দু হয়ে উঠেছিল। প্রজাগণ অত্যাচারী শাসকদের নিষীড়নের নাগপাশ হতে মুক্তিলাভের প্রতীক্ষায় ছিল। সুতরাং যখন মুসলমানগণ তাদের দেশে জয় করতে এসেছেন তখন উক্ত সাম্রাজ্যসময়ের পদদলিত জনসাধারণ তাদের সাথে হাত মিলিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করল। কেননা, মুসলমানগণ ইতোমধ্যে তাদের সাম্রাজ্যিত ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। উল্লিখিত বিবরণ হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের সাথে ঐ দেশের জনগণের পক্ষাবলম্বনই রোমান ও পারসিক শক্তি বিনষ্টের মূল কারণ।

মুসলিম সেনাপতিদের রণনৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা : হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা), হযরত আমর ইবন আল-আস (রা) এবং অপরাপর আরব সেনাপতিগণের রণদক্ষতা ও কর্মকুশলতা আরবগণের সাফল্যে প্রভৃত সাহায্য করে। তাদের চুম্বকধর্মী ব্যক্তিত্ব এবং অসামান্য শৌর্যবীর্য ও রণনৈপুণ্য আরবদেরকে পারসিক ও রোমান এ দুই দুর্ঘৰ্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভে সহায়তা করে।

রোমান ও পারিসকে সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী আইনের অভাব বা অনিয়ন্ত্রণ : পারসিক ও রোমান সিংহাসনে আরোহণের পক্ষে কোনো সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী নিয়ম না থাকায় সাম্রাজ্যসময়ের শাসকদের মৃত্যুর পরেই দেখা যেত রাজসভায় যত্নসন্ধি, কলহ এবং হত্যা আবশ্য হয়ে গিয়েছিল। এ সমস্ত ব্যাপার সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছিন্নতার পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। মুসলমানরা এরপ পরিস্থিতির সম্বৰহার করেছিল।

রোমান এবং পারসিক সৈন্য বিভাগে তিনি ভিন্ন জাতীয়তা : পারসিক ও রোমান সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত ছিল। সেনা বিভাগে এ বিভিন্ন জাতীয়তা মুসলমানদের হস্তে রোমান ও পারসিকদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারা জাতীয়তাবোধে উন্মুক্ত না হয়ে কেবল অর্থের জন্যই যুদ্ধ করত। দেশাত্মক বলতে তাদের কিছুই ছিল না।

জাতীয়তাবোধের অভাব : পারস্য ও রোমান সম্রাজ্যসময় জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এ দুটি সম্রাজ্য বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত ছিল এবং পারসিক ও রোমান শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে একটি ঐক্যবন্ধ জাতিতে পরিণত করার জন্য কোনো চেষ্টাই করেনি। জাতীয়তাবোধের এ অনুভূতির অভাব পারসিক ও রোমানদের পরাজয়ের অন্যতম একটি কারণ বলা যেতে পারে। আমরা জানি, যে রাষ্ট্র জাতীয়তাবোধ এবং জনগণের সক্রিয় সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার পতন অবশ্যম্ভব।

ইসলামের প্রাপ্তব্য এবং গতিশীল আদর্শবাদ : এতদিন যাবৎ পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের জনগণের কোনো ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। তারা নানানুগ ধর্মীয় অভ্যাচার ভোগ করেছিল। যখন মুসলমানগণ (আরবগণ) তাদের দেশ আক্রমণ করল, তখন তারা ইসলামের সহজাত সৌন্দর্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যের আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। এভাবে তারা ধর্মীয় নিষ্ঠাহ হতে অব্যাহতি লাভ করল এবং তাদের ইহলোকিক ও পারলোকিক জীবন কল্যাণমুক্ত হল। কারণ ইসলাম ধর্ম পার্থিব জীবন এবং অধ্যাত্মিক জীবনের একটি অপূর্ব সময়। ইসলাম সাম্য, আত্মত্ব ও আদর্শের ধর্ম। ইসলামের বিধি বিধান মানুষের সহজাত ভাবধারা ও বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সর্বকালে সর্বদেশের সর্বলোকের জন্য গ্রহণযোগ্য ও উপযোগী হয়ে উঠেছে। সুতরাং ইসলামের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার প্রাপ্তব্য ও গতিশীল আদর্শ আরবদের পার্থিব এবং অধ্যাত্মিক জীবনের সাফল্যের অন্যতম আর একটি কারণ। বিলম্ববাদী ও বিজাতীয় ঐতিহাসিকগণও অভিযোগ করেছেন যে, মুসলমানগণ এক হাতে কুরআন শরীফ ও অন্য হাতে অন্ত্র নিয়ে রাজ্য বিভাস এবং ইসলামধর্ম প্রচার করেছিল। কিন্তু এ অভিযোগটি উল্লিখিত বাস্তব সত্ত্বের আলোকে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়।

হ্যরত উমর (রা.) এর শাসনব্যবস্থা : হ্যরত উমর (রা.) এর খিলাফতকাল (৬৩৪-৬৪৪) ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে। বিশ্বের সর্বকালের শাসকদের নিকট তিনি ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। শ্রেষ্ঠ বিজেতা ছাড়াও একজন সুযোগ্য ও দ্রুদর্শী প্রশাসক হিসেবে ইতিহাসে তিনি অমরত্ব লাভ করেন। তার রাজ্য, সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও জনকল্যাণগুরু। তাই ড. এস, এম, ইয়ামউদ্দিন বলেন, “তার শাসনকাল ইসলামের কৃতিত্বপূর্ণ সামরিক ইতিহাসে এক সৌরাজ্ঞল অধ্যায় সংযোজন করেছে। হ্যরত উমর (রা.) শুধু একজন বিখ্যাত বিজেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং নিরক্ষুশ সফলকাম জাতীয় নেতাদের অন্যতম। হ্যরত আবু বকর (রা.) এর শাসনামল থেকে শুরু করে হ্যরত আলী (রা.) এর খিলাফতকাল পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছরের ইসলামি প্রজাতন্ত্রে যে শাসন নীতি অনুসৃত হয়েছিল, তা খলিফা হ্যরত উমর (রা.) এর নিকট থেকে উত্তৃত। তিনি মহাপ্রন্থ আল কুরআন ও আল হাদিসের নির্দেশ অনুসারে শাসনতাত্ত্বিক কাঠামোকে পরিপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেন। তাই নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রকৃত স্থপতি হচ্ছেন খলিফা হ্যরত উমর (রা.)।

হ্যরত উমর (রা.) এর শাসন ব্যবস্থা

গণতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থা : গণতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা ছিল খলিফা উমর (রা.) এর শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য। মহানবি (সা.) ও হ্যরত আবু বকর (রা.) গণতন্ত্রের যে বীজবগন করেন, তা খলিফা উমর (রা.) এর সময় বিকশিত হয়ে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন এবং কার্যক্রম গ্রহণ তাঁর শাসনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। খলিফার নীতি ও কার্য সম্পর্কে জনগণের গঠনমূলক সমালোচনা করার অধিকার তাঁর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সাম্য, স্বাধীনতা, একতা ও ভাতৃত্বের আদর্শে উদ্বৃদ্ধ হয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনকল্যাণকর ব্যবস্থা প্রচলন করেন। মাওলানা মুহম্মদ আলীর মতে, “উমর (রা.) এর খিলাফতে গণতন্ত্রের আদর্শ যতদূর পালন করা হয়েছিল, সেই আদর্শ অর্জন করতে বিশ্বের আরো অধিক সময় লাগবে।

মজলিস-উশ-শুরা (পরামর্শ সভা) : ‘শুরা’ আরবি শব্দ এর অভিধানিক অর্থ পরামর্শ। প্রাক-ইসলামি যুগে গোত্র প্রধানরা গণ্যমান সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে সমস্যার সমাধান করতেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। মহানবি (স.) প্রাক-ইসলামি নীতি ও কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদন করতেন। এই পরামর্শ সভাকে ‘মজলিশ উশ-শুরা বলা হয়। খলিফা হ্যরত উমর (রা.) মজলিশ-উশ-শুরার পরামর্শক্রমে

খিলাফত পরিচালনা করতেন। এটি ছিল তাঁর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি দৃঢ়ত্বকর্ত্ত্বে ঘোষণা করেন, “পরামর্শ ছাড়া কোনো খিলাফত চলতে পারে না।” এজন্য তিনি যে কোন সমস্যা মহাত্ম্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে সূরার সাহায্যে সমাধান করতেন। এ শাসন পরিষদ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; যথা : মজলিশ আল-আম এবং মজলিশ আল-খাস। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর জানীগুণী সহাবি এবং মদিনার গণ্যমান্য নাগরিক ও বিশিষ্ট বেদুইন প্রধানগণকে নিয়ে মজলিশ আল-আম গঠিত ছিল। এক কথায়, মুহাজিরিন, এবং আনসারদেরকে নিয়েই এটি গঠিত ছিল।

মদিনা মসজিদের শাসন পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া কতিপয় নির্দিষ্ট মুহাজিরিন নিয়ে মজলিস আল-খাস গঠিত ছিল। হ্যরত উমর (রা.) দৈনন্দিন শাসনকার্যে মজলিস আল-খাসের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। হ্যরত আলী (বা.), হ্যরত উসমান (রা.), হ্যরত আব্দুর রহমান (রা.), হ্যরত তালহা (রা.), হ্যরত জুবায়ের প্রমুখ সাহাবিগণের সমবয়ে এটি গঠিত ছিল। রাজ্য শাসনের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার বিশেষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হত। হ্যরত উমর (রা.) জনগণকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতেন। তার খিলাফতে শাসনক্ষেত্রের সর্বত্রই গণতন্ত্রে ও সাম্যবাদের নীতি অনুসৃত হত। হ্যরত উমর (রা.) এর খিলাফতে গণতন্ত্রের আদর্শ যতদূর পালন করা হয়েছিল, সেই আদর্শ অর্জন করতে বিশ্বের আরও অধিক সময় লাগবে।

আরব জাতীয়তাবাদ

হ্যরত উমর (রা.) এর শাসনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিল আরব জাতীয়তাবাদ অঙ্গুণ রাখা। তিনি আরবদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, রক্তের বিশুদ্ধতা, আভিজাত্য ও সামরিক প্রাধান্য ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। অবাধ যেলামেশায় তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য গুণের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি দুটি নীতি ঘোষণা করেন (১) আরব উপদ্বীপে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের লোক অবস্থান করতে পারবে না এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি খাইবারের ইহুদি এবং নাজরানের স্থিস্টানদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে আরবের বাইরে অবস্থান করতে নির্দেশ দেন। (২) তিনি ঘোষণা করেন যে, আরব উপদ্বীপ শুধু আরববাসীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তিনি অধিকৃত দেশে জমি-জমা ক্রয় করা কিংবা চাষাবাদ করা আরববাসীদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং আরবদেরকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন।

অমুসলমানদের প্রতি নীতি

খলিফা হ্যরত উমর (রা.) সকল অমুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। মুসলিম শাসিত অঞ্চলের অমুসলিম প্রজাদেরকে “জিমি” বা নিরাপত্তা প্রাপ্ত বলা হত। জিমিরা মুসলিম রাষ্ট্রে জিয়িয়া কর প্রদান করে সকল প্রকার অধিকার ভোগ করত। তাদের জন্মালের নিরাপত্তা দেওয়া হত। খলিফা তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলে আদায়কৃত কর ফেরৎ দিতেন। যুদ্ধের প্রাকালে অমুসলমানদের উপাসনাগৃহ, গির্জা রক্ষা, শিশু বৃন্দ ও পশুদের হত্যা কিংবা অত্যাচার করা প্রত্যনির্দেশ কাজকর্ম হতে সৈন্যদের বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হত।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ৪ খলিফা হ্যরত উমর (রা.) এর খিলাফতের মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য খলিফা উমর (রা.) সমগ্র সাম্রাজ্যকে চৌদ্দটি প্রদেশে বিভক্ত করেন (১) মক্কা, (২) মদিনা, (৩) সিরিয়া, (৪) আল-জাজিরা, (৫) আল-বসরা, (৬) আল-কুফা, (৭) আল-মিসর, (৮) প্যালেস্টাইন, (৯) ফারস, (১০) কিরমান, (১১) খোরাসান, (১২) মাকরান, (১৩) সিজিস্তান, (১৪) আজারবাইজান।

প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসনভার একজন ওয়ালি (গভর্নর) এর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে ওয়ালিগণ খলিফার নিকট দায়বদ্ধ থেকে তার নির্দেশ পালন করতেন। নিয়োগের সময় হ্যরত উমর (রা) প্রাদেশিক শাসন কর্তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কর্তব্য সমন্বে অবহিত করতেন। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে খলিফা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সংবলিত সনদটি প্রকাশ্যে পাঠ করে শুনাতেন। নিযুক্তির পরেই প্রত্যেক ওয়ালিকে তার সম্পত্তির একটি তারিকা পেশ করতে হত এবং আয়ের অনুপাতে আকসিক ও অয়াভাবিকভাবে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে খলিফা উমর (রা) প্রাদেশিক শাসনকর্তার অতিরিক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতেন। হ্যরত উমর (রা) সাধারণ লোকের অভিযোগক্রমে শাসনকর্তাগণের নিকট হতে কৈফিয়ত তলব করতেন। শাসনকর্তাগণ জনগণের সেবক মাত্র, এ আদর্শ হতে তিলমাত্র বিচ্যুত হলে খলিফা উমর (রা.) এর অমোগ দণ্ড হতে কারও নিষ্ঠার ছিল না। জনস্বার্থ সংরক্ষণ এবং আপামর প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নির্মিতে হ্যরত উমর (রা.) সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। হ্যরত উমর (রা.) শাসনকর্তাদেরকে নির্দিষ্ট বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। ওয়ালিগণ শুধু যে সৈন্যাধাক্ষ ছিলেন তা নয়, শুক্রবার দিন স্ব স্ব রাজধানীর মসজিদের জুমার নামাজে ইমামতি করতেন। খলিফা উমর (রা.) এর প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অধীনে আমিল (জেলা প্রশাসক), কাজি (বিচারক) ও সাহিব আল-বায়তুলমাল (কোষাধ্যক্ষ) তাদের স্ব স্ব কার্য সম্পাদন ও কর্তব্য পালন করতেন। তাদের বিবরণে কোনো অভিযোগ উথাপিত হলে, এর সত্যতা যাচাই করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মচারী নিযুক্ত ছিল এবং খলিফার নিকট তার পেশকৃত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে তিনি অভিযোগের যথাযথ প্রতিকার করতেন।

রাজস্ব ব্যবস্থা : ৪ জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে জনকল্যাণমূলক রাজস্ব প্রবর্তন খলিফা হ্যরত উমর (রা.) এর এক অবিসরণীয় কৌর্তি। ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না। সৈন্যদের মধ্যে জায়গীর প্রথার বিলোপ সাধনের পাশাপাশি কৃষি ও কৃষকদের দুর্দশা লাঘবে হ্যরত উমর (রা.) প্রাচীন শোষণমূলক ভূম্বত্ত ও জমিদার প্রথার উচ্ছেদ করেন। পাশাপাশি ইরাকে ভূমি জরিপ করে এর সুষ্ঠু বট্টন বন্দোবস্ত, রাজস্ব নির্ধারণ ও তা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। নগদ অর্থে বা উৎপন্ন ফসলের মাধ্যমে এককালীন কিংবা কিংস্তিতে কর প্রদান করা যেত।

রাজস্বের উৎস : ৫ হ্যরত উমর ফারুক (রা.) এর পূর্বে রাজস্বের উৎস ছিল পাঁচ প্রকার যথা জাকাত, জিয়িয়া, খারাজ বা ভূমিকর, উশর, বাণিজ্য কর, খুমস (গণিয়াত বা যুদ্ধলক্ষ দ্রব্যাদির ১/৫ অংশ) ও আলফাই (রাষ্ট্রীয় ভূমির আয়) খলিফা হ্যরত উমর (রা.) উপরিউক্ত কর ছাড়াও কয়েকটি নতুন কর প্রবর্তন করেন।

যাকাত : যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মৃত এবং সালাতের পরেই এর স্থান। যাকাতের ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে “যে কোনো প্রকারের বহনযোগ্য বা স্থানান্তরযোগ্য মাল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে (নিসাব) পৌছলে এর উপর দেয় করকে যাকাত বলা হয়। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে কেবল সজ্ঞাতিসম্পন্ন মুসলমান প্রজাকে যাকাত দিতে হয়। নবি মুহাম্মদ (স.) এর সময় ঘোড়ার জন্য কোনো যাকাত ছিল না। কারণ ঘোড়ার ব্যবসার প্রচলন ছিল না। হ্যরত উমরের (রা.) সময় ঘোড়ার ব্যবসায় খুব লাভজনক ছিল। তাই তিনি ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করেন এবং এতে প্রচুর অর্থাগম হত।

জিয়িয়া : জিয়িয়া অমুসলমান প্রজাদের নিকট হতে আদায় করা হত। এটি ছিল তাদের জানমালের নিরাপত্তা কর। এ কর পূর্বেও প্রচলিত ছিল কিন্তু খলিফা উমর (রা.) সে করের হার সামান্য পরিবর্তন করেন। তিনি রোমান ও পারসিকদের আর্থিক সচ্ছলতার কথা বিবেচনা করে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির উপর চার, মধ্যবিত্তের উপর দুই ও অল্প আয়ের লোকের উপর এক দিনার হিসেবে এ কর ধার্য করেন।

খারাজ : খারাজ বা ভূমিকর ছিল রাজস্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। হযরত উমর (রা) এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। এসব বিজিত অঞ্চল হতে যে ভূমি রাজস্ব বা খারাজ আদায় করা হতো তাই খারাজ বা ভূমিকর নামে পরিচিত। বিজিত অঞ্চলের মুসলমানদেরকে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং অমুসলমান ক্রমকদেরকে এ কর দিতে হত। জমির গুণগত ঘান, উৎপাদনের পরিমাণ, সেচের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতির প্রক্ষিতে ভূমি করের পরিমাণ নির্ধারণ করা হত। উৎপন্ন শস্যের সর্বোচ্চ ১/২ অংশ এবং সর্বনিম্ন ১/৫ অংশ খারাজ হিসেবে আদায় হত।

উশর : উশর হচ্ছে মুসলিম প্রজার দেয়া ভূমি কর। প্রাকৃতিক পানি সরবরাহ বা বৃষ্টির পানি দ্বারা ভূমি চাষাবাদ হলে সে ক্ষেত্রে উশর ছিল ১/১০ ভাগ এবং জলসেচ বা কৃত্রিম উপায়ে চাষাবাদ করা ভূমির উশর ছিল ১/২০ অংশ।

খুমস : গণিমাত্রে বা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির এক পঞ্চমাংশ কোষাগারে জমা রেখে অবশিষ্ট ৪/৫ অংশ মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত। রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত এ অংশকে (এক পঞ্চমাংশ) খুমস বলা হত। এই অংশ মহানবি (স) এর আত্মীয় স্বজন ও মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাজ সরঞ্জামের জন্য ব্যয় করা হত।

আলফাই : রাজস্বের একটি উৎস ছিল আলফাই। দখলচৃত কিংবা উত্তোধিকারীর সম্পত্তি কিংবা পলাতক দেশত্যাগীর যে সমস্ত জমি মুসলমানদের হাতে এসে পড়ে, তাই আলফাই নামে অভিহিত হয়। এ সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিল রাষ্ট্র। আলফাই হতে রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় হতো। এ আয় খাল খনন, নদীর বাঁধ নির্মাণ, কৃষি উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও পানীয় জলের সুবিধার জন্য ব্যয় করা হতো।

বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা

বায়তুলমালের (রাজকীয় কোষাগার) পূর্ণগঠন হযরত উমর (রা) এর অন্যতম প্রের্ণ কৃতিত্ব। হযরত উমর (রা) এর পূর্বে বায়তুলমালের অস্তিত্ব থাকলেও তখন তা নিয়মিত ও সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত ছিল না। তিনি হযরত ওয়ালিদ বিন হিশামের পরামর্শে একটি কেন্দ্রীয় কোষাগার (বায়তুলমাল) প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে প্রদেশগুলোতেও একটি করে কোষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যের রাজস্ব সংগৃহীত হয়ে বায়তুলমালে জমা হত। ‘বায়তুলমাল’ ছিল জনসাধারণের সম্পত্তি এবং এতে খলিফার কোনো অধিকার ছিল না। তিনি ছিলেন এর রক্ষক মাত্র। শাসন কাজের সাধারণ খরচ ও সামরিক খাতে ব্যয়ের পরে যে অর্থ উদ্ধৃত থাকত তা রাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত।

দিওয়ান উল খারাজ : মহামতি খলিফা হযরত উমর (রা) রাজস্বের সুপরিকল্পিত পদ্ধতি প্রণয়ন এবং বৃহত্তর জনসম্মতির মজাল সাধনের জন্য দিওয়ান উল-খারাজ (রাজস্ব বিভাগ) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজস্ব বিভাগই সংক্ষেপে “উমরের দিওয়ান” নামে পরিচিত। হযরত মুহাম্মদ (স) ও খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর শাসন কাল পর্যন্ত অর্থদণ্ডেরকে বায়তুলমাল বলা হত। খলিফা উমর (রা) পারসিক কায়দায় এ দণ্ডের নাম রাখেন “দিওয়ান”。 দিওয়ানের প্রধান দায়িত্ব ছিল বায়তুলমালের সঞ্চিত অর্থের সুযম বণ্টন করা। প্রশাসনিক খরচ এবং যুদ্ধ অভিযানের খাতে ব্যয়ের পর যে উদ্ধৃত অর্থ বায়তুলমালে থাকত তা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত। জাতীয় অর্থের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য খলিফা হযরত উমর (রা) সর্বপ্রথম আদমশুমারি প্রচলন করেন। অধ্যাপক পি. কে. হিটি বলেন, “রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ আদমশুমারি”। এই গণনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ইসলামের সেবায় নিয়োজিত প্রত্যেকটি আরব ও মাওয়ালী মুসলমান পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অক্ষম, পজু, দুর্বল, রুগ্ন প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অমুসলমাসনগণও এ ভাতা থেকে বঞ্চিত হত না। ভাতার পরিমাপ তিনটি নীতি দ্বারা নির্ধারিত হত। (১) মহানবি (স.) এর আঙীয়তা, (২) ইসলাম গ্রহণে অগ্রগণ্যতা, (৩) ইসলাম ধর্মের প্রতি সামরিক ও অন্যান্য বেদমত। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর বিধবা পত্নীগণ বার্ষিক ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ দিরহাম ভাতা পেতেন। বদরের যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীরা ৫,০০০ দিরহাম, উহুদের যোদ্ধারা প্রত্যেকে ৪,০০০ দিরহাম, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা এবং রিদ্বা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক যোদ্ধাকে ৩,০০০ দিরহাম, বদর যুদ্ধের পূর্বের মুহাজির ও আনসারদের সভানগণ ও ইরাক এবং সিরিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের প্রত্যেককে ২,০০০ দিরহাম হিসেবে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মক্কার অধিবাসী ও অন্যান্য লোকজন সর্বনিম্ন ২০০ থেকে ৮০০ দিরহাম ভাতা পেতেন।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন খলিফা হ্যরত উমর (রা.) এর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনিই সর্ব প্রথম শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথক করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। প্রত্যেক প্রদেশের বিচার বিভাগের ভার প্রাদেশিক গভর্নরের (ওয়ালি) পরিবর্তে কাজির উপর ন্যান্ত করা হয়। ফলে ওয়ালির কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কাজিগণ স্বাধীনভাবে বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন। কুরআন ও হাদীসে বৃৎপত্তিসম্পন্ন, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এবং সন্তুষ্ট বংশীয় মুসলমানদের মধ্য থেকে কাজি নিযুক্ত করা হত। প্রত্যেক প্রদেশ ও জেলায় একজন করে কাজি নিযুক্ত থাকতেন। অবশ্য বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন খলিফা নিজেই। তিনি কাজিদের বেতন নির্দিষ্ট করে দেন। কাজিগণ উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় তৈরিতে না করে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। মুসলিম আইনের বাইরে অমুসলমানগণ তাদের নিজস্ব আইন কানুনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারত এবং সেসব ক্ষেত্রে তাদের স্ব ধর্মীয় প্রধানগণ তাদের বিচার করতেন।

সামরিক শাসনব্যবস্থা

মুসলিম সম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে একটি সুসংবন্ধ সামরিক ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে খলিফা উমর (রা.) সামরিক বাহিনীকে সুসংহত করার জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেন। সামরিক শাসনের সুবিধার্থে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে নয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করেন। যথাঃ মদিনা, কুফা, বসরা, ফুসতাত, মিসর, দামেস্ক, হিমস, প্যালেস্টাইন ও মসুল। জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রত্যেকটি জেলায় ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনী সর্বাদা প্রস্তুত থাকত। সেনা দক্ষতারের সকল সৈন্যের নামের একটি তালিকা রাখা হত। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন খলিফা নিজেই। প্রত্যেক বাহিনীর অবশ্য নিজস্ব অধিনায়ক ছিল এবং যুদ্ধনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ তারাই করতেন। সৈন্যবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, বাহক সেবক প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। রণক্ষেত্রে তারা অগ্র, মধ্য, পশ্চাত ও দুই পার্শ্ব এরপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে শক্তর মোকাবিলা করত। “আহরা” নামক সংস্থার মাধ্যমে সৈন্যদের রসদ সরবরাহ করা হত। যুদ্ধে সৈন্যরা তরবারী, বর্ণা, বল্লম, তীর, ধনুক, ঢাল, বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত।

পুলিশ ও অপরাধ দমন বিভাগ

হ্যরত উমর (রা.) এর সময় পুলিশ বিভাগ স্থাপিত না হলেও জনশান্তি রক্ষা ও অপরাধ নির্মূলকল্পে দিওয়ান-উল-আহদাস কাজ করত। এর প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল সাহিবুল আহদাস। এর বিভিন্ন কর্মচারিগণ দেশের অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ওজন পরীক্ষাকরণ, মদবিক্রি বন্ধকরণ, চুরি-ডাকাতি নিবারণ ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত থাকতেন।

জনহিতকর কার্যাবলি

হ্যরত উমর (রা) রাজ্যবিজয় ও শাসন সংস্কারের সাথে সাথে নানাবিধি জনহিতকর ও উন্নয়নমূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। নাজরাত ই-নাফিল্লার তত্ত্বাবধায়নে তার খিলাফতকালে অসংখ্য সরকারি ভবন, মসজিদ, খাল সড়ক, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মিত হয়। জলকষ্ট নিবারণ ও ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বসরায় আবু মুসা খাল, পারস্যের সাদ খাল, ইরাকে মাকাল খাল এবং মিসরে আমির্কুল মুয়েনিন খাল খনন করেন। তিনি কাবাগ্ঘের পুনর্নির্মাণ ও মদিনা মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। তাঁর সময় হাজার হাজার নতুন মসজিদ, অসংখ্য দুর্গ ও সেনানিবাস, সরকারি কার্যালয়, ভবনসমূহ, দিওয়ান, বায়তুলমাল, অতিথি ভবন ইত্যাদি স্থাপিত হয়। প্রশস্ত ও দীর্ঘ রাস্তা দ্বারা রাজধানী মদিনাকে দূরবর্তী প্রদেশগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়। এছাড়া তিনি কুফা, বসরা, ফুসতাত, মাসুল প্রভৃতি শহর নির্মাণ করেন।

হ্যরত উমর (রা) এর শাহাদাত বরণ

হ্যরত উমর ফারুক (রা) দশ বছরের অধিককাল গৌরবের সাথে খিলাফতের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পর ৬৪৪ সালে মদিনার মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করার সময় আবু লুলু ফিরোজ নামক এক পারস্যবাসী গোলামের আক্রমণে শাহাদাত বরণ করেন। আবু লুলু কুফার শাসনকর্তা মুঘিরার ভূত্য ছিল। ধারণা করা হয় যে, হরমুজান ও জাফিলা নামক দুজন যুদ্ধবন্দীর যোগসাজসে নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে খিলাফাকে ছুরিকাঘাত করে। আমীর আলীর কথায়, হ্যরত উমরের (রা) মৃত্যু ইসলামের পক্ষে এক বাস্তব বিপদস্বরূপ ছিলো।

হ্যরত উমর (রা) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : হ্যরত উমর (রা) ছিলেন সচ্চরিত্রের সর্বোন্ম আদর্শ। এ অসাধারণ মানুষটির মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়, অনাড়ম্বর জীবন নির্বাহ, ন্যায় পরায়নতা, প্রজাবাঞ্চল্য, পান্তি, তীক্ষ্ণ বিচারবৃদ্ধি প্রভৃতি মানবিক গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার চরিত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মুইর বলেন, “সামান্য কয়েকটি প্রতিতে হ্যরত উমর (রা)-এর চরিত্র অঙ্গন করা যায়। সরলতা ও কর্তব্যপ্রাপ্তি ছিল তাঁর জীবনাদর্শ এবং ন্যায়প্রাণয়তা ও একগ্রহণ ছিল তাঁর শাসনের মূলনীতি।” এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হয়েও হ্যরত উমর (রা) সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন। তাঁর সাদাসিধা জীবনযাপন সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁর না ছিল ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কোন দেহরক্ষীবাহিনী, না ছিল আড়ম্বরপূর্ণ শাহী বালাখানা। হ্যরত উমর (রা) ছিলেন কোমলতা ও কর্তৃতার অঙ্গুত সংযোগ। নিজের চরিত্র সম্বন্ধে উমর (রা) নিজেই বলেছিলেন : আল্লাহর শপথ, আমার দিল খোদার ব্যাপারে যখন নরম হয় তখন পানির ফেলার চেয়েও অধিক নরম ও কোমল হয়ে যায়। আর আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়তের ব্যাপারে যখন শক্ত ও কর্তৃত হয় তখন তা প্রস্তর অপেক্ষা অধিক শক্ত ও দুর্ভেদ্য হয়ে পড়ে।” দরিদ্রের প্রতি তিনি ছিলেন দয়ালু ও সহানুভূতিশীল এবং তাদের মঙ্গলের চিন্তায় তিনি বহু বিনিন্দ্রি রজনী যাপন করেছেন। জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অভাবগ্রস্থদেরকে অর্থ ও খাদ্য সাহায্য করার জন্য তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। কখনও বা প্রসূতির প্রসবযাতনা নিবারনার্থে স্বীয় স্ত্রীকে নিঃসংজ্ঞা বেদুইন মহিলার গৃহে পৌছিয়ে দিয়ে আসতেন। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় নিজের কাঁধে করে খাদ্যের বোৰা বইতেন। বিচারকার্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্তৃত। মদ্যাপনের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শামাকে তিনি নিজ হাতে বেত্রাঘাত করেন। স্বজনপ্রাপ্তি ও পক্ষপাতিত্ব তাকে স্পর্শ করেনি। উচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র সবাই ছিল তার চোখে সমান। অপরাধী প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে পদচূত করতেও তিনি দ্বিবোধ করেননি।

হ্যরত উমর (রা) জ্ঞান চর্চার অনুরাগী ছিলেন। বিদ্বান ও বাগী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। কুরআন ও হাদীসে তাঁর অসাধারণ পাতিত্য ছিল। সামরিক বিজ্ঞান ও কৌশলের দিক দিয়ে তিনি সমগ্র আরবের সুপরিচিত ছিলেন। বম্ভত হ্যরত উমর (রা) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ইসলাম ও রাষ্ট্রের খেদমতে তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই ইসলামের ইতিহাসে হ্যরত উমর (রা) এর স্থান অতি উচ্চে।

কৃতিত্ব ৪ হ্যরত উমর (রা) এর দশ বছরের শাসনকাল ইসলামের ইতিহাসে একটি সোনালী অধ্যায় সূচনা করে। বিজেতা, শাসক, সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও সংগঠক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি সে সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তিদের অন্যতম যারা কেবল জাতির ভবিষ্যতই গড়ে তোলেননি, জাতির নিজস্ব আদর্শও সৃষ্টি করেছেন।

মহানবি (স.) আরবে ইসলামি সাধারণতন্ত্রের সূচনা করেছিলেন। হ্যরত আবুবকর (রা) একে স্বর্ধমত্যাগীদের কবল হতে রক্ষা করেছিলেন এবং হ্যরত উমর (রা) একে একটি সুসংহত ও শক্তিশালী বৃহত্তম সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। সীয় শাসনামলে তিনি প্রবল শক্তিধর পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যকে বিধ্বন্ত করেছিলেন। ফলে তাঁর খিলাফত কালেই মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা পারস্য, সিরিয়া ও মিসর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পারসিক ও রোমানদের উপর মুসলমানদের এই অভিবিত বিজয় হ্যরত উমর (রা) এর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, “হ্যরত উমর (রা) এর গৌরবজ্ঞাল কৃতিত্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল ইসলামের মহাবিজয়গুলি অধ্যাপক পি, কে. হিটিও মন্তব্য করেছেন, আবু বকরের সময় বিশু বিজয়ের উদ্দীপ্ত প্রেরণা ও মরের সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে। শূন্য হতে শূরু করে আরবীয় মুসলিম খিলাফত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। মাত্র দশ বছরের মধ্যে তাঁর অসাধারণ বৃদ্ধিমত্তার গুণে এশিয়ার পারস্য ও সিরিয়া, ইউরোপের রোম বা বাইজান্টাইন, আফ্রিকার মিসর ইসলামের পতাকা তলে এসে পড়ে। এজন্য বিজেতা হিসেবে তিনি কেবল ইসলামের ইতিহাসেই স্থান লাভ করেননি, পৃথিবীর ইতিহাসেও তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে পরিচিত।

সামরিক বিচক্ষনতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা

খলিফা হ্যরত উমর (রা) এর বিজয়কীর্তির মূলে ছিল তাঁর অসাধারণ রন্নেপুণ্য, সামরিক দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা। তিনি অভূতপূর্ব কৌশলে অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল বেদুইনদের যুদ্ধ স্পৃহাকে ইসলামের স্বার্থে নিয়োগ করে তাদেরকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও অস্তিত্ববৰ্তী সমর শক্তিতে পরিণত করেন। একটি সুষ্ঠ সামরিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তিনি সৈনিকদের আভিজাত্য সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। বম্ভত তাঁর অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি অনারব, রোমক ও শ্রিক জাতির জন্য অসংখ্য বীর যোদ্ধাকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত ও সজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে উচ্চুদ্ধ করেছিলেন।

শাসক হিসেবে ৪ ইসলামি সাম্রাজ্যে সুষ্ঠ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হ্যরত উমর (রা) এর একটি অবিসরণীয় কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর শাসনামল (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি:) স্বর্ণযুগ ও মানবতার কল্যাণের যুগ হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছে। তাঁর শাসন ব্যবস্থার মূল নীতি ছিল মানুষের সেবা করা, যার ফলে তাঁর আমলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সুখে শান্তিতে বাস করত। তিনি এমন একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। যার মূলে ছিল শান্তি, সাম্য ও ভাতৃত্ব এক কথায় বিশু মানবের সেবা। বম্ভত শাসক হিসেবে তিনি জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক : হযরত উমর (রা) এর প্রতিষ্ঠিত 'মজলিস-উশ-শুরা' বা উপদেষ্টা পরিষদ আজও বিশ্ব গণতন্ত্রের জয়গাম করছে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন "পরামর্শ ব্যতীত কোনো খিলাফত চলতে পারে না।" তিনি বৈরেতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রকে ঘৃণা করতেন। অতি সামান্য একজন ব্যক্তিও প্রকাশ্যে শাসনব্যবস্থার গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারতেন।

শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ : হযরত উমর (রা) ছিলেন ইসলামের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু ক্ষমতার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। তাই তিনি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার জন্য কেন্দ্র হতে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খলিত শিকলের মতো যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিল। বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, ন্যায় বিচার পেতে হলে বিচার বিভাগকে সাধারণ প্রশাসন হতে পৃথক করতে হবে। এজন্য তিনি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করেছিলেন। বিশেষ ইতিহাসের বিচার বিভাগ পথকীকরণে তাঁকেই পথিকৃৎ বলা হয়।

সরকারি কোষাগার স্থাপন : সরকারি কোষাগার (বায়তুলমাল) স্থাপন হযরত উমর (রা)-এর অক্ষয় কীর্তি। সাম্রাজ্য বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিনি বায়তুলমাল বা সরকারি কোষাগার স্থাপন করেন। জনসাধারণই ছিল এর প্রকৃত মালিক।

আদমশুমারির প্রবর্তন : হযরত উমর (রা) দুর্বল, অসহায়, অনুধ, খোঢ়া, বেকার, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অনাথ প্রমুখের অভাব দূর করার জন্য সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করেন। তার পূর্বে বিশেষ কোথাও এ ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়নি। এ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য তিনি বিশেষ প্রথম আদমশুমারি করে লোক গঠন প্রবর্তন করেন।

সামাজিক সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা : হযরত উমর (রা) সামাজিক সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। বিশ্ব মানবের মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (স) ঘোষণা করেছিলেন। দাস মুক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ। মহানবির এ বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উম্মতদের যার কাছে যত দাস ছিল তারা তা মুক্ত করে দেন। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা) মহানবির (স.) এর এ বাণী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে সমগ্র ইসলামি রাজ্যে দাসত্ব প্রথার বিলোপ সাধনে তৎপর হন। মাওলানা মুহম্মদ আলী বলেন নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে যে, দাসত্ব প্রথা বিলোপের মূলে গৃহীত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হযরত উমর (রা)-এর ব্যবস্থাকে ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। এতে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মাধ্যমে কেবল ইসলামেই নহে, বরং পৃথিবীর ইতিহাসে একজন প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ মদিনার শাসনভাব গ্রহণ করেন।

ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ : হযরত উমর (রা) এর শাসনামল মুসলিম শিক্ষা, কৃষি ও সভ্যতা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ছিল। খলিফা শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। শহর হতে গ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি স্থানে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে প্রতিটি মসজিদ সংলগ্ন স্থানে মন্তব্য স্থান পেল। মসজিদ মন্তব্য নামে পরিচিত মন্তব্যগুলি আজও সারা মুসলিম জাহানের কাছে তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে। উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য তিনি সে যুগের জ্ঞানী গুণীদের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, "মুসলমানগণ কেবল আরবেই নয় সমগ্র বিজিত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এমন সব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, যার দৃষ্টান্ত প্রাচীনকালে অথবা খ্রিস্টান রাজ্যেও পাওয়া যায় না। কুফা, বসরা, ফুসতাত ও মসল প্রভৃতি শহর তাঁর আমলেই নির্মিত হয়েছিল। ইসলামি শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিকাশে ও বিস্তারে এ সকল স্থানের অবদান ছিল অবিসরণীয়। পরবর্তীকালে এসব স্থানে জগদিখ্যাত মনীয়ীগণ শিক্ষা লাভ করেন। যেমন- বসরায় ইমাম বসরী, কুফার ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ প্রযুক্ত। আল্লামা শিবলী নোমানী বলল আমর ইবনুল আল আসের শাসনকালে ফুসতাত, কুফা ও বসরা বিশেষ অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভান্দারের সমৃদ্ধ নগরীতে পরিষত হয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে : হযরত উমর (রা) সমগ্র আরব ও বিজিত দেশকে ১৪ টি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন করে শাসনকর্তা (ওয়ালি) নিযুক্ত করেন। প্রশাসনিক পদ্ধতিতে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। অর্থনৈতিক সচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থার বৈপ্লাবিক সংস্কার সাধন করেন। শরিয়তের কানুন প্রবর্তন, পুলিশবাহিনী গঠন, জেলখানা স্থাপন, হিজারি সন প্রচলন, সীমান্তদুর্গ নির্মাণ, দিওয়ান প্রতিষ্ঠা, কৃষিব্যবস্থা ও চাষীদের অবস্থার উন্নতি বিধান, নারীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কার্যাবলি একজন মহান শাসক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

এভাবে দেখা যায় যে, হযরত উমর (রা.) শুধু তাঁর চারিত্রিক মাধ্যমের জন্য নয়, বিখ্যাত বিজেতা, কৌর্তিমান শাসক ও বৈপ্লাবিক সংস্কারক হিসেবে সমসাময়িক ও পরবর্তী ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। মাত্র ১০ বছরের মধ্যে তাঁর রণনৈপুন্য ও যোগ্যতার জন্য বিশাল পরাক্রমশালী রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল বিজেতা হিসেবে। তিনি বীর আলেকজান্ডারের সাথে সুবিচারক হিসেবে ইরানের বাদশাহ নওশেরওয়ানের সাথে ও হাদীস বিশারদ হিসেবে হযরত আবু হুয়ায়রা (রা.) এর সাথে তুলনীয়। তার শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। বহুমুখী প্রতিভা ও অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি সর্বকালের ইতিহাসে চির অঘ্যান হয়ে রয়েছেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) এর জীবনী

প্রথম জীবন : ইসলামের ইতিহাসে প্রতিথ্যশা মহাবীর হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) মকায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি অন্যান্য কুরাইশদের ন্যায় ইসলামের একজন ধোরতর শত্রু ছিলেন। অসাধারণ দৈহিক শক্তি ও শৈর্য-বীর্যের জন্য তিনি মকায় সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর সৈন্য পরিচালনায় ক্ষিপ্রতা ও আক্রমণের তীব্রতায় শক্রপক্ষ বেশিক্ষণ সমরক্ষেত্রে টিকতে পারত না। উভদের যুদ্ধের সময় তিনি কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এবং তার অসীম রণচাতুর্যের ফলে মুসলমানগণ বিজয়লাভের মুখে এসেও অবশ্যে সাময়িক পরাজয় বরণ করেন। এসময় হতে মহানবি (স.) তাঁর উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদায়বিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের পর তিনি আমর ইবন আল আসের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর ইসলামের সেবায় তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন।

মহানবি (স.) এর সময় ইসলামের খেদমত : তাবুক অভিযানে মহানবি (স.) হযরত খালিদকে সিপাহসালার মনোনীত করেন। এ অভিযানের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানগণ ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখিন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে হযরত খালিদ (রা.) শত্রুব্যহ ভেদ করে অমিত বিক্রিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়লাভ করেন। মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে রাসুলুল্লাহ (স.) বিজয়ী খালিদকে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর অসি উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর তিনি বিনা রন্ধনাতে হারিস গোত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। মহানবি (স.) এর সময় আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেন।

রিদ্বার যুদ্ধে তাঁর অবদান : হযরত আবুবকর (রা.) এর খিলাফতে যে ভঙ্গনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ সংঘ উপর্যুক্তকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল তা প্রধানত হযরত খালিদের সামরিক তৎপরতায় নির্বাপিত হয়। হযরত ইকবামা ও হযরত সুরাহবিলের ন্যায় সেনাধ্যক্ষগণ মুসায়লামাকে পর্যন্ত করতে ব্যর্থ হলেও হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) সমর্থ হন। এছাড়া তোলায়হা, আসওয়াদ ও সাজাহকে বশীভূত করে তিনি আরবদেশে ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেন। ফল ক্রেমারের মতে খালিদের দুঃসাহসিকতা ও আবুবকরের বিজ্ঞতা না থাকলে সেই দিন ইসলামের শত্রুপক্ষ জয়লাভ করত।

পারস্য অভিযানে তাঁর ভূমিকা : হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এর প্রকৃত বীরত্বের প্রকাশ ঘটে পারসিক ও রোমকদের সাথে সংঘটিত ভয়াবহ যুদ্ধসমূহে। রিদ্বার যুদ্ধের অন্তিকাল পরে হযরত আবু বকর (রা) সেনাপতি হযরত মুসাল্লাকে পারসিকদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। ৬৩৩ খ্রিঃ যুদ্ধের গতি বেশি প্রসার লাভ করলে খলিফা দশ হাজার সৈন্যসহ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে পারস্যে প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রা) মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে উলিসের যুদ্ধে হীরারাজ্য জয় করেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে তিনি সিরিয়া গমন করেন।

রোমানদের সাথে সংঘর্ষে তাঁর ভূমিকা : রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়া অভিযান হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের অবিসরণীয় কীর্তি। ৬৩৪ খ্রি. আজনাদাইনের যুদ্ধে রোমানদেরকে পরাস্ত করে তিনি একে একে দামেস্ক, জর্দান, হিমস প্রভৃতি অঞ্চল ইসলামী সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। হযরত আবু বকর (রা) এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের গতি আরও জোরদার করেন। ৬৩৬ খ্রি. সংঘটিত ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি রোমান বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। রোমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের এটি ছিল চূড়ান্ত পরাজয়। এ যুদ্ধে তিনি যে শৌর্য-বীর্য, রণকৌশল ও দৃঢ়সাহসিকতার পরিচয় দেন এতে তিনি নিঃসন্দেহে সিজার, হানিবল, নেপোলিয়ান, প্রভৃতি বীর চরিত্রের সাথে তুলনীয়। সিরিয়া বিজয়ের পর তিনি দামেস্কের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন।

অন্যান্য গুণবলি : শাসক হিসেবেও তিনি সাফল্যের পরিচয় দেন। তাঁর শাসনব্যবস্থার ফলে নববিজিত সিরীয় অঞ্চলসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি ও অশান্তি উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তবে তুলনামূলকভাবে রণাঙ্গনেই ছিল তাঁর প্রকৃত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র। উহুদের যুদ্ধ হতে শুরু করে জীবনে কোনো যুদ্ধেই তিনি পরাজয় বরণ করেননি বা হীনতাজনক সন্ধি স্বাক্ষর করেননি। তাঁর মধ্যে মানবিক গুণেরও অভাব ছিল না। সাহিত্য ও গঠনমূলক কার্যের প্রতি তাঁর প্রশংসনীয় অনুরাগ ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রার্থনিক জীবন : খুলাফায়ে রাশেদিনের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা)। তিনি কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা উমাইয়া গোত্রে ৫৭৩ (মতান্তরে ৫৭৫) খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উসমান (রা) এর পঞ্চম পুরুষ আবদে মানাফের স্তরে রাসূল (স.) এর বংশের সাথে মিলিত হয়। তার পিতার নাম আফফান এবং মাতার নাম আরওয়া। হযরত উসমানের পারিবারিক নাম ছিল আবুল্লাহ ও আবু উমর। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দু কন্যা হযরত রুক্মাইয়া ও হযরত উমে কুলসুমকে (রুক্মাইয়র মৃত্যুর পর) তিনি বিয়ে করেছেন বলে তাঁকে ‘যুন নুরাইন’ (দু জ্যোতির অধিকারী) শ্রেতাব দেওয়া হয়।

হযরত উসমান (রা) এর পরদাদা উমাইয়া ইবনে আবদে শাসম কুরাইশ বংশের সরদারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। জাহিলিয়াতের যুগে তাঁর বংশ খুব ক্ষমতাধর ছিল। পরবর্তী কালে উমাইয়া রাজবংশ তার (উমাইয়ার) নাম অনুসারেই রাখা হয়। মক্কা ও কাবা শরীফের কর্তৃত নিয়ে কুরাইশ বংশ-হাশিমী ও উমাইয়া গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হযরত মুহাম্মদ (স.) হাশিম গোত্রের হওয়ায় উমাইয়া গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন।

হ্যরত উসমান (রা) ছেটবেলায়ই লেখাপড়া শেখেন। কিশোর বয়সে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য তিনি খুবই উন্নতি করেছিলেন। এমনকি তিনি সে সময়ে সেরা ধনী ছিলেন, এজন্য তাঁকে সবাই উসমান গনী (ধনী) বলে ডাকতেন। তিনি ছেটবেলা থেকেই খুব নরম স্বভাবের ছিলেন। সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র-মার্জিত রূচির লোক ছিলেন। দান-খয়রাত ও বদান্যতায় তাঁর সুনাম ছিল প্রচুর।

ইসলাম গ্রহণ : রাসুলে করিম(স.) যখন ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ বছর। একরাতে হ্যরত উসমান (রা) স্বপ্নে যেন কারো আদেশ শুনতে পেলেন। ‘জেগে ওঠ, ওহে ঘুমত ব্যক্তি, মক্কায় আহমদ আগমন করেছেন।’ এ বাণী শুবণে তার অন্তর স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। তিনি দ্রুত রাসুল করিম (স.)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর চাচা ছিলেন ইসলামের ঘোর দুশ্মন এ সংবাদ পেয়ে তাঁকে কঠিন শান্তি দেয়, বেঁধে মারবর করে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের কোনো নড়েচড় হয়নি।

শাহ মঙ্গনুদীন আহমদ নদভী বর্ণনা করেন, “হ্যরত উসমান (রা)-এর বয়স যখন ৩৪ বছর তখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে রাসুল করিম (স.) আবির্ভূত হন। হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর সাথে হ্যরত উসমান (রা)-এর গভীর সম্পর্ক ছিল। হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর দাওয়াতে তাঁর মন ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং রাসুলুল্লাহ (স.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।”

যুনুরাইন উপাধি লাভ : হ্যরত উসমান (রা) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর দু কন্যার পাণি গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর মেয়ে হ্যরত রঞ্জিতকে হ্যরত উসমান (রা)-এর নিকট বিবাহ দেন। তিনি মারা গেলে হ্যরত উসমান (রা) রাসুলুল্লাহ (স.) এর দ্বিতীয় মেয়ে হ্যরত উম্মে কুলুসুমকে বিবাহ করেন বলে তাঁকে ‘যুনুরাইন বা দুটি জ্যোতির অধিকারী খেতাব প্রদান করা হয়। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) হ্যরত উসমান (রা)-কে এত ভালোবাসতেন যে, দ্বিতীয় মেয়ে হ্যরত উম্মে কুলুসুম ইন্তেকাল করলে নবি করিম (স.) বলেন যে, “আমার যদি অন্য একটি কন্যা থাকত, তাহলে আমি তাকেও উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম।”

উসমান (রা.) এর অবদান

প্রথম হিজরতকারী খেতাব শান্ত

ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে লাগল, কফিরগণ শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিরোধিতা শুরু করল। চাচা হাকাম হ্যরত উসমান (রা) কে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগল, সম্মানিত বন্ধু-বাঙ্গব সকলেই ঘৃণা করতে লাগল। যখন শান্তির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন রাসুল (স.) উসমান (রা)-কে তাঁর স্ত্রী হ্যরত রঞ্জিতকাসহ অন্যান্য সাহাবি সহকারে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। হ্যরত উসমান (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরত করে ইসলামের প্রথম হিজরতকারীর সমানে ভূষিত হলেন। তখন ছিল নবুয়তের পঞ্চম বছর। আবিসিনিয়ায় কয়েক বছর অবস্থানের পর কুরাইশদের মিথ্যা খবরে মক্কার অবস্থা সুস্থ মনে করে মক্কায় ফিরে আসেন; কিন্তু এসে ভুল বুদ্ধতে পারলেন। অন্যান্য সাহাবি পুনরায় আবিসিনিয়ায় চলে যান; কিন্তু হ্যরত উসমান (রা) মক্কায়ই অবস্থান করেন। অবশেষে মদিনায় হিজরতকালে রাসুলুল্লাহ (স.) এর আদেশে মদিনা চলে যান।

ওহি লেখক :

হ্যরত উসমান (রা) ছিলেন প্রথম ওহি লেখক। রাসুলগ্লাহ (স.)-এর জীবন্দশায় ওহি লেখার দায়িত্ব তাঁর উপরই ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি ওহি লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

কৃপ ক্রয়, মসজিদ সম্পদারণ :

মুহাজিরিন যখন মদিনায় পৌছেন, তখন সেখানের পানির খুব অভাব ছিল। সারা শহরে মাত্র ‘বীরে রূমা’ নামে এক ইতুদির পানযোগ্য একটি কৃপ ছিল। সে এটাকে জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করছিল। মুহাজিরিনদেরও এতদূর ক্ষমতা ছিল না যে, পানি ক্রয় করে পান করবে। হ্যরত উসমান (রা) ১৮ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ঐ কৃপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। সে সময় মসজিদে নববি ছোট ছিল। হ্যরত উসমান (রা) অনেক উচ্চমূল্যে এর সংলগ্ন জমি ক্রয় করলেন এবং সে অংশ রাসুলগ্লাহ (স.) -এর জীবন্দশায় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ :

বদরের যুদ্ধের সময় যেহেতু স্তৰী হ্যরত রুক্মাইয়া (রা) মারাত্তক রোগাক্রান্ত ছিলেন, তাঁর সেবা করার জন্য রাসুলগ্লাহ (স.) হ্যরত উসমানকে মদিনায় রেখে যান, কিন্তু তাঁকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং গনিমতের অংশও দেওয়া হয়। এভাবে জাতুর রেকার সময় রাসুলগ্লাহ (স.) তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান, তাই তিনি সেই যুদ্ধেও অংশ নিতে পারেননি, এছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধে অর্থ-সম্পদ দানে তিনি সর্বাশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি অর্থ-সম্পদের দ্বারা রাসুলগ্লাহ (স.) -এর অনেক খেদমত করেন। রাসুলগ্লাহ (স.) বলেন, প্রত্যেক নবিরই সাথী থাকে, আমার (বেহেশতে) সাথী হবেন উসমান (রা.) তিরমিয়া।

হুদাইবিয়ার সম্বিধি :

হুদাইবিয়ার সম্বিধির সময় রাসুলগ্লাহ (স.) তাঁকে প্রতিনিধি করে মক্কার কাফিরদের নিকট প্রেরণ করেন। তখন গুজব রাটে যে, মক্কাবাসীর হাতে তিনি শহীদ হয়েছেন। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) হ্যরত উসমান (রা.) পক্ষ হতে নিজের এক হাতের উপর অন্য হাত রেখে শপথ করেন। এ শপথের নাম ‘বাইআতুর রেদওয়ান’। খাইবারের যুদ্ধে তিনি মুসলিম অধিনায়ক ছিলেন।

খলিফা নির্বাচন :

হ্যরত উমর (রা)-এর অতিমাকাল যখন ঘনিয়ে এল, তখন ইসলামি খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সর্বাপেক্ষা উপর্যুক্ত ব্যক্তি পাওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। হ্যরত আবু ওবায়দা (রা.) যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে হয়তো তাঁকেই মনোনীত করা হতো; কিন্তু তিনি ইতোপূর্বে পরলোক গমন করেছেন। হ্যরত আব্দুর রহমান (রা.) অশেষ শুন্ধ্যাভাজন থাকলেও তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। হ্যরত উসমান, হ্যরত আলী, হ্যরত তালহা এবং হ্যরত সাদ ইবনে আবী ওয়াকাস প্রমুখ যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হতে যেকোনো একজনের উপর এ প্রকার কর্তব্যভার অর্পণ করা যেত। হ্যরত উসমান (রা)-এর বয়স ছিল তখন ৭০ বছর। ইসলামের জন্য আর্থিক দান তাঁকে প্রত্যুত্ত গৌরব দান করেছিল। নবিজীর জামাতা ও চাচাত ভাই হ্যরত আলী ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী। জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধিমতা এবং ধর্মজ্ঞানের জন্য তিনি তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের গৌরবের বস্তু ছিলেন। তিনি প্রথিতযশা পদ্ধিতও ছিলেন। ইসলামের জন্য হ্যরত তালহা ও হ্যরত জুবায়ের (রা.) এর দানও ছিল অসামান্য। পারস্য বিজয়ী হ্যরত সাদও (রা.) একজন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। এরপে দেখা যায় যে, ইসলামের খেদমতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের অবদান প্রশংসনযোগ্য। তাঁদের মধ্য হতে কোনো একজনের ওপর দায়িত্ব অর্পন করা যেতো।

যখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল, তখন হ্যরত উমর (রা.) ইসলামি খিলাফতের খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারটি হ্যরত উসমান, হ্যরত আলী, হ্যরত জুবায়ের, হ্যরত তালহা, হ্যরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হ্যরত আবদুর রহমানকে নিয়ে গঠিত এক নির্বাচনী পরিষদের ওপর ন্যস্ত করলেন। এর থেকে উৎকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট পন্থা আর হতে পারে না। কারণ উক্ত বিষয়টি যদি জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেয়া হত তাহলে গোলমাল ও মতবিরোধের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাঁদের হ্যরত উমরের মৃত্যুর তিনি দিনের মধ্যে মনোনয়ন কার্য সমাধা করতে হবে।

খলিফা হ্যরত উমর (রা.) এ মৃত্যুর পর নির্বাচনী পরিষদের পাঁচ জন সভ্য রাজধানী মদিনাতে উপস্থিত থেকে নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনা যখন চরম পর্যায়ে পৌছল তখন এই অস্তীতিকর ও সংকটজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার জন্য হ্যরত আব্দুর রহমান (রা.) খিলাফতের দাবি ত্যাগ করলেন। হ্যরত আলী (রা.) ব্যতীত নির্বাচনী পরিষদের অন্যান্য সকল সভ্যই তার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে হ্যরত আলী (রা.) ও হ্যরত আবদুর রহমান (রা.) কে খলিফা নির্বাচনের সম্মতি দেন। তদুত্তরে হ্যরত আবদুর রহমান বললেন যে, যদি তিনি তাঁর নির্বাচন মেনে নেয়, তাহলে তিনি তাঁর মতামত গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন। পরিশেষে হ্যরত আলী (রা.) সম্মত হলেন। সমগ্র ব্যাপারটি এখন হ্যরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর আয়তাধীন আসল।

হ্যরত আব্দুর রহমান (রা.) সেদিন বিনিদ্র রজনী যাপন করে নির্বাচনকারী প্রতিটি লোকের গৃহে গমন করলেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করলেন। তিনি দেখলেন যে, অধিকাংশ নির্বাচকমণ্ডলী হ্যরত উসমান (রা.) এর অনুকূলে। সবশেষে হ্যরত উসমান (রা.) খিলাফতের দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত ও অভিষিক্ত হলেন। সকলে তার নিকট আনুগত্যের শপথ করলেন। এ সময় হ্যরত তালহা (রা.) রাজধানী মদিনাতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মনোনয় ফিরে আসলে হ্যরত উসমান (রা.) তার নিকট নির্বাচন সমষ্টীয় সমন্বয় কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, হ্যরত তালহা (রা.) যদি মনোনয়নের বিরোধিতা করেন, তাহলে তিনি তা প্রত্যাহার করতে রাজি আছেন। হ্যরত তালহা (রা.) যখন শুনলেন যে, সকলেই হ্যরত উসমান (রা.) কে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন তিনিও তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন ইসলামে ফেতনা সৃষ্টি হোক তা আমি চাই না।

হ্যরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তার পর্যালোচনা

হ্যরত উসমান (রা.) ১২ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। এর মধ্যে প্রথম ৬ বছর খুবই শান্ত-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার মধ্যে চলছিল। এ সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের বেশ বিস্তার ঘটেছিল। তাঁর এ সময়কার শাসনকাল গৌরবময় ছিল। রাজ্য-বিস্তার, আর্থিক প্রাচুর্য, কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি দেশে সুখ সমৃদ্ধি এনেছিল। এ সময় বেশ কিছু বিজয় অর্জিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে অনেক সোনালি গৌরব অর্জিত হয়। মক্কা থেকে কাবুল পর্যন্ত ইসলামের পতাকা উঠতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইয়াহুদি চক্রের প্ররোচনায় এ সময় কুচকু মহল নিরাপরাধ খলিফার বিরুদ্ধে কিছু অমূলক অভিযোগ এনে দেশের মধ্যে অরাজকতা ও বিশ্বাস্থলা সৃষ্টি করে। অবশেষে তাঁকে নির্মতাবে শহীদ করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম গৃহ্যমুদ্র এবং বিদ্রোহী কর্তৃক একজন খলিফার প্রথম মর্মাত্তিক প্রাণবাশ। তাঁর শাহাদাতে ইসলামি দুনিয়ার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে যার জের এখন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

অভিযোগসমূহ ৪

হ্যরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয়, তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কোনোটাতেই পাওয়া যায় না। যে সকল অমূলক অভিযোগের কারণে তাঁকে জীবন দিতে হল, তা হচ্ছে :

১. যোগ্য ও অভিজ্ঞ শাসনকর্তাদের পরিবর্তে অনভিজ্ঞ আত্মীয়-স্বজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ তথা স্বজনপ্রীতি।
২. আত্মীয়-স্বজনদের বাইতুল মাল হতে অর্থ প্রদান তথা বাইতুল মালের অর্থ অপচয়।
৩. চারণ ভূমি ব্যক্তিগত ব্যবহার।
৪. বিশিষ্ট সাহাবি হ্যরত আবুজার-আল-গিফারী (রা.) কে নির্বাসন।
৫. কুরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ।
৬. কা'বা শরীফের সম্প্রসারণ।
৭. কারো কারো ভাতা বন্ধ।

অভিযোগসমূহের স্বরূপ পর্যালোচনা ৪

নিরপেক্ষ আলোচনায় হ্যরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত এ সমস্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। যেমনঃ-

স্বজনপ্রীতি ৪

হ্যরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে তিনি নাকি প্রশাসনে নিরপেক্ষতা বর্জন করে ‘স্বজনপ্রীতি’ করেছেন। তিনি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট সাহাবিদের অপসারণ করে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও নিজ বৎশের অনভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ দান করেন। প্রকৃতপক্ষে এ অভিযোগ ঠিক নয়। হ্যরত উসমান (রা.) এমন কিছু যোগ্য লোক বেছে নিয়েছিলেন রাস্ত পরিচালনায় যাঁদের অবদান প্রয়োজন ছিল। ঘটনাক্রমে এ সকল লোক তাঁর আত্মীয় হয়ে যাওয়াতে একটি মহল স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনে। আসলে আত্মীয় হলেও তিনি কাউকেও অন্যায়ভাবে অগ্রাধিকার বা শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে রেহাই দেননি। অভিযোগ করা হয় যে, হ্যরত উসমান (রা.) পূর্ব নির্বাচিত যোগ্য প্রাদেশিক গভর্নরদের অনেককে অপসারণ করে স্বজনপ্রীতির বশে স্বীয় অযোগ্য আত্মীয়দেরকে প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করেন। যেমন হ্যরত উমর (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত পারস্য বিজয়ী হ্যরত সাদ ইবনে আবী ওয়াকাস (রা.)-কে অপসারণ করে তাঁর দুর্ভাই হ্যরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। রাসুলে করিম (স.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবা হ্যরত আবু মুসা আশয়ারী, হ্যরত মুধীরা ইবনে শো'বা, হ্যরত আমর ইবনুল আ'ছ, হ্যরত আম্বার ইবনে ইয়াসার, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হ্যরত আরকাম (রা.)-কে অপসারণ করে স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে প্রাদেশিক গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন।

হ্যরত উসমান (রা.) হ্যরত আবু মুসা আশয়ারীকে কুফা ও বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করার পর ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে মদিমার অধিবাসীগণ তার বিরুদ্ধে কুরাইশদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ করলে খলিফা তাঁকে অপসারণ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর পিতৃব্য হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর। পারস্যে বিদ্রোহ দমন করে মার্ভ, নিশাপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে তিনি সামরিক দক্ষতা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্থাপন করেন। তাঁর যোগ্যতা, কর্তব্যনির্ণয় ও বিচার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে খলিফা তাঁকে গভর্নরের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করেন। মিসর বিজয়ী হ্যরত আমর ইবনুল আস (রা.)

হয়রত উমর (রা)-এর শাসনকালেই মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং হয়রত উসমানের খিলাফতের চতুর্থ বছর পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু মিসরের রাজস্ব সচিব হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবি সাদ-এর সাথে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় খলিফা হয়রত আমরকে অপসারণ করেন। তার স্থানে পালিত ভাই হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে সাদকে নিযুক্ত করেন। তাঁর দক্ষতা ও বীরত্বপূর্ণ অভিযান ইসলামের আধিপত্যকে উত্তর আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তিনি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করে বহু অঞ্চল জয় করেছিলেন।

হয়রত আমার ইবনে ইয়াসার (রা) কে হয়রত উসমান (রা) অপসারণ করেননি, তাঁকে হয়রত উমর ফারক (রা)-ই অপসারণ করে গিয়েছিলেন। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের অপসারণকে তাঁর সম্পর্কে হয়রত উসমানের কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির পরিণতি বলে অনেক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এ ভুল বুঝাবুঝির জন্য তাঁর দু একজন উপদেষ্টাই দায়ী বলে মনে করা হয়। বায়তুল মাল পরিচালক হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আরকামকে বার্ধক্যজনিত কারণে অপসারণ করা হয়েছিল।

কাজেই বুঝা যায় হয়রত উসমান (রা) এর মধ্যে স্বজনপ্রীতির প্রভাব ছিল না, স্বজনপ্রীতি থাকলে তিনি হয়রত ওয়ালীদের দোষ চাপা দিয়ে কুফার শাসনকর্তার পদে বহাল রাখতেন। অপর দিকে হয়রত সাঈদ ইবনে আস (রা) খলিফার আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নিষ্পত্তি ছিল। কাজেই স্বজনপ্রীতির অভিযোগ নিতান্তই অমূলক।

হয়রত আবু-জার-আল-গিফারী (রা.) কে নির্বাসন

শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রশ়িল্প যে কথাটি বেশি খ্যাত তা হল হয়রত আবুজর গিফারী (রা) কে দেশান্তর করে দেওয়া হয়েছিল এবং হয়রত আমার ইবনে ইয়াসারের সাথে করা হয়েছিল কঠোর ব্যবহার। এছাড়াও হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর ভাতা বন্ধু করে দেয়া হয়েছিল।

প্রথম ঘটনাটি সত্য নয়। হয়রত গিফারী (রা) কে হয়রত উসমান (রা) দেশ হতে বহিষ্কার করেননি; বরং তিনি নিজেই এক নির্জন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃত বিবরণ এই যে, হয়রত আবু-জার-আল-গিফারী (রা) সম্পদের বৈধ সংরক্ষণের বিরুদ্ধেও বন্ধুতা করতে থাকতেন। এর ফলে শাস্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। এজন্য হয়রত আমীর মোয়াবিয়া হয়রত উসমানকে লিখে পাঠালেন যে, তাঁকে সিরিয়া হতে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হোক। হয়রত উসমান (রা) তাঁকে শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষে নিজের কাছে ডেকে এনে বললেন, আপনি আমার কাছে থাকুন। আপনার যাবতীয় ভরণ-পোষণের ভার আমি বহন করব। কিন্তু তিনি ছিলেন এক স্বনির্ভর বুরুর্গ। কারো দানের প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী ছিলেন না। অতঃপর তিনি মদিনায় একটি নির্জন স্থানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে দু বছর অবস্থান করার পর অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।

হয়রত আমার ইবনে ইয়াসারের সাথেও কোন কঠোরতা অবলম্বন করা হয়নি। তবে যেহেতু তিনি সাবাঙ্গ দলের প্রচারণা দ্বারা প্রত্যাবিত হয়ে পড়েছিলেন, এ কারণে হয়রত উসমান (রা) তাঁকে অবশ্যই অনেক বুঝিয়েছিলেন। আর তাছাড়া এটা কোনো বিশেষ অপরাধের কাজও ছিল না। হয়রত উসমান (রা) রাজনৈতিক কল্যাণার্থে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রকাশ্য বিচার করতেন।

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর ভাতা বন্ধু করার কারণ হচ্ছে যে, হয়রত উসমান (রা) গোটা মুসলিম উমাহকে একই কুরআনের ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধ রাখার জন্য হয়রত আবু বকর (রা) এর যুগের মাসহাফ (রা) পাদ্রুলিপির কপি ব্যৱৃত্ত সকল মাসহাফ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে একটি স্বতন্ত্র মাসহাফ ছিল। হয়রত উসমান তাঁর মাসহাফটিও ঢেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। এ কারণে খলিফাকে কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

মূলত গোটা মুসলিম উম্মাহকে কুরআনের একই কপির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে হ্যরত উসমান (রা) এর এমন অবদান মুসলিম উম্মাহ কখনো ভুলতে পারবে না। ইবনে মাসউদ এর কপিটি তাঁর কাছে যতই প্রিয় থাক না কেন, জাতীয় কল্যাণার্থে হ্যরত উসমান (রা) তাঁর কাছে চেয়েছিলেন। সেদিকে লক্ষ রেখে খিলফার হাতে প্রদান করতে অধীক্ষিত জ্ঞাপন কিছুতেই সজাত ছিল না।

বায়তুল মালের অর্থ অপচয় :

হ্যরত উসমানের বিরক্তে অর্থ অপচয়, আত্মীয়-স্বজনদের অর্থদান ও অমিতব্যয়িতার অভিযোগ করা হয়। যেমন রাসুলগ্লাহ (স.) কর্তৃক তায়েফ- নির্বাসিত হাকাম ইবনুল আসকে মদিনায় আসার অনুমতি দান এবং বায়তুল মাল হতে এক লক্ষ দিরহাম দান। মারওয়ানকে আফ্রিকার মালে গানীমতের এক-পঞ্চাঙ্গ দান, আবদুল্লাহ ইবনে খালেদকে তিন লক্ষ দিরহাম দান এবং নিজের জন্য বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা মূল্যবান অলংকার এবং নিজের জন্য বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি।

বায়তুল মাল আত্মসাত করার কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যে বায়তুল মালের জন্য মহান দানশীল হ্যরত উসমান (রা) অকাতরে নিজের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি বায়তুল মালের সম্পদের প্রতি লোভ করবেন এটা উচ্চট কথা। হ্যরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফত কালেও অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। বায়তুলমাল হতে অর্থ গ্রহণের তাঁর কোনো প্রয়োজনই হত না। বরং তিনি নিজের পাওনাটাও বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিতেন।

হ্যরত উসমান (রা) যেমন সম্পদশালী ছিলেন, তেমন দানশীলও ছিলেন। কাজেই তিনি ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আপন আত্মীয়-স্বজনকে প্রচুর সাহায্য করতেন। তাঁর এ খ্যাতিকে ভিত্তি করেই বিদ্রোহীরা বায়তুল মাল আত্মসাতের অভিযোগ বানিয়ে নেয়। এ ভুল বুঝাবুঝি তাঁর সেই ভাষণ থেকেই দূর্বীভূত হয়ে গিয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন, মানুষ বলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনকে তালোবাসি এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় অংশসমূহ দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে সাহায্য করে থাকি আমার ব্যক্তিগত অর্থ থেকেই।

বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় সংক্রান্ত যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়, তা সম্পূর্ণ বিকৃত তথ্য। প্রকৃত অবস্থায় আপত্তিকর কিছুই নেই। হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে খালিদকেও সেই বার উপটোকন স্বরূপ পঞ্চাঙ্গ হাজার মুদ্রা দেয়া হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষ হতে আপত্তি উঠলে তিনি তা ফেরত নিয়েছিলেন। কাজেই বায়তুল মালের অপচয়ের অভিযোগ চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়।

সরকারি চারণভূমি ব্যবহার :

খিলফা মদিনার চারণভূমি বায়তুল মালের পশুর জন্য নির্ধারণ করে দেন এবং জনসাধারণের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। অভিযোগকারীরা বলে হ্যরত উসমান (রা) এ চারণভূমি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। জান্নাতুল বাকী চারণভূমি সংক্রান্ত ঘটনার মূলকথা হল— কোন কোন চারণভূমি হ্যরত উমর (রা) যুগ হতে বায়তুল মালের গবাদি পশুর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও হ্যরত উসমান (রা) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমি শুধু ঐ সকল চারণভূমিই নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করেছি যেগুলো আমার খিলাফতের অভিযন্ত্র হওয়ার আগে নির্দিষ্ট ছিল। আমার নিকট এ মূহূর্তে দুটি উট ছাড়া আর কিছু নেই। অর্থে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আমি আবেবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উট ও বকরির মালিক ছিলাম। হজের সময়ের জন্য রক্ষিত দুটি উট ছাড়া আমার কাছে আর কোনো উট নেই। কাজেই এ অভিযোগ কতো যে অসত্য তা সহজে বুঝা যায়।

কুরআন শরীফ দক্ষিণ্ত করার কারণ

হযরত উসমান (রা) এর বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে পবিত্র কুরআন দক্ষিণ্ত তার মধ্যে অন্যতম। বিরুদ্ধবাদী স্বার্থান্বেষীগণ এ বলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়াতে থাকে যে, খলিফা হযরত উসমান (রা) আল্লাহর বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন আগুনে পুড়িয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। কুরআন শরীফ ভস্মীভূত করার অভিযোগ সম্পূর্ণরূপেই ভুল ব্যাখ্যা থেকে এসেছে। কেননা হযরত উসমান (রা) কুরআনের নির্ভুলতা রক্ষার্থে সাহাবাদের পরামর্শক্রমেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ভুল কুরআনের পাতুলিপি যেন পৃথিবীতে না থাকে এজন্যই এ কাজটি তিনি করেছেন।

রাসূল (সা.) এর উপর কুরআন একটু একটু করে পূর্ণ ২৩ বছরে অবতীর্ণ হয়, আর ওহি লেখকগণ সাথে সাথেই তা গাছের ছালে, পশুর চামড়ায় এবং পাথরের উপর লিখে রাখতেন। হযরত আবু বকর (রা) তা থেকে সমস্ত কুরআন শরীফ একত্রিত করে রাখেন এবং ইন্তিকালের সময় হযরত হাফসা (রা) এর নিকট রেখে যান। হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা) এর সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সুন্দর আক্রিকা পর্যন্ত পৌছে। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত ছিল, যার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে শব্দের উচ্চারণ পরিলক্ষিত হতে থাকে। আর নব দীক্ষিত অন্যান্য মুসলমানের জন্য ছিল কুরআন পাঠ করা অধিকতর জটিল। খলিফা হযরত উসমান (রা) মহাগ্রন্থ আল কুরআন পাঠের এ জটিলতা, উচ্চারণ ও ভাষার পার্থক্য দ্বারা বিশ্বের সকল মুসলমান যেন একই পাতুলিপি অনুসারে কুরআন পাঠ করতে পারে, এজন্য কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত হাফসা (রা) এর নিকট হতে সর্বাধিক বিশুদ্ধ পাতুলিপি সংগ্রহ করে অনুরূপ আরো ডটি কপি করা হয়। যার ৪টি কপি বসরা, কুফা, দামেস্ক ও মক্কা এ চার প্রদেশে প্রেরণ করা হয় এবং বাকি ২টি কপি মদিনায় রাখা হয়। আর তাছাড়া বাকি যত পাতুলিপি যার যার কাছে ছিল সব পুড়িয়ে দেয়া হয়। কুরআন দক্ষ করার ঘটনা অভিযোগকারীদের জন্য একটি সুযোগ এনে দিয়েছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা) ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষার্থেই এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বস্তুত এটা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ইস্যু তো নয়ই; বরং একটি অবিসরণীয় কৃতিত্ব, যার ফলে বিশ্বের সকল মুসলমান একই ধরনের কুরআন শরীফ পড়েছে।

কাবা শরীফ সম্প্রসারণ

হযরত উমর (রা) কাবা ঘর সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ করেছিলেন এবং ৬৪৭ খ্রি. হযরত উসমান (রা) তা সম্প্রস্ত করেন। এ কাজের জন্য যাদের জমি দখল করা হয়েছিল তারা জমির মূল্য দাবি করে, ইতিপূর্বে যা দাবি করত না। পরে হযরত উসমান (রা) জমির মূল্য দিতে চাইলে মালিকগণ তা নিতে অব্যাকার করে এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু করে। খলিফা বিশৃঙ্খলাকারীদের কারারূদ্ধ করেন। এতে জনগণ অসন্তুষ্ট হন। আর সুযোগ সন্ধানীরা বলে বেড়ায় হযরত উসমান (রা) অন্যায়ভাবে জমি দখল করে নিয়েছেন। কাজেই এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

অভিযোগ অসত্য প্রমাণিত

শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আসতে লাগল, তখন খলিফা অভিযোগকারীদেরকে পরবর্তী হজের সময় তাদের অভিযোগসমূহ নিয়ে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। শাসনকর্তাগণ সকলেই আসলেন। কিন্তু কোন অভিযোগকারী সেখানে উপস্থিত হয়নি। এতে অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণিত হল। তারপর খলিফা এ ধরনের অনিষ্টকর কার্যাবলির অবসান ঘটাবার জন্য শাসনকর্তাদের একটি বৈঠক আহ্বান করেন। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, খলিফা অনিষ্টকর নেতৃবর্গকে কঠোর হাতে

দমন করে বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা) ছিলেন শাস্তিপ্রিয় লোক। তিনি চাইলেন না যে, তাঁর নিজ স্বার্থের জন্য শত শত জীবন বিনষ্ট হোক। এমনকি নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য তাঁর বাসভবনে ঘারবক্ষী বা দেহরক্ষী মোতায়েন করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

উপরের পর্যালোচনায় দেখা যায়, হযরত উসমান (রা) এর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগই ছিল ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। হযরত উসমান (রা)-কে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং ইসলামি সমাজের ক্ষতি সাধন করাই ছিল গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্য। তাই তাদের অধিকাংশ দাবি যেনে নিলেও তারা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। সুতরাং দেখা যায়, খলিফা উসমান (রা) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাঁর হত্যার পেছনে রয়েছে ভিন্ন কারণ।

হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরোক্ষ কারণ

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষ ৬ বছর ছিল সংকটময়। রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অচলাবস্থা ও গোলযোগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। তাঁর বিরোধীরা নানা অজুহাত দেখিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অবশেষে তাঁকে নির্মতাবে হত্যা করা হয়। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকাড় ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা। ঐতিহাসিকগণ হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে সব কারণ চিহ্নিত করেছেন তা হলো-

হযরত উমর (রা)- এর ইন্তিকালের পর মুসলমানদের মধ্যে স্বার্থপরতা, বৈষম্য, গোত্রীয় কোন্দল, ধর্মের প্রতি শৈথিল্যভাব দেখা দেয়। এসবের কারণে হযরত উসমানের খিলাফত কালে নানা রকম অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। যার ফলে ইসলামের মহান তৃতীয় খলিফার কর্ম পরিণতি ঘটে। ঐতিহাসিকগণ পরোক্ষ কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করতে চান। সে গুলো হলো :

১. গণতান্ত্রিক শাসনের অপ্রযুক্তি : হযরত মুহাম্মদ (স) পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ও তা যেনে চলা হতো। এ ব্যবস্থার সুযোগে অবাধ মেলামেশা, বাক-স্বাধীনতা, সমালোচনা পূর্ণ অধিকার তোগ করার ফলে বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতে নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য রাষ্ট্রের সর্বত্র অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

২. আদর্শচূড়ি ও বিজ্ঞ সাহাবিদের অনুপস্থিতি : হযরত উসমান (রা) এর খিলাফত কালের শেষের দিকে বড় বড় বিজ্ঞ সাহাবিগণ ইন্তিকাল করতে থাকেন। সাহাবিদের আদর্শ, ত্যাগ ও চরিত্র সাধারণ মানুষের প্রেরণার উৎস ছিল। বড় বড় সাহাবিগণ প্রথম খলিফা ও দ্বিতীয় খলিফাকে প্রশংসন চালাতে নানাভাবে উপদেশ ও সাহায্য করতেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে হযরত উসমান (রা) এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া যে অল্পসংখ্যক সাহাবি সে সময়ে জীবিত ছিলেন তাঁরাও উসমান (রা) কে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেন নি। স্বার্থবাদীরা সুযোগ খুঁজতে থাকে ক্ষমতা দখল করার জন্য। ফলে বিদ্রোহীদেরকে বাধা দান করার মতো লোকের অভাব ছিল।

৩. হাশেমী ও উমাইয়া ঘৰের পুনরাবৃত্তি : মহানবি (স) এর আবির্ভাবের আগে থেকেই হাশেমী ও উমাইয়া দুর্ব চলছিল। রাসূলের আগমনে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা) এর সময়ে তা তেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু হযরত উসমান (রা) খিলাফতের দায়িত্বে আসার পর কিছু কিছু দুর্বল কারণে উভয় বংশের লোকদের মধ্যে ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও বিদ্রে দেখা দেয়। হযরত উসমান (রা) এর বংশের কেউ কেউ দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত হলে এটাকে স্বজনপ্রীতি বলে অভিযোগ তোলা হয়। এরই সূত্র ধরে পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহীরা হাশেমী ও উমাইয়াদের মধ্যে বিদ্রে ছড়াতে সক্ষম হয়।

৪. কুরাইশ ও অ-কুরাইশদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ৪ ইসলামের বিজয় অভিযানে এবং অন্যান্য সকল কাজে সাধারণ মুসলমানগণ কুরাইশদের সাথে এক সাথে কাজ করে। হয়রত উসমান (রা) হয়রত উমর (রা) এর নীতি পরিবর্তন করে কুরাইশদের আরবের বাইরে বিজিত অঞ্চলে জমি-জমা খরিদ করার সুযোগ দেন। এতে কুরাইশ ও অকুরাইশ জমি মালিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। বসরা ও কৃফায় এ দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা সুযোগ বুঝে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলে। কিন্তু খলিফার সংজ্ঞটজনক সময়ে কুরাইশগণ খলিফাকে ঐক্যবন্ধভাবে সাহায্য করেন নি; বরং হাশেমী গোত্রের অনেকটা অসহযোগিতা বিদ্রোহীদেরকেই উৎসাহিত করে।

৫. অযুসলিয় সম্প্রদায়ে অসঙ্গোষ ৫ ইসলামের উন্নতি ও অগ্রযাত্রায় ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকেরা ভালো ঢাঁকে দেখেননি। পূর্ণ ধর্মীয় ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও এরা সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে। হয়রত উসমান (রা) এর সময়ে তারা বিদ্রোহীদের সাথে মিলে ষড়যষ্ট্রে যোগদান করে।

৬. আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বিভেদ ৬ হয়রত আবু বকর ও হয়রত উমর (রা) এর সময়ে আনসার-মুহাজির নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে ইসলামের খেদমতে অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কোনো বকম বিভেদ দেখা দেয়নি। হয়রত উসমানের সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুহাজিররা অবহেলিত হয় এবং তারা মজলিস উল-খাস-এর সদস্যগণ হতে বঞ্চিত থাকে। এতে তাঁদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

৭. হয়রত উসমান (রা) এর উদারতা ৭ খলিফা হয়রত উসমান (রা) এর উদারতা ও সরলতা তাঁর বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। অনেক সময় ঘোর অপরাধীকেও শান্তি না দিয়ে তিনি ক্ষমা করে দিতেন। এ উদারতার সুযোগে দুষ্কৃতকারীরা বিদ্রোহের সাহস পায়। মানুষকে তিনি অবিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি অপরাধী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শান্তি বিধানে সমর্থ হলে তাঁর এ নির্মম পরিণতি হতো না। ধর্মপরায়ণ ও সংলোক হলেও তিনি খুব নরম চরিত্রের লোক ছিলেন, অনর্থক দুঃখ, কষ্ট ও রক্তক্ষয় তিনি পছন্দ করতেন না। এমনকি বিরোধিদের সাথে কঠোর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নিয়ে সমবোতার মাধ্যমে সবকিছু শীমাংসা করতে চাইতেন। কাজেই তাঁর উদারতার সুযোগ বুঝে বিদ্রোহীরা সর্বত্র বিশ্ঞুলার আগুন জ্বালাতে থাকে। আমীর আলী ও বার্নার্ড লুইস বলেনঃ “তাঁর দুর্বলতা ছিল যে তিনি বিদ্রোহের কারণ অনুধাবন, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিকারে অসমর্থ ছিলেন।”

৮. কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসঙ্গোষ ৮ অবস্থার পরিবর্তন ও কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসঙ্গোষ বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন অন্যান্য দুর্বল আরবদের কাছে ভালো লাগেনি। তাছাড়া হয়রত উসমানের সময়ে বিজয় অভিযান বন্ধ রাখা হয়। যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে তাদের অলসভাবে কাটাতে হয়, যা তারা পছন্দ করত না। এছাড়া যুদ্ধ থাকলে বিজয়ের সাথে সাথে প্রচুর অর্থ-সম্পদ পাওয়া যেত- তাও বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের আয়ের অন্যতম উৎস ‘ফাইভুমি’ হয়রত উমর (রা)-এর সময় রাখ্ত্বায়ত হয়ে যায়। এ কারণে আরব যোদ্ধারা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং ফাইভুমির সমস্ত আয় দাবি করে। হয়রত উসমান (রা) পূর্ববর্তী খলিফার রাজস্ব নীতির গুরুত্পূর্ণ পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু আরব যোদ্ধাদের ঐ দাবি মেনে নিতে পারলেন না। ফলে তাদের অসঙ্গোষ বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। বার্নার্ড লুইস এ ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন যে, “এ বিদ্রোহ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যায়াবরদের বিদ্রোহ, যা কেবল উসমান এর খিলাফতের বিরুদ্ধে নয়, যেকোনো ব্যক্তির পরিচালিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।”

হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যার ঘটনা

গুর্বে উল্লিখিত কারণসমূহে হ্যরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষের দিকে দেশময় গোলযোগ বাঢ়তে থাকে। হ্যরত উসমান (রা.) সমস্ত গভর্নরদের এক পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। মতবিরোধ নিরসনের উপায় বের করাই ছিল এ পরামর্শ সভার মূল লক্ষ্য। গভর্নরগণ সমবেত হন, অধিকাংশ গভর্নরই বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের কথা বলেন। কিন্তু হ্যরত উসমান (রা.) বলেন, এটা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমি যথাসম্ভব কোমলতা ও ক্ষমতাশীলতার সাথে চেষ্টা করব। আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে বলেন— আপনি মদিনা ছেড়ে আমার সাথে সিরিয়া চলুন। অন্যথায় ভয়াবহ বিপদ দেখা দিতে পারে। তিনি জবাব দেন “আমার মাথা কাটা গেলেও আমি প্রিয় নবি (স.)-এর মদিনা ছেড়ে যাব না।” মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী পাঠিয়ে দেই। হ্যরত উসমান (রা.) বলেন, “আমার কাছে নবির প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়াও পছন্দ নয়।” এভাবে তিনি গভর্নরদের বিদায় করে দিলেন।

এদিকে বিদ্রোহীরা ঠিক করে পরামর্শ সভা থেকে গভর্নরা ফিরে এলে তারা তাঁদেরকে প্রদেশসমূহে প্রবেশ করতে দেবে না। এভাবে তারা গণবিদ্রোহ শুরু করবে। তাদের ঘড়্যন্ত সফল হল না। তবে কুফার গভর্নর হ্যরত সাইদ ইবনুল আস (রা.) কে কুফায় প্রবেশ করতে দিল না। হ্যরত উসমান (রা.) কুফা বাসীদের ইচ্ছানুসারে হ্যরত আবু মুসা আশআরীকে কুফায় গভর্নর নিযুক্ত করেন।

গভর্নরদের ফিরে যাওয়ার পর হ্যরত উসমান (রা.) কেন্দ্র থেকে তদন্ত দল প্রত্যেক প্রদেশে পাঠান। মিসর ব্যতীত অন্যসব প্রদেশের তদন্ত রিপোর্ট বিদ্রোহীদের বিপক্ষে গেল। এসময় হঠাতে মিসরের কিছু লোক মদিনায় এসে খলিফার কাছে মিসরের শাসক আবদুল্লাহ ইবনে আবী সাফাহর নির্যাতনের অভিযোগ পেশ করে। হ্যরত উসমান (রা.) মিসরের শাসককে তিরস্কার করে চিঠি লেখেন। এতে ক্ষমা প্রার্থনা বা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়ার পরিবর্তে সে অভিযোগকারীদের নির্মতাবে প্রহার করল। ফলে একজন মারা গেল।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ৬২৬ খ্রিঃ মিসর থেকে প্রায় সাতশ লোক মদিনায় গিয়ে মসজিদে নবাবিতে নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করে। একই সময় বসরা ও কুফার বিদ্রোহীরাও এসে জমায়েত হলো গোলযোগ ব্যাপক আকার ধারণ করে। হ্যরত উসমান (রা.) গোলযোগ নিরসন ও জনগণের যথার্থ অভিযোগের প্রতিবিধান করতে সব সময়ই তৈরি ছিলেন। তিনি এ জনসমাবেশের খবর শুনে হ্যরত আলী (রা.)-কে ডেকে বললেন, আপনি এসব লোককে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিন। আমি তাদের ন্যায় দাবিসমূহ মেনে নিতে প্রস্তুত আছি।

তিনি মিসরের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে পদচুত করে মিসরীয় প্রতিনিধি দলের ইচ্ছানুসারে তার স্থানে হ্যরত মুহম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.)-কে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। এতে বিদ্রোহীরা ফিরে যায়। ঘটনা তদন্তের জন্য মুহাজির ও আনসারদের একটি দলও তাদের সাথে মিসর যাত্রা করে। জুমআর দিন হ্যরত উসমান (রা.) মসজিদে ভাষণ দিলেন এবং বিঞ্চারিতভাবে তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরলেন। লোকজন সবাই আনন্দিত হলো এই ভেবে যে, এখন বিরোধ ও বিপর্যয়ের সমাপ্তি ঘটবে।

মিসরীয় প্রতিনিধি দলটি মদিনা থেকে রওয়ানা হয়ে সবেমাত্র তিন মাহিল পথ এগিয়ে গেছে। এমন সময় দেখা গেল একজন হাবশী দাস উটের পিঠে চড়ে অতি দ্রুত মিসরের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ হওয়ায় তাকে পাকড়াও করা হল। সে বলল আমীরুল মুমিনীন হ্যরত উসমান (রা.) আমাকে মিসরের গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছেন। তার কথায় সন্দেহ দেখা দিল। দেহ তল্লাশি করে তার নিকট হ্যরত উসমানের সীল মোহরকৃত গভর্নর ইবনে আবী সারাহকে দেয়ার জন্য একটি চিঠি পাওয়া গেল। তাতে লেখা ছিল মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করে ফেল। এ চিঠি দেখে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.)

ও অন্যান্যরা উত্তেজিত হয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। হয়রত তালহা, জুবাইর, সাদ ও আলী (রা)-কে ডেকে চিঠি দেখান। তারা সবাই চিঠি, উট ও দাসটিকে নিয়ে হয়রত উসমান (রা)-এর কাছে গেলেন। হয়রত উসমান (রা) কসম (শপথ) করে চিঠি অঙ্কীকার করলেন, পরে জানা গেল, পত্রাদাতা হচ্ছে মারওয়ান। হয়রত উসমান (রা) এর ব্যাপারে সবাই সন্দেহমুক্ত হলেন।

কিন্তু বিদ্রোহিয়া দাবি করে বসল যে, মারওয়ানকে আমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। হয়রত উসমান (রা) তা করতে রাজি হলেন না। এ পরিস্থিতিতে উত্তেজনা বেড়ে চলে। এবার বিদ্রোহিয়া খলীফার অপসারণ দাবি করে বসল, উভরে তিনি বললেন : “আমার মধ্যে জীবন থাকতে আমি আল্লাহর দেয়া খিলাফত নিজ হাতে খুলে ফেলবো না এবং মহানবি (স.) এর অসীয়ত মতো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য অবলম্বন করব।”

এরপর বিদ্রোহীয়া অত্যন্ত কঠোরভাবে হয়রত উসমানের বাসভবন অবরোধ করে রাখল। অবরোধ ৪০ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকল এবং তাঁর বাড়িতে পানি পর্যন্ত পৌছানো নিষেধ করে দেয়া হল। হয়রত আলী (রা) অনেক কষ্টে কয়েকবার পানি পৌছান। হয়রত উসমান (রা) ব্যববার বিদ্রোহীদের বুরানোর চেষ্টা করেন, মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। কিন্তু বিদ্রোহীয়া তাতে কোনো রকম সাড়া দেয়নি। ভক্ত-অনুরক্ত এবং আনসার ও মুহাজিরগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু হয়রত উসমান (রা) তাদেরকে সে অনুমতিও দেননি।

হয়রত আলী, হয়রত তালহা, হয়রত জুবাইর ও হয়রত সাদ (রা) প্রমুখ তাঁদের কর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না। কারণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি নেই তাঁরা তাদেরকে বুরানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু খলিফার পদত্যাগ অথবা মারওয়ানকে হস্তান্তর ছাড়া তারা তাদের স্থান ত্যাগ করতে রাজি হয় নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে হয়রত আলী (রা), হয়রত তালহা (রা), হয়রত জুবাইর (রা) তাদের ছেলেদেরকে সশস্ত্র অবস্থায় হয়রত উসমানের বাড়ি পাহারায় মোতায়েন করেন। প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইমাম হাসান (রা) আঘাতপ্রাপ্ত হলেও আপন জায়গায় অনড় থাকেন। কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলেন না।

বিদ্রোহিয়া দেখলেন, হজ্জের মাঝসূম শেষ হয়েছে। লোকজন শীত্রেই মদিনায় ফিরে আসবে এবং সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তারা সম্মুখের দরজা দিয়ে ঢুকতে না পেরে প্রাচীর টপকিয়ে ছাদে ওঠে হয়রত উসমান (রা)-এর কাছে গিয়ে পৌছে। এদের সামনে ছিল মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর। তিনি হয়রত উসমান (রা)-এর দাড়ি ধরে টান দেন। হয়রত উসমান (রা) বললেন ভাতিজা তোমার পিতা হয়রত আবু বকর (রা) যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে এদৃশ মোটেই পছন্দ করতেন না। একথা শোনামাত্র তিনি ফিরে যান। অন্যরা অগ্রসর হয়ে হামলা চালায়, একজন লোহার খড় ও দ্বিতীয় জন বর্ণ দিয়ে আঘাত করে। তখন তিনি কুরআন শরীর পাঠ করছিলেন। তৃতীয়জন তরবারি দিয়ে আঘাত করে। স্তু হয়রত নামেলা হাত দিয়ে তা ঠেকাতে গেলে তাঁর তিনটি আঙ্গুল কেটে পড়ে যায়। তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে হয়রত উসমান (রা)-এর জীবন প্রদীপ নিন্তে যায়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)

৩৫ হিজরির ১৮ খিলাজ জুমআর দিন আসরের সময় মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন তারিখে হয়রত উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করেন। লাশ দুদিন পর্যন্ত দাফনহীন অবস্থায় পড়ে থাকে, বিদ্রোহীদের ভয়ে কেউ অগ্রসর হওয়ার সাহস করল না। শনিবার রাতে কিছুসংখ্যক মুসলমান জীবন বাজি রেখে জানায় আদায় করে জান্নাতুল বাকির পেছনে তাঁর দেহ মোবারক দাফন করেন। হয়রত উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে একটি বেদনাবিধূর ঘটনা। তাঁর শাহাদাত ইসলামের ইতিহাসে সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এটি একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা এবং তা ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসের ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

খিলাফতের মর্যাদাহানি :

খিলাফত একটি পবিত্র আসন, কিন্তু হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার ফলে খিলাফত ও খলিফার প্রতি জনসাধারণের অকৃষ্ট শুন্ধা ও ভক্তি শিথিল হয়ে যায়। বার্নার্ড জিওস বলেন, “বিদ্রোহী কর্তৃক খলিফার হত্যাতে যে বেদনবিধূর দৃষ্টান্তের সৃষ্টি হয়, তা ইসলামের ঐতিহ্যের প্রতীক, খিলাফতের ধর্মীয় ও নেতৃত্ব মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করেছিল।” নিরন্তর খলিফাকে বিদ্রোহিঠা হত্যা করে খিলাফতের প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করে। খলিফা ও খিলাফতের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি ও শুন্ধা কমে আসে। ঐতিহাসিক খোদাবক্র বলেন, “এ হত্যাকাড় সর্বকালের জন্য খলিফার ব্যক্তিগত পবিত্রতা নষ্ট করে।”

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি :

হযরত উসমান (রা) এর হত্যাকাড়ের ফলে ইসলামের একতা বিনষ্ট হয়। বিভিন্ন কার্যাবলির প্রতিবাদে এবং হত্যার প্রতিবাদে যে সকল মতবাদ ও দল-উপদলের উৎসব হয়, তা পরবর্তীকাল মুসলিম উমাহকে শতধা বিভক্ত করে। মুসলিম জাতি শিয়া, সুন্নি, খারেজি, রাফেজি প্রভৃতি বিভিন্ন ফিরকা বা উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়।

ঝুঁক্য বিনষ্ট :

হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকাড়ের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে ঝুঁক্য, সম্প্রীতি ও সংহতি ছিল, তা বিনষ্ট হতে শুরু করল। এর ফলে ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সূত্রপাত ঘটে। সহনশীলতা ও ধৈর্য পরম্পরারের প্রতি আস্থা ও মমতাবোধ এবং আত্মবোধ বিনষ্ট হতে থাকে। আরব-অনারব, কুরাইশ, অকুরাইশদের বিরোধের জন্য দেয়। এ হত্যাকাড় মকার হাশেমী ও উমাইয়াদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী বিভেদের সৃষ্টি করে। এর ফলে উমাইয়া বংশের সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীরে মুয়াবিয়া মদিনার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত অধীকার করেন। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ ও বিচারের অজুহাতে গৃহযুদ্ধের সূচনা করেন। অবশেষে আমীরে মুয়াবিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

গৃহযুদ্ধের সূচনা

এ হত্যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে নাশকতামূলক অন্তর্দ্বন্দ্বের উৎসব হয়। হযরাত উসমান (রা) এর হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের বিপদ সংকেত। হযরত আলী (রা) এর খিলাফতে যে কয়টি গৃহযুদ্ধ হয় তা এ হত্যাকাড়েরই প্রতিক্রিয়া। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা এবং পতনের পরও এ দলের অবসান হয়নি।

মদিনার প্রাথান্য লোপ :

এরপর থেকে মদিনার প্রাথান্য লোপ পায়। কেননা পরবর্তী খলিফাগণ সুবিধামত রাজধানীকে কৃফা, দামেক, বাগদাদ, কায়রো এবং কর্তোভায় স্থানান্তর করেন। ফলে মদিনার রাজনেতিক মর্যাদা কমে যায়। মদিনা একটি পবিত্র ধর্মীয় নগরী হিসাবে পরিগণিত হয়।

ইসলামি গণতন্ত্রের বিশুষ্টির সূচনা :

হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাড়ের পরবর্তী সময়ে যে সকল রাজনৈতিক হট্টগোল দেখা দেয়, তাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ধীরে ধীরে রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করতে থাকেন এবং হ্যরত আলী (র.) এর খিলাফতের অবসানের সাথে সাথে ইসলামি গণতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং রাজতন্ত্রের উত্থান শুরু হয়।

সামগ্রিক বিবেচনায় হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাড়ের পেছনে কুচক্ষী মহলের কারসাজিই কাজ করেছে। ফলে ইসলামি বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যার খেসারত মুসলমান কখনও শোধ করতে পারে নি।

হ্যরত উসমান (রা.) এর চারিত্র ও কৃতিত্ব

চারিত্র : ইসলাম ও রাসুলের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন হ্যরত উসমান (রা.). তাঁর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মাদর্শের কারণে ইসলামের ইতিহাসে তিনি এক বিশেষ আসন দখল করে আছেন। তিনি ১২ বছর খিলাফত পরিচালনা করে ৮২ বছর বয়সে ১৭ জুন, ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি মধ্যমাকৃতির, শুশ্রাফতিত সুপুরুষ ছিলেন।

মহানবি (স.) এর নিয় সঙ্গী : হ্যরত উসমান (রা.) মহানবি (স.) এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সকল সংকটে ও বিপদে তিনি রাসুলের পাশে ছিলেন।

দানশীল ব্যক্তি : হ্যরত উসমান (রা.) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি অকাতরে অর্থ-সম্পদ দান করেন। এক্ষেত্রে তিনি সর্বকালের বিস্তারণী লোকদের জন্য আদর্শ।

দেশভ্যাগ : ইসলাম গ্রহণ করায় স্বজাতির লোকের সীমাহীন নির্যাতন চালালে তিনি নির্যাতিত বহু সাহাবিকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তারপর মহানবি (স.) এর পূর্বে মদিনায়ও হিজরত করেন।

যুদ্ধ-জিহাদ দান : হ্যরত উসমান (রা.) ইসলামের দুর্দিনে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় অকাতরে দান করতেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি ১০০০ দিরহাম দান করেন। রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এক হাজার উট দান করেন।

মসজিদে নববির সম্প্রসারণ : স্থান সংকুলান না হওয়ার মহানবি (স.) মসজিদে নববির সম্প্রসারণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি মসজিদ সংলগ্ন জমি ক্রয় করে এর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন।

দুর্মিল দাসদের সেবা : তিনি দুর্মিল মানবতার সেবায় অর্থ ব্যয় করতেন। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য বিতরণ করতেন। তিনি মুসলিম দাসদেরকে অত্যাচারী মনিবদের কাছ থেকে ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন।

কুরআন সংকলন : হ্যরত উসমান (রা.)-এর সবচেয়ে বড় অবদান পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ সংকলন। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে বহু অন্যান্য ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়। সেসব জাতির লোকেরা আরবি শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে পারত না। তাহাড়া আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠের অনুমতি থাকায় বিশুদ্ধ কুরআনের বিশুদ্ধ সংকলন করার ব্যবস্থা করেন এবং অধিকরত সাবধনতার জন্য আঞ্চলিক ভাষার কুরআনের পাঠগুলো জ্ঞালিয়ে দেন। এ অমর অবদানের জন্য তাঁকে মুসলিম উমহ ‘জামিউল কুরআন’ বা ‘কুরআন সংকলন কারী’ উপাধিতে ভূষিত করে। হ্যরত উসমান (রা.) ছিলেন ইসলামের জন্য

নিবেদিত প্রাণ। তিনি আজীবন ইসলামের খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এমনকি খিলাফতের শেষের দিকে রাষ্ট্রের সংহতি ও ইসলামি আত্ম অটুট রাখার জন্য নিজের জীবন দান করে গেছেন। জগতের ইতিহাসে এর তুলনা বিরল।

ধর্মনিষ্ঠা ও সততা : হযরত উসমান (রা) ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর সততা, দানশীলতা, ধর্মভীরুতা এবং বিনয়ের জন্য তিনি ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। জন্মগতভাবেই তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। নিরহংকারী, বিনয়ী, আমানতদার, দানশীল হিসেবে তিনি মহানবি (স.) এর প্রিয়পাত্র ছিলেন। মিথ্যা ও পাপাচার হতে তিনি ছিলেন পবিত্র এবং আল্লাহর ভয়ে সবসময় তাঁর ঢাক সজল থাকত। অবসর সময়ে আল্লাহর এবাদাতে মগ্ন থাকতেন।

সহজ-সরল ও দয়ালু মানুষ : তিনি ছিলেন খুব সহজ-সরল দয়ালু মানুষ। তিনি অতিরিক্ত উদার, স্নেহপ্রবণ এবং অমায়িক ছিলেন। এজন্য গুরুতর অপরাধীকেও ক্ষমা করে দিতেন। প্রয়োজনের সময়ে তিনি কারো প্রতি কঠোর হতে পারেন নি। তাঁর সরলতার সুযোগে অসৎ ও দুষ্ট লোকেরা তাদের স্বার্থসিদ্ধ করেছিল। আসলে তাঁর মতো জনদরদী, দীন-দুঃখীর বন্ধু, প্রজাবৎসল শাসক পৃথিবীতে বিরল। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক মহান খলিফা।

নম্র ও তদ্দু : মহানবি (স.) এর একটি বাক্যে হযরত উসমানের চরিত্র চিত্রিত করা যায়। তিনি বলেন, “আমার সাহবিদের মধ্যে উসমান (রা) সবচেয়ে নম্র ও লজ্জাশীল।” বস্তুত হযরত উসমান (রা) এর চরিত্রে বিনয়, ধৈর্য, সততা, সারল্য, সহনশীলতা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, বিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি এত স্থিয় ছিলেন যে, তাঁর দুটি কন্যার ইনতিকালের পরও অপর কোনো কন্যা থাকলে উসমানের সাথে বিয়ে দিতেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী হয়েও তিনি দীন-হীন ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। খলিফা হিসেবে বাইতুল মাল হতে এক কপর্দিকও গ্রহণ করেন নি। ইসলামের উদ্দেশ্যে তাঁর যথাসর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক : রাষ্ট্রের সংহতি অটুট ও মুসলিম আত্ম অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। অন্যের রক্তপাত অপেক্ষা নিজ জীবন কুরবানির মাধ্যমে তিনি যে মহান ত্যাগ ও আত্মাংসর্গের নজীর স্থাপন করেছেন, জগতের ইতিহাসে এর তুলনা বিরল। তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক। তিনি অপরাধীকেও খুব অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন। এ সুযোগে চতুর ও স্বার্থব্রহ্মী মারওয়ান তাঁর খিলাফতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ পায়। মারওয়ানের কুচক্ষণের ফলেই চতুর্দিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তা তিনি কঠোর হস্তে দমন না করে অত্যধিক স্নেহ ও উদারতা প্রদর্শন করেন, যা তাঁর জীবনে চরম দুর্যোগ নিয়ে আসে। কোমল হৃদয়ের অধিকারী হযরত উসমান (রা) এর চরিত্র ছিল অগণিত গুণাবলিতে ভাস্বর।

হ্যরত উসমান (রা.) এর শাসন ব্যবস্থা ও কৃতিত্ব

আমীরূল মুমিনীন হ্যরত উসমান (রা.) খিলাফতের দিক হতে সফল খলিফা ছিলেন। তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে হ্যরত উমর (রা.), এর আমলে বিজিত অনেক অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। হ্যরত উসমান (রা.) তা দ্রুতার সাথে দমন করে বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। তিনি বিরাট নৌ-বহর তৈরি করেন, যার দ্বারা অনেক উপগাঁপ জয় করেন। তিনি বিজিত অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা এমন সুদৃঢ় করেছিলেন যে, মুসলমানদের গৃহবিবাদের সময়ও সেসব অঞ্চল বিদ্রোহ করতে সাহস পায়নি।

সুযোগ্য শাসক : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামি শাসন শুরু হয়। ফারুকে আয়ম (রা.) একে পরিপূর্ণ ও নিয়মতাত্ত্বিক করেন। এ নীতি হ্যরত উসমানের খিলাফতে বহাল ছিল। কিন্তু উমাইয়াদের প্রভাবে তাতে পরিবর্তন ঘটে। মারওয়ান হ্যরত উসমান (রা.) এর নমনীয়তা ও ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে প্রশাসনে পুরোপুরি অবৈধ প্রভাব খাটিয়েছিল। তবুও কোনো ব্যাপারে হ্যরত উসমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি তা তৎক্ষণাত সমাধান দিতে সচেষ্ট হতেন। জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ এবং শাসকদের দোষক্রটি শোধরাবার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন। জনমতের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখতেন।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ : রাষ্ট্রীয় সীমানা বিরাট হওয়ায় প্রদেশগুলোকে শাসনের সুবিধার্থে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। সিরিয়াকে তিনটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করেন। সাইপ্রাস, আরমেনিয়া ও তিব্বরিনাকে ভিন্ন প্রদেশ ঘোষণা করেন। সকল প্রদেশের মধ্যে পাঁচটি ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এগুলোতে সেনাবাহিনীর প্রধান দপ্তর ছিল। অন্যান্য প্রদেশ এদের অধীন ছিল। যদিও সকল প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন গভর্নর (ওয়ালি) থাকতো। কিন্তু বড় পাঁচটি প্রদেশের গভর্নরদের মর্যাদা ছিল গভর্নর জেনারেলের।

সুষ্ঠু বায়তুল মাল ব্যবস্থা : হ্যরত উসমান (রা.) সুষ্ঠু বায়তুল মাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে হ্যরত ওকবা ইবনে আমরকে এর তত্ত্বাবধানে এবং হ্যরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে বিচারপতি (কাজি) নিযুক্ত করেন। এছাড়া শাসকদের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে মোছলেমা এবং হ্যরত উসমান ইবনে যায়েদাকে নিযুক্ত করেন।

পূর্ববর্তী খলিফার নীতি অনুসরণ : হ্যরত উমর (রা.) রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, হ্যরত উসমান (রা.) সেভাবেই রাখেন। বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগগুলোর উৎকর্ষ সাধন করেন। বৃত্তিসমূহ বাড়িয়ে দেয়া হয়। তাঁর সময় দেশে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। সাধারণভাবে জনসাধারণ সুখ-শান্তিতে বসবাস করত।

অনহিতকর কার্যবালী : তাঁর সময় স্থাপত্য শিল্পের অগ্রগতি হয়। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন দফতরের জন্য প্রাসাদ তৈরি করা হয়। জনকল্যাণের জন্য সড়ক, গ্রহ, মসজিদ, মেসাফিরখানা, অতিথি শালা স্থাপন করেন। খায়বারের দিক হতে মাঝে মাঝে জলোচ্ছস আসত, এর ফলে জনসাধারণকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হত। হ্যরত উসমান (রা.) মদিমার কিছু দূরে মাহজুর নামক স্থানে একটি বেড়ীবাঁধ তৈরি করেন। ২৯ হিজরিতে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মসজিদে নববির সম্প্রসারনের কাজ নতুন করে আরম্ভ করেন। আশে পাশের জায়গুলো খরিদ করে দশ মাসের অবিরাম চেফ্টার পর সম্প্রসারণ শেষ করেন।

সামরিক ব্যবস্থা : ৪ সৈন্য বাহিনী সংগঠনে হ্যরত উমর (রা) এর রীতিনীতি বহাল রেখে এর উৎকর্ষ সাধন করেন। সেনাবাহিনীর ব্যারাক সংখ্যা বাড়ানো হয়। যুদ্ধের ঘোড়া, উটের সংখ্যা যখন বেড়ে যায়, তখন তিনি এদের জন্য চারণভূমি সম্প্রসারণ করেন। নৌ-বহরের আবিস্কার হ্যরত উসমান (রা)-এর সময়ই হয়।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার : রাসুলুল্লাহ (স)-এর সহচর এবং প্রতিনিধি হওয়ায় হ্যরত উসমান (রা) এর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যুদ্ধবন্দীদেরকে ইসলাম ও খলিফার গুরুত্ব বর্ণনা করে দীন ইসলামের দাওয়াত দিতেন। হ্যরত উসমান (রা) নিজে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতেন। ইসলামি দর্শন ও চিন্তাধারা বর্ণনা করতেন। তিনি নিজে ব্যবসায়ী হওয়ায় তাঁর অঙ্গ শাস্ত্র বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি হ্যরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে সাথে নিয়ে ইলমে ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন)-কে নিয়মতাত্ত্বিকভাবে বিন্যস্ত করেন।

কুরআন সংকলন : হ্যরত উসমান (রা) এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল কুরআন মজীদকে সকল প্রকার বিকৃতির হাত হতে রক্ষা করা এবং এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার দান। ৩০ হিজরি সনে আজারবাইজান এবং “বাবুল আবওয়াব” বিজয়ের সময় বিভিন্ন দেশের ফৌজ একত্র হয়। তাদের মধ্যে কুরআন পড়া নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। মিসরীয়দের পড়ার রীতি ছিল এক রকম, ইরাকি ও সিরিয়াবাসীদের পড়ার রীতি ছিল অন্য রকম। তাই তাদের মধ্যে কুরআন মজীদে পাঠের রীতি নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এ মত পার্থক্যকারীগণ নিজেদের পড়া শুন্দ এবং অপরের পড়া অশুন্দ ভাবতে থাকেন। হ্যরত হোয়ায়ফা (রা), সাহাবা ক্রেতামের সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধিকে আকবর (রা) এর সময়কার লিখিত সংকলনটি এনে হ্যরত জায়েদ ইবনে সাবিত এবং হ্যরত সায়দ ইবনে আ'ছ (রা) এর দ্বারা এর আট কপি করে বিভিন্ন ইসলামি দেশে পাঠিয়ে দেন। এভাবে বিশুন্দ সংকলনটি বিভিন্ন দেশে ও শহরে প্রচার করা হয়, সাথে সাথে হ্যরত উসমান (রা) এর নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, যারা নিজের উদ্যোগে সংকলন করেছে, তাদের সংকলনগুলো নষ্ট করে দিবে, এ নির্দেশ পুরোপুরি পালিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছদ

হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি:)

প্রথমিক জীবন :

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ৬০০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.) এর চাচা আবু তালিবের পুত্র। তাঁর মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। হযরত আলী (রা.) এর ডাক নাম ছিল আবু তোরাব ও আবুল হাসান।

আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলে মহানবি (সা.) নিজেই আলী (রা.) এর প্রতিগালনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.) কে মহানবি (স.) অত্যন্ত সন্তুষ্ট করতেন। এমনকি নিজের আদরের কণ্যা হযরত ফাতিমা (রা.) কে তিনি আলীর সাথে বিয়ে দেন।

ইসলাম গ্রহণ ও মদিনায় গমন :

রাসূল (স.) এর নবুয়তের শুরুতেই হযরত আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন আলী (রা.) এর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আর্থিকভাবে অসচ্ছল থাকলেও অসি ও মসি দ্বারা ইসলাম সেবা করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, “দীক্ষাকালে তরুণ বয়স হলেও হযরত আলী (রা.) ধর্মপ্রচার অভূতপূর্ব উদ্দীপনা প্রকাশ করেন”। মহানবি (স.) এর সাথে হযরত আলীও কুরাইশদের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হন। বিশেষত মহানবি (স.) যখন মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় চলে যান, তখন তিনি এক মহানবি (স.) এর ঘরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহানবি (স.) এর বিছানায় শায়িত ছিলেন। সকালবেলা হযরত আলী (রা.) কে মহানবির বিছানায় দেখতে পেয়ে কুরাইশগণ বিস্মিত হন। পরিশেষে হযরত আলীও মদিনায় হিজরত করে মহানবির সাথে মিলিত হলেন এবং ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

হযরত আলী (রা.) এর বিবাহ :

মহানবি (স.) হযরত আলী (রা.) এর সাথে তাঁর আদরের কণ্যা হযরত ফাতিমাকে বিয়ে দেন। হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.) এর দাম্পত্য জীবন খুব সুখের ছিল। হযরত ফাতিমা (রা.) এর গর্ভে হাসান, হুসাইন ও মুহসিন নামে তিনটি ছিলে এবং জয়নব ও উম্মে কুলসুম নামে দুটি কন্যা জন্ম নেয়। মুহসিন বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের বংশধরগণ ‘সৈয়দ’ নামে ইতিহাসে পরিচিত। হযরত ফাতেমা (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) অন্যত্র বিয়ে করেন এবং ওই সংসারে আরও কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইসলামের জন্য তাঁর অবদান :

ইসলামের জন্য হজরত আলী (রা.) এর অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর অসীম সাহস, শক্তি ও বীরত্বকে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। রাসূল (স.) এর জীবনের প্রায় সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি তাঁর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেন।

বদরের যুদ্ধে তিনি মহানবি (স.) এর পতাকা বহন করেন। এ যুদ্ধে সম্মুখ সমরে তিনি কুরাইশদের বিখ্যাত বীর আমর ইবন আবুজদকে পরাজিত ও নিহত করেন। এ সময় বীরত্বের জন্য তিনি মহানবি (স.) এর কাছ হতে “জুলফিকার তরবারি” লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি উহুদ, খন্দক, বিশেষত খায়বার যুদ্ধে শক্তুপক্ষকে পরাজিত করে বিখ্যাত কামুস দুর্গ জয় করে অসাধারণ শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেন। তাঁর বীরত্বে ও রণমেশ্যগে সন্তুষ্ট হয়ে মহানবি (স.) তাঁকে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন।

ঐতিহাসিক হুদায়বিয়া সময় তিনি চুক্তি লেখকের দায়িত্ব পালন করেন। মোসাবিজয়ের পর মহানবি (স.) যখন দশ হাজার অনুগামীসহ শহরে প্রবেশ করেন, তখন হয়রত আলী (রা) হয়রত সাদের হাত হতে ইসলামী পতাকা বহন করেন। হুনায়নের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে তাবুক অভিযানের সময় মহানবি (স.) তাঁকে মদিনায় অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু তিনি অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য বড়ই অনুরোধ করতে থাকলে রাসুল (স.) বলেন, “হয়রত হারানের সাথে হয়রত মুসার যেমন সম্পর্ক ঠিক তোমার আমার সেই সম্পর্ক-শুধু পার্থক্য এই যে, আমার পর কোনো নবি নেই।” সুরা তাওবা অবতীর্ণ হলে মহানবি (স.) শত্রুদের নিকট এ সংবাদ জানানোর ভার হয়রত আলীর উপর অর্পণ করেছিলেন। হিজরি দশ সনে তিনি মহানবি (স.) এর নির্দেশে ইয়ামেনে ইসলাম প্রচার করতে যান। তাঁর মাধ্যমেই ইয়ামেনে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে সেখানে বিচারক নিযুক্ত হন।

পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি হয়রত আলী (রা.) এর আনুগত্য

পূর্ববর্তী সমস্ত খলিফার সময়েই তিনি তাঁর যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। খলিফা হয়রত আবু বকর (রা.) এর নির্বাচনের পর তিনি তাঁকে নির্বিধি মেনে নেন এবং বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন। বিশেষত ভন্ড নবিদের আবির্ভাবের ফলে যে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি এদের প্রতিরোধের জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করেন।

হয়রত আবু বকর (রা.) এর মৃত্যুর পর তিনি খলিফা হয়রত উমর (রা.) এর আনুগত্য স্বীকার করলেন। হয়রত আবু বকর ও হয়রত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে তিনি মজলিস-উস-শুরার সদস্য ছিলেন। শাসন সংক্রান্ত অধিকাংশ বিধি-বিধান তাঁর পরামর্শে হয়েছিল। তিনি নিজ কন্যা হয়রত উমেই কুলসুমকে হয়রত উমর (রা.) এর সাথে বিবাহ দেন।

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা নির্বাচনের সময় তিনি হয়রত উসমান (রা.) এর প্রতি সমর্থন জানান। হয়রত উসমান (রা.) গ্রহে শত্রু বেঞ্চিত হলে তিনি পুত্র হয়রত হাসান ও হয়রত হুসাইনকে তাঁর গৃহস্থার পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন। এভাবে খিলাফত লাভের পূর্বে তিনি নানাভাবে ইসলামের সেবা করেন।

হয়রত আলী (রা.) এর খিলাফত শাস্তি : হয়রত উসমান (রা.) এর হত্যার পর খিলাফতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। নতুন খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনো এক্যমত ছিল না। এ সময় মদিনার এক ব্যক্তি হয়রত উসমান (রা.) এর রক্তাঙ্গ জামা ও তাঁর ঢ্বীর কর্তিত আজ্ঞাল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। বিদ্রোহী দলগুলোর মধ্যে মিসরের দলটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। মিসরীয় বিদ্রোহী দলের নেতা আবদুল্লাহ ইবন সাবা খলিফা হিসেবে হয়রত আলী (রা.) এর নাম প্রস্তাব করল। কুফা ও বসরায় বিদ্রোহীগণও হয়রত আলী (রা.) কে খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানাল। কিন্তু হয়রত আলী (রা.) অনীহা প্রকাশ করলেন। তিনি হয়রত তালহা অথবা হয়রত জুবাইয়ের নিকট আনুগত্যের শপথ নেওয়ার প্রস্তাব করলেন। তাঁরা উভয়েই এ ব্যাপারে অসম্মতি জানালেন অবশ্যে মদিনার বিশিষ্ট নাগরিকদের অনুরোধে হয়রত আলী (রা.) ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা এবং সকল নাগরিক তাঁকে খলিফা বলে মেনে নিলেন এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার করলেন।

হ্যরত আলী (রা.) এর অসুবিধাসমূহ :

হ্যরত আলী (রা.) খলিফা হওয়ার পর নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেন। এ সমস্ত সমস্যার মধ্যে হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি, হ্যরত উসমান (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের রাদবদল এবং উমাইয়াগণ কর্তৃক অন্যায়ভাবে দখলকৃত জায়গির ও ভূসম্পত্তি সরকারের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উল্লেখযোগ্য।

হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তিদানের দাবি :

হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যার খবর চারিদিকে পড়লে আরবের সর্বত্র খলিফার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের আওয়াজ ওঠল। হ্যরত তালহা (রা.) ও হ্যরত জুবাইর (রা.) খলিফা হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানের জন্য খলিফা হ্যরত আলী (রা.) কে অনুরোধ জানান। হ্যরত আয়শা (রা.) ও হ্যরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু হ্যরত আলী (রা.) এর পক্ষে তৎক্ষণাত্ত্বে হত্যাকারীদের সন্তুষ্টি করে শাস্তি প্রদান করা সহজ ছিল না। অধিকন্তু খেলাফতের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করা হলে খেলাফতের শাস্তি ও নিরাপত্তা বিস্তৃত হতে পারে মনে করে হ্যরত আলী (রা.) জানালেন যে, রাজ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠার পর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

ব্রহ্মতপক্ষে খলিফা হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ড কেবল কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের কার্য ছিল না যে, সহজেই তাদের সন্তুষ্টি করে শাস্তি বিধান করা যাবে। তিনটি কেন্দ্রের বহুসংখ্যাক লোক এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। সুতরাং সে মুহূর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন তিনি সংগত মনে করলেন না। কিন্তু হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকে কেন্দ্র করেই শেষ পর্যন্ত সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীরে মুয়াবিয়ার সাথে হ্যরত আলী (রা.) এর মোরতর মতানৈক্য দেখা দেয়। এ মতানৈক্যই পরে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পরিবর্তন :

আরবের রাজনৈতিক অঙ্গনের এরূপ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে হ্যরত আলী (রা.) প্রাদেশিক শানকর্তাদের রাদবদল করতে মনস্থ করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ ব্যবস্থায় বিদ্রোহীরা শাসনকর্তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং রাজ্যে শাস্তি ফিরে আসবে। হ্যরত আলীর বক্ষন্দের অনেকেই অস্ত আমীরে মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ না করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কেননা খলিফা হ্যরত উমর (রা.) এর আমল হতে তিনি এ পদে বহাল রয়েছেন। শাসক হিসেবেও তিনি বিচক্ষণ ও যোগ্য ছিলেন। অতএব, হ্যরত আলী (রা.) তাঁর সাথে সম্ভাব ও সৌহার্দ রক্ষা করে চললে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেন। ঐতিহাসিক মুইর বলেন, “খলিফার ঘাতকের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সিরিয়াবাসীকে কাজে লাগালে এবং গোষ্ঠীসমূহের বিদ্রোহ দমন করলেই আলী (রা.) বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন।” কিন্তু হ্যরত আলী (রা.) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি কুফা, বসরা, মিসর ও সিরিয়ার শাসনকর্তাকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন। হ্যরত উসমান বিন হানিফকে তিনি বসরায় হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমিরের স্থলাভিষিক্ত করলেন। হ্যরত আবদুল্লাহ বিন সাঁদের স্থলে হ্যরত কায়েস বিন সাঁকে মিসরে নিয়োগ করা হল। কুফা ও সিরিয়ার শাসনকর্তাগণকেও পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হল। কুফার শাসনকর্তা হ্যরত আবু মুসা পদত্যাগ করতে রাজি হলেন। কিন্তু সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীরে মুয়াবিয়া খলিফার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। ফলে হ্যরত আলী (রা.) ও আমীরে মুয়াবিয়ার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হল।

উমাইয়াদের স্বার্থহানী :

হযরত আলী (রা) উমাইয়াগণ কর্তৃক অন্যায়ভাবে দখলকৃত সরকারি ভূ-সম্পত্তি সরকারের নিকট প্রত্যাপনের নির্দেশ দেন। এর ফলে সিরিয়ার গভর্নর আমীরে মুয়াবিয়া ও অন্যান্য স্বার্থহীনী উমাইয়াদের স্বার্থহানী ঘটে। সুতরাং তারা খলিফার বিরুদ্ধেচারণ শুধু করে।

হযরত আলী (রা) এর সময়ে সংঘটিত গৃহযুদ্ধসমূহ :

খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর হত্যা ইসলামের ইতিহাসে একটি সুপরিকল্পিত ঘটনার একটি মর্মান্তিক পরিণতি। তাঁর খিলাফতকালে রাজনৈতিক কোন্দল, ব্যক্তি-স্বার্থের সংঘাত, গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে অর্তন্ত্বসম্মত সূত্রপাত হয় তা কেবল খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর হত্যায় পরিসমাপ্তি ঘটেনি, এর জের খলিফা হযরত আলী (রা) এর শাসনামলে চলতে থাকে এবং পর পর তিনটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে ইসলামের ঐক্য, সংহতি, নিরাপত্তা ও গৌরবের ইতিহাসকে মান করে দেয়। এগুলো ছিল (ক) উষ্ট্রের যুদ্ধ, (খ) সিফাফিনের যুদ্ধ, (গ) নাহরাওয়ানের যুদ্ধ।

উষ্ট্রের যুদ্ধ ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ :

ইসলামের ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক ঘটনা হল উষ্ট্রের যুদ্ধ। মুসলমানগণ পরম্পরারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্ত উষ্ট্রের যুদ্ধেই প্রথমবার হল। আত্মাতা যুদ্ধের এটাই শেষ নয়, আরম্ভ মাত্র। এরপ রক্তক্ষয়ী অর্তন্ত্বসম্মত ফলে ইসলামের ভিত্তিমূল ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ :

হযরত উসমান (রা) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি : হযরত আলী (রা) কে খলিফা হিসেবে মেনে নিলেও হযরত তালহা ও হযরত জুবাইরের দাবি ছিল যে, খলিফা তাৎক্ষণিকভাবে হযরত উসমান (রা) এর হত্যাকারীদের শান্তি প্রদান করবেন। খলিফা এ ব্যাপারে তাদের আশৃতও করেছিলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা) এর হত্যা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাজ ছিল না। এর সাথে কুফা, বসরা ও মিসরের অনেক স্থানে জড়িত ছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে সনাক্ত করা সম্ভবপ্র ছিল না। তাছাড়া তখনকার পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল জাটিল ও সংকটময়। এমতাবস্থায় খলিফা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন নি। এতে হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা) অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত আলী (রা) এর বিরুদ্ধেচারণ শুরু করেন।

হযরত আয়েশা (রা) এর অসুস্থিতি : মহানবি (স) এর শত্রুগণ ও মুনাফিক প্রকৃতির দুই-একজন মুসলমান যখন হযরত আয়েশা (রা) এর পৃত চরিত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেছিল, তখন রাসুলগ্লাহ (স) এ বিষয়ে হযরত আলী (রা) এর পরামর্শ চাইলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা) এর দাসীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য আল্লাহর রাসুলকে পরামর্শ দেন। অবশেষে ওহী নায়লের মাধ্যমে আল্লাহ হযরত আয়েশা (রা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জানিয়ে দেন। তখন থেকে হযরত আয়েশা (রা) হযরত আলী (রা) এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি হযরত তালহা ও হযরত যুবাইরের দলে যোগ দেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনা

উপর্যুক্ত কারণে হযরত তালহা (রা), হযরত জুবাইর (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) হযরত আলীর প্রতি আনুগত্যের শপথ বিস্তৃত হয়ে একটি জোট গঠন করেন। শিগরিই তাঁরা মক্কা, মদিনা ও ইরাক হতে তিনি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করে বসরা আক্রমণ করেন।

হ্যরত আয়েশা (রা) এর উপস্থিতিতে অধিকাংশ বসরাবাসী হ্যরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করে। বসরার শাসনকর্তা উসমান বিন হানিফ ত্রিশক্তির মোকাবিলা করে পরাজিত ও ধৃত হন। বিজয়ী বাহিনী হ্যরত উসমান (রা) এর হত্যার সাথে জড়িত কতিপয় দুর্ভুতিকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

শাস্তি আলোচনা :

ইতোমধ্যে হ্যরত আলী (রা) বসরার উচ্চুত পরিস্থিতি আয়তে আনার জন্য আমীরে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে সিরিয়ায় অগ্রসর না হয়ে কুফার পথে বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। কুফার শাসনকর্তা হ্যরত আবু মুসা আল-আসয়ারী (রা) বসরা আক্রমণে খলিফাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হলে তিনি পদচুত হলেন। কিন্তু কুফার সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমনে খলিফার বাহিনীর সাথে মিলিত হল। ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে হ্যরত আলী (রা) সৈন্য সমভিব্যবহারে বসরায় উপস্থিত হন। স্বতাব সুলভাবে তিনি বিদ্রোহীদেরকে আত্মকলহ হতে নিবৃত্ত করার জন্য শাস্তিপূর্ণ আলোচনার প্রস্তাব দেন। হ্যরত তালহা (রা) ও হ্যরত যুবাইর (রা) শাস্তি প্রস্তাবে সমত হলেন। কয়েকদিন যাবত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল যে, খলিফা প্রাথমিক বিপর্যয়গুলো কাটিয়ে ওঠে অনতিবিলম্বে হ্যরত উসমান (রা) এর হত্যার সাথে জড়িত অপরাধীদের সমুচিত দণ্ডাবিধান করবেন।

যুদ্ধে হ্যরত আয়েশা (রা) পরাজিত এবং হ্যরত তালহা (রা) ও হ্যরত যুবাইর (রা) নিহত

এরপ অবস্থা যখন শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অনুকূলে তখন খলিফা উসমান (রা) এর হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট কুফা, বসরা ও মিসরীয় বিদ্রোহীগণ উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা যে কোন ছক্ষন দ্বারা শাস্তি আলোচনা বানচাল করতে বন্ধপরিকর হল। অবশেষে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর তারিখে রাত্তির অক্ষকারে আশতার, নাখয়ী ইবন সাওদা প্রমুখ বিদ্রোহী নেতা নগরের উপকর্ত্ত্বে কোরায়বা নামক স্থানে উভয়পক্ষের শিবির আক্রমণ করল। তাই প্রকৃতপক্ষে কোনো পক্ষই জানার সুযোগ পেল না যে কারা প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ইহাই প্রথম যুদ্ধ। উভয় পক্ষই যুদ্ধে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়ল। প্রত্যন্তে হ্যরত আয়েশা (রা) উদ্দে এবং হ্যরত আলী (রা) অশ্বে আরোহণ করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও আয়তে আনার জন্য যুদ্ধেক্ষেত্রে গমন করেন। ইতোমধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে হ্যরত তালহা (রা) ও হ্যরত যুবাইর (রা) শিবিরে প্রত্যাগমনের পথে স্বার্থবন্ধী দুর্ভুতগণ কর্তৃক নিহত হন। হ্যরত আয়েশা (রা) উদ্দের পৃষ্ঠে উপবেশন করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন বলে এ যুদ্ধকে ‘উদ্দের যুদ্ধ’ বলা হয়। যুদ্ধে পরাজিত হলে হ্যরত আলী (রা) তাঁকে সসমানে তাঁর ভাতার তত্ত্বাবধানে মদিনায় প্রেরণ করেন।

উদ্দের যুদ্ধের ফলাফল :

উদ্দের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গৃহযুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ একে অপরের বিরুদ্ধে অন্তর্ধারণ করে রক্তপাতের সূচনা করে এবং যুগ্ম ধরে স্বার্থ-সংঘাত, গোটীয় দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক লিঙ্গ প্রভৃতি কারণে এটা চলতে থাকে। এ যুদ্ধে হ্যরত আয়েশা (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁর নিরাপত্তার জন্য কমপক্ষে ৪,৭০০ সৈন্য হ্যরত তালহা (রা), হ্যরত যুবাইর (রা) এবং অন্যান্য সাহাবিদের মৃত্যু ইসলামের পক্ষে ক্ষতিস্঵রূপ বলে ঘোষণা করলেন। প্রকৃতপক্ষে আয়রত আলী (রা) এ বিজয় হ্যাকারীদেরই বিজয়। কারণ, তাদের উস্কানি ও প্ররোচনায় হ্যরত আলী (রা) ও হ্যরত আয়েশা (রা) এর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়।

উদ্দের যুদ্ধের অন্যতম ফলাফল ছিল এই যে, এর ফলে মক্কা, বসরা ও কুফার মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধের অবসান হয় এবং এতদপ্রলে হয়েরত আলী (রা.) এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হয়েরত আলী (রা.) বিদ্রোহ সমূলে উৎপাদিত করার জন্য প্রশাসনিক পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। কায়েস ইবন-সাদ, সাহল ইবন-হানিফ এবং হয়েরত আবুজাহ ইবন-আবাসকে মিসর, হেজাজ ও বসরায় শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করলেন।

উদ্দের যুদ্ধের পর খলিফা হয়েরত আলী (রা.) এর অন্যতম প্রশাসনিক পদক্ষেপ ছিল মদিনা হতে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর। ইরাকিদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে এবং বিশাল ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে রাজধানী প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে খলিফা ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে কুফাকে রাজধানীর মর্যাদা দান করলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হলে ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল হিসেবে মদিনার গুরুত্ব হ্রাস পেল। ফলে মদিনার জীবিত সাহাবিদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগল। তাঁরা খিলাফতে সক্রিয় অংশগ্রহণ হতে দূরে সরে গোলেন। অপরদিকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে হয়েরত আলী (রা.) এর উদ্দেশ্য সফল হয়েন। কারণ অস্থিরমতিতে, প্রতারক, বড়যন্ত্রকারী কুফাবাসীদের উপর তিনি অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়লে খোলাফায়ে রাশেদীনের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খলিফা হয়েরত আলী (রা.) ও সিরিয়ার আমির মুয়াবিয়ার মধ্যকার সংঘর্ষ

উদ্দের যুদ্ধের পর মক্কা, মদিনা, ইরাক ও মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত এবং সুস্থ হল বটে; কিন্তু এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে খলিফা হয়েরত আলী (রা.) এর সাথে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব ও ভিক্ততা চলছিল। কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করে এবং প্রশাসনিক রদবদল দ্বারা খলিফা আলী (রা.) স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে নির্দেশ দেন। একটি পত্রে খলিফা আলী (রা.) সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়াকে ইসলামের স্বার্থে তাঁর আনুগত্য স্বীকারের আহবান জানান। কিন্তু চক্রত্বকারী ও উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া খলিফার আদেশ অমান্য করেন। উপরন্তু তিনি নিহত খলিফা উসমানের রক্তে রঞ্জিত পোষাক ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তৃত আঙুল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে থাকেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, হয়েরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের বিচার না হলে তিনি খলিফার আনুগত্য স্বীকার করবেন না। এভাবে প্রতিষ্ঠিত খলিফার বিরুদ্ধে তিনি প্রায় ৬০,০০০ সিরীয় সৈন্য গঠন করে হয়েরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সংঘর্ষের কারণ :

খলিফার বক্তব্য স্বীকার এবং শাসনক্ষমতা হস্তান্তরে মুয়াবিয়ার অসম্মতি : মাসুদী, পি, কে হিতি, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, হয়েরত আলী (রা.) খলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই হয়েরত উসমান (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত সকল দুর্নীতিপরায়ণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে অপসারিত করে তাদের স্থলে নিষ্ঠাবান, দক্ষ ও উপর্যুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি মনে করলেন যে, এ নীতি অবলম্বন করলে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষিত হবে। হয়েরত মুঘিবা (রা.) এবং হয়েরত ইবনে আবাস (রা.) তাঁকে একপ দুঃসাহসিক নীতি গ্রহণ না করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খলিফা হয়েরত আলী (রা.) তাঁদের কথার কর্ণপাত করেননি। ফলে সাম্রাজ্যে ঐক্য ও শান্তির পরিবর্তে সমস্যা আরও জটিল হলো। সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ব্যতীত সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ খলিফার আদেশ পালন করেন।

বায়তুলমালের প্রত্যার্পণ :

খলিফা হয়েরত উসমান (রা.) উমাইয়াগণকে যে সমস্ত জায়গির এবং সরকারি ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন হয়েরত আলী (রা.) তৎসমুদয় সরকারকে প্রত্যক্ষণ করার নির্দেশ দিলেন। এতে মুয়াবিয়ার স্বার্থহনি ঘটে। কারণ খলিফা হয়েরত উসমান (রা.) এর

রাজত্বে মুয়াবিয়া এ সমস্ত উৎস হতে অজন্ম ধন-সম্পদ লাভ করে প্রভাব ও প্রতিগতিশালী হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত আর্থিক সুবিধা নষ্ট হওয়ায় উমাইয়াগণ হয়রত আলী (রা) এর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

উমাইয়া ও হাশেমী গোত্রের দ্বন্দ্ব :

কুরাইশ বংশের হাশেমী ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যে কলহ ও বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল তা হয়রত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার তন্তু সম্পর্কে ইঙ্কন যোগাছিল। মুয়াবিয়া কেবল উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন না, তিনি হয়রত উসমান (রা) এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ছিলেন। হয়রত উসমান (রা) এর খিলাফতে তিনি অশেষ ধন-সম্পত্তি ও প্রভূত ক্ষমতা অর্জন করে রাষ্ট্রে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। কিন্তু খলিফা পরিবর্তনের ফলে তিনি কোনোভাবেই তা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই খিলাফতে পুনরায় উমাইয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উমাইয়াগণ ঐক্যবন্ধভাবে মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে খলিফা হয়রত আলী (রা) এর শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে।

মুয়াবিয়ার উচ্চাকাঞ্জকা ও সমর প্রস্তুতি :

মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত ক্ষণতালোভী ও উচ্চাভিলাসী। তিনি হয়রত উসমান (রা) এর হত্যাকে অব্যর্থ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি সাধনে তৎপর ছিলেন। হয়রত আলী (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে মুয়াবিয়া হয়রত উসমান (রা) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। হয়রত আলী (রা) এর পক্ষে হত্যাকারীদের তৎক্ষণাত্ম সন্ত্রাস করে শাস্তি প্রদান করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তাচাড়া খেলাফতের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করলে খিলাফতের শাস্তি ও নিরাপত্তা বিস্তৃত হতে পারে যান করে হয়রত আলী (রা) আপাতত শাস্তি প্রদানে অসমর্থ হলে, মুয়াবিয়া এর বিরুপ ব্যাখ্যা দান করে খলিফার বিরুদ্ধে এই মর্মে অপপ্রচার চালাতে থাকে যে, এ হত্যাকাড়ে খলিফা আলী (রা) পরোক্ষভাবে জড়িত আছে। এই জন্য তিনি শাস্তি প্রদানে কালঙ্কেপণ করেছেন। হয়রত উসমান (রা) এর রক্তাঙ্গ বস্ত্রাদি এবং তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তৃত আজুলী প্রদর্শন করে সিরিয়াবাসীদেরকে হয়রত আলী (রা) এর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলেন। এরপে উভয়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সিক্ষাফিলের যুদ্ধ :

সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার অবাধ্যতা সর্বোপরি যুদ্ধ তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে হয়রত আলী (রা) ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ৫০,০০০ সৈন্যসহ সিরিয়া অভিযুক্ত রওয়ানা হন। এ সংবাদ শুনে মুয়াবিয়াও খলিফাকে বাধা দেওয়ার জন্য ৬০,০০০ সৈন্যসহ ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফিলিন নামক প্রান্তরে উপস্থিত হয়েও মুসলমানদের অনর্থক রক্তপাত এড়ানোর জন্য হয়রত আলী (রা) মুয়াবিয়াকে বশ্যতা স্বীকার করে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় আহবান জানান। কিন্তু মুয়াবিয়ার ও জঙ্গি মনোভাবের পরিবর্তন না হওয়ায় যুদ্ধ অবশ্যমতাবী হয়ে উঠে। এভাবে প্রতি ক্ষেত্রে উত্তৃত্ব হওয়া সত্ত্বেও খলিফা হয়রত আলী (রা) তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেন।

অবশেষে ৬৫৭ খ্রি. ২৬ জুলাই সর্বপ্রথম মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনী আক্রমণ রচনা করে। হয়রত আলী (রা) বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে মুয়াবিয়াকে বিপর্যস্ত করে তুললেন। মুয়াবিয়ার বাহিনী শোচনীয় পরাজয়ের মুখে রণে ভঙ্গ দিতে উদ্যত হলে সুচতুর সেনাপতি ও কুর্তুনীতিবিদ আমর ইবন আল-আসের পরামর্শে মুয়াবিয়ার সৈন্যগণ বর্ণার অগ্রভাগে পরিত্র কুরআন শরীফ বেধে যুদ্ধ বন্ধ করার এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করে।

খলিফা হয়রত আলী (রা) মুয়াবিয়ার এই রাজনৈতিক চালের তাৎপর্য বুঝতে পেরে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু হয়রত আলী (রা)-এর সৈন্যদের মধ্যে যারা হাফিজ-ই-কুরআন ছিলেন, তাঁরা কুরআন শরীফের পবিত্রতা ও সমানার্থে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য হয়রত আলী (রা)-কে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করেন যে, এটি শত্রুদের একটি রাজনৈতিক চালমাত্র। কিন্তু তারা তা বুঝতে চেষ্টা করেনি। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়রত আলী (রা) যুদ্ধ বিরতিতে সায় দেন।

দুমাতুল জন্দলের মীমাংসা (জানুয়ারি, ৬৫৯ খ্রিঃ) :

হয়রত আলী (রা) এর সাথে মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, তাঁরা উভয়ে মধ্যস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত করে বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন। হয়রত আলী (রা) এর পক্ষ হতে কুফার পদচুত গর্ভন্তর সরল মনের হয়রত আবু মুসা আল-আশআরী (রা) এবং মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে ধূর্ত আমর ইবন আল-আস প্রতিনিধি মনোনীত হল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক উভয় সালিশ ৪০০ লোক সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া ও ইলাকের মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হবেন এবং কুরআনের নির্দেশানুসারে বিরোধ মীমাংসা করবেন। যদি তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে না পারেন, তাহলে মীমাংসার দায়িত্ব আটশত লোকের উপর বর্তাবে এবং তাদের ভোটাধিক্যে যে সিদ্ধান্ত হবে তা উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে। এ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর হয়রত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া পর্যায়ক্রমে কুফা ও দামেস্কে চলে যান।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়রত আবু মুসা আল আশআরী ও আমর ইবন আল-আস প্রত্যেকে ৪০০ লোকসহ “দুমাতুল জন্দল” নামক স্থানে হাজির হলেন। মঙ্গা ও মদিনা থেকেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সালিসী মজলিশে উপস্থিত হলেন। প্রকাশ্য সালিসী মজলিশ শুরু হওয়ার পূর্বে হয়রত আবু মুসা ও আমর এর মধ্যে গোপন আলোচনা হল। ধূর্ত আমর সরলমন হয়রত আবু মুসা আল-আশআরীকে বুঝালেন যে, ইসলামের শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে হয়রত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া উভয়কেই অপসারিত করতে হবে এবং তৃতীয় একজনকে খলিফা নিযুক্ত করতে হবে। আরও স্থির হল যে, প্রথমে আবু মুসা হয়রত আলী (রা) এর পদচুতি ঘোষণা করবেন এবং পরে আমর ইবন আল-আস মুয়াবিয়ার পদচুতি ঘোষণা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে হয়রত আবু মুসা বললেন, হয়রত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া খলিফা পদে অনুপযুক্ত বিধায় উভয়কে অপসারণ করা হল। এখন আপনারা নতুন একজনকে মনোনীত করবেন। তিনি আরও বললেন, “আমি আলী (রা)-এর পদচুতির ঘোষণা দিলাম।” তারপর আমর ইবন আল-আস দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনতা! আপনারা আবু মুসার রায় শুনলেন, তিনি তাঁর লোককে পদচুত করেছেন। আমি তা গ্রহণ করলাম এবং মুয়াবিয়াকে সে পদে নিযুক্ত করলাম। এ রায়ে হয়রত আলী (রা)-এর অনুসারীরা বিশ্বৰূপ হয়ে উঠেন, ক্রুদ্ধ মনে তারা কুফায় প্রত্যাবর্তন করল। দুমাতুল জন্দলের সালিসীর রায় হয়রত আলীর জন্য এক মর্মান্তিক ঘটনা। খলিফার সাথে একজন প্রাদেশিক শাসকের খিলাফত ভাগের প্রশ্নাই ওঠে না। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দেয়ার এখতিয়ার জনগণেরই। এতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অধিকার নেই।

দুমাতুল জন্দলের রায়ে তাৎপর্য বিশ্লেষণ :

পক্ষপাতহীন ও আবেগমুক্ত দৃষ্টিকোণ হতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সালিসীর প্রস্তাব, বৈঠক এবং রায় এসবগুলিই নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং ন্যায়সংক্ষাতভাবে খিলাফতে উপবিষ্ট খলিফার স্বার্থের পরিপন্থী। এটি ছিল সুপরিকল্পিত, রাজনৈতিক ভোজবাজি ও নিকৃষ্টতম শর্ত। এটি কীভাবে হয়রত আলী (রা) এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং মুয়াবিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তা নিম্নের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হবে।

(ক) হ্যরত আবু মুসা (রা) বয়োজ্যষ্ঠ হলেও আমরের তুলনায় ছিলেন সৎ, সরল, অকপট, নীতিজ্ঞান সম্পন্ন অপরদিকে আমর ছিলেন ধূর্ত, হঠকারী, বিশ্বাঘাতক ও কপট। এর ফলে হ্যরত আবু মুসা আমরের চক্রান্তের শিকার হন। কারণ আমরই তাঁর নিকট উভয়কে পদচুত করার জন্য প্রস্তাব দেন এবং বয়োজ্যষ্ঠতার দোহাই দিয়ে আমর হ্যরত আবু মুসাকে প্রথমে রায় ঘোষণা করতে বলেন।

(খ) হ্যরত আবু মুসা (রা) খলিফাকে পদচুত করলে হ্যরত আলী (রা)-এর মর্যাদাহনি হয়। কিন্তু এতে মুয়াবিয়ার শক্তি হ্রাস হয়নি। কারণ, মুয়াবিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকায় তাঁকে খিলাফত হতে অপসারিত করার কোন প্রশ্নই আসে না। উপরন্তু; তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ করা হবে, এরপ কোন প্রস্তাব অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। অধ্যাপক পি. কে. হিটি বলেন, “উভয় মধ্যস্থ ব্যক্তি তাঁদের প্রভুদের পদচুত করলে আলী ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। মুয়াবিয়ার পদচুতির জন্য কোন খিলাফত ছিল না। বস্তুত সালিসী তাঁকে আলীর সমকক্ষ করে তোলে এবং হ্যরত আলীকে একজন মিথ্যা দাবিদারের পর্যায়ের নামিয়ে ফেলে।” সুতরাং নির্বাচিত খলিফার সাথে একজন অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তার খিলাফত ভাগের প্রশ্ন শুধু অবাস্তবই নহে, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈধ।

(গ) আমর ও হ্যরত আবু মুসা (রা) উভয়ের সালিশ এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা তাদের প্রভুদের পদচুত করবেন এবং পরবর্তী খলিফা মুসলমানদের একটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সুতরাং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পুনরায় প্রার্থী হতে পারেন না। কিন্তু আমরের ছলচাতুরির ফলে মুসলমানদের একটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচন ছাড়াই খিলাফতে মুয়াবিয়ার কান্নাকি দাবি প্রতিষ্ঠা ছিল সম্পূর্ণ নীতি বহুর্ভূত এবং আইনত অগ্রহণযোগ্য।

(ঘ) সালিসীর মূল বিষয় ছিল মুয়াবিয়া কর্তৃক উত্থাপিত হ্যরত উসমান (রা)-এর হত্যার শাস্তি দাবি এবং হ্যরত আলী (রা) কর্তৃক মুয়াবিয়ার অপসারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আমরের চক্রান্তে রায় প্রদানের ব্যাপারে এ দুটি মূল বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় এবং তদস্থলে হ্যরত আলীর মনোনয়নের প্রকাশ্য সমালোচনা প্রাধান্য পায়।

(ঙ) কুরআনের পাতায় শরবিন্দু করে যুদ্ধ স্থগিত করা হয় সত্য; কিন্তু দুমাতুল জন্দলে আল্লাহর কুরআনকে শপথ ও অনুসরণ করে বিরোধি মীমাংসা করা হয়নি। এ কারণে খলিফা আলী (রা) বিদ্রোহী শাসনকর্তার শর্তা ও কপটতায় বীতশুন্দু হয়ে এ সিদ্ধান্ত মানতে পারেন নি। তিনি ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম জাহানের খলিফার পদে অবিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর নৃশংস হত্যার পর মুয়াবিয়া নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। ক্ষমতালোভী না হলে মুয়াবিয়া ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে মিসর দখল করে চুক্তি মোতাবেক খলিফা আলীর জীবন্দশায় আমর ইবন আল-আসকে মিসরের শাসকর্তা নিযুক্ত করতেন না।

খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

অধ্যাপক পি. কে হিটির মতে খারেজিরা হলেন ইসলামের প্রাচীনতম ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় আবি “খারাজ”। এই ক্রিয়াটি হতে খারেজি এই বিশেষ পদটি উত্তৃত। “খারেজি” শব্দের অর্থ দলত্যাগী। দুমাতুল জন্দলের প্রতারণাপূর্ণ রায়কে অমান্য করে হ্যরত আলী (রা) এর সমর্থক ১২ হাজার সৈন্য দলত্যাগ করে হারঝরা নামক গ্রামে যেয়ে মিলিত হয়েছিল। তারা মানুষের বিচার মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এ আওয়াজ তুলে যে, “লা হুকুমাহ ইল্লা লিল্লাহ” (অর্থাৎ আল্লাহর আইন ছাড়া কোনো আইন নেই।) তাই সিফফানের যুদ্ধের পর দুমাতুল জন্দলের সালিসীর রায়কে অমান্য করে যে দলটি হ্যরত আলী (রা) এর পক্ষ ত্যাগ করে তাদেরকে ইতিহাসে খারেজি বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তারা দল ত্যাগ করে হারঝরা নামক গ্রামে মিলিত হয়েছিল বলে হাবুরীয়া এবং আল্লাহর হুকুমের প্রবক্তা ছিলেন বলে “মুহাকিমা” নামেও পরিচিত।

খারেজি আন্দোলনের সূচনা : নাহরাওয়ানের যুদ্ধ (৬৫৯ খ্রিঃ)

হ্যরত আলী (রা)-এর পক্ষ বর্জন করে খারেজিরা আবদুল্লাহ ইবনে ওহাবকে তাদের নেতা নির্বাচন করে এবং তাঁর নেতৃত্বে নাহরাওয়ানে শিবির স্থাপন করে। সালিসের সিদ্ধান্ত যখন হ্যরত আলী (রা) এর বিরলদেশে যায়, তখন তারা হ্যরত আলীকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অনুরোধ জানায়। হ্যরত আলী (রা) তাদের কথায় রাজি না হওয়ায় তারা খারেজিদের দলে যোগদান করে। হ্যরত আলী (রা) খারেজিদের আন্দোলনের সংবাদ পেয়ে নাহরাওয়ানের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন (৬৫৯ খ্রিঃ)। কিন্তু নহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজি আন্দোলনের চূড়ান্ত অবসান ঘটেনি। তারা রাজ্যের সর্বত্র গোলযোগের বীজ ছড়িয়ে দেয়।

খারেজিদের মতবাদ

রাজনৈতিক মতবাদ :

খারেজিরা পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতির দ্বারা চালিত হত। তাদের মতে, খলিফাকে শোটা মুসলিম সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে। প্রয়োজনবোধে অযোগ্য খলিফাকে অপসারণ করে যোগ্যতর ব্যক্তিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। খলিফার পদ কোনো গোত্র বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যোগ্য ব্যক্তি হলে যেকোনো মুসলমান, খলিফা পদে নির্বাচিত হতে পারবেন। যোগ্যতাই খলিফা নির্বাচনের মাপকাটি, তবে তাঁকে খাঁটি বা প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করত যে, শরীয়া হতে অভিজ্ঞ জনসাধারণ ঐশ্বী আইন কার্যে প্রয়োগ করতে সমর্থ হলে ইমাম বা খলিফার কোনো প্রয়োজন নেই। খারেজিরা হ্যরত আবু বকর (রা) ও হ্যরত উমরকে আইনসংগত খলিফা এবং অন্যান্য খলিফাকে অবৈধ দখলকারী মনে করত।

ধর্মীয় মতবাদ :

খারেজিদের মতবাদ অনুযায়ী যে মুসলমান নিয়মিত নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে না, সে কাফেরদের সমর্পর্যায়ভূত বা ধর্মদ্রোহী এবং তাকে ধর্মদ্রোহিতার জন্য পরিবারবর্গসহ হত্যা করা কর্তব্য। এরূপ লোক খলিফা বা ইমাম হলে তাকে খিলাফত বা ইয়ামতী হতে বাধিত করা হবে। খারেজিরা মনে করে যে, কোনো মুসলমান গুনাহ করে বিনা তওবায় মারা গেলে তার জন্য অনন্তকাল ধরে জাহানামের শাস্তি নির্ধারিত থাকবে। তাদের মতে, একটি অন্যান্য পদক্ষেপ কোনো মুসলমানকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়।

খারেজিরা তাদের দলবহির্ভূত লোকদেরকে কাফের বা ধর্মদ্রোহী মনে করত এবং তাদের ঘোর বিরোধী ছিল। অমুসলমানদের প্রতি তারা খুব উদার ছিল। মাওয়ালীদের (অনাবর মুসলিম) জন্য তাদের সহানুভূতি ছিল এবং তারা তাদেরকে আরব মুসলমানদের সমর্থাদায় উন্নীত করার চেষ্টা করত। খারেজিদের সম্পর্কে খোদাবকস বলেন, “খারেজিরা ছিল ইসলামের বিশুদ্ধতাবাদী- ধর্মের দিক দিয়ে গোড়া এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক।”

বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ :

মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনী মঙ্গা ও মদিনা দখলের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। বসরাবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সেখানকার শাসনকর্তা হ্যরত ইবন আব্বাসের সহকারী জিয়াদ এ বিদ্রোহ কর্তৌর হস্তে দমন করেন। আহওয়াজ ও কিরমানে বিদ্রোহ দেখা দিলে হ্যরত আলী (রা) সে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

হ্যরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে আপোস মীমাংসা :

এরপে খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও অশান্তি দেখা দিলে হ্যরত আলী (রা) পরিহিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি চুক্তি করতে সম্মত হন। সন্ধি অনুযায়ী সিরিয়া ও মিসর মুয়াবিয়ার শাসনাধীনে থাকবে এবং সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ হ্যরত আলী (রা)-এর শাসনে থাকবে। এভাবে খলিফা হ্যরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হ্যরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার প্রতিদ্বিতার ফলাফল :

হ্যরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে যে নীতিগত বিরোধ ও সশন্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয় তার ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। নিঃসন্দেহে এ বিবাদ ইসলামের সংহতি ও সমৃদ্ধির পক্ষে ঘোর অগঙ্গলজনক হয়েছিল।

সাম্রাজ্যের বিভক্তিকরণ সম্বিধি :

দুমার সালিশী এবং খারিজী বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে হ্যরত আলী (রা) মুয়াবিয়ার সাথে ন্যক্তারজনক সম্বিধি সম্পাদন করে খিলাফতকে সংকুচিত করেন। এই সম্বিধির শর্ত অনুসারে সিরিয়া ও মিসরের যাবতীয় কর্তৃত্ব আমীরে মুয়াবিয়ার উপরে ন্যস্ত হয়। সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশে হ্যরত আলী (রা)-এর কর্তৃত্ব বজায় থাকে। ফলে খিলাফতের সংহতি বিনষ্ট হয়।

খিলাফতের মর্যাদা লোপ :

হ্যরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টনের ফলে খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ও বুনিয়াদ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে খলিফা ও খিলাফতের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লোপ পেতে থাকে। এক খলিফার নিয়ন্ত্রণে জাতীয় চেতনা ও ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বৃদ্ধ জনসাধারণের মনে এ যাবত খলিফার কার্যকলাপের প্রতি যে সংশয় ছিল না, তা এখন সূচিত হয়।

খারেজিদের উচ্চব ও নাশকতামূলক তৎপরতা :

হ্যরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইতিহাসে “খারেজি” নামে একটি নতুন ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের উচ্চব হয়। তারা সর্বদা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত থেকে খিলাফতের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। খারেজিরা হ্যরত আলী (রা)-এর খিলাফতের এবং উমাইয়া ও আবুসৌয়া খিলাফতেও অরাজকতা সৃষ্টি করে।

হ্যরত আলী (রা) এর মৃত্যু এবং গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা :

খলিফা হ্যরত আলী (রা) ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে খারেজি সম্প্রদায়ের আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই খিলাফতের অবসান ঘটে এবং মুয়াবিয়া খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে বংশানুকরণিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যে ফাটল ধরে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন, বংশানুকরণে সংঘটিত যে সংঘর্ষসমূহ ইসলামের ভিত্তিমূলকে প্রচড়ভাবে আন্দোলিত ও শক্তিহীন করে তার উৎপত্তি এখানেই নিহিত।

উমাইয়াদের নৃশংস কার্যাবলি ও এর প্রতিক্রিয়া :

হ্যরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পরবর্তীকালে ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা; মারজরাহিতের যুদ্ধ, আরাফাতের যুদ্ধ এবং কারবালার মর্যাদিক হত্যায়জের দ্বারা ইমাম হুসাইন পরিবারের হৃদয়বিদ্যারক পরিসমাপ্তি ঘটে। উমাইয়াদের এ সমস্ত নৃশংস কার্যাবলি মুসলমানদের মনকে গুরুতরভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে। এ সমস্ত নৃশংস কার্যাবলি প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে উমাইয়া বংশের পটভূমি রচনা করেছিল।

হ্যরত আলী (রা.) এর ব্যর্থতার কারণ

রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা :

হ্যরত আলী (রা.) মোন্ডা ও বিদান হিসেবে মুয়াবিয়া অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ হলেও রাজনৈতিবিদ হিসেবে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। শুভাকাঞ্জীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি মুয়াবিয়ার ন্যায় প্রভাবশালী শাসনকর্তাকে অপসারণ করে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার মত বিচক্ষণ ও শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে সৌহার্দ্য রক্ষা করে চললে হ্যরত আলী (রা.) তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দুর্যোগ এড়াতে ও খিলাফতের শক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হতেন। কিন্তু তিনি সিফকীনের যুদ্ধে চৃত্তান্ত জয়লাভের মুহূর্তে যুদ্ধ বর্ণ করে এবং পরবর্তী সময়ে মুয়াবিয়ার সাথে অহেতুক আপোষ মীমাংসা করে নিজের পতনকে ত্বরান্বিত করেন।

হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শান্তি প্রদানে দীর্ঘ সূচীতা :

হ্যরত আলী (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে হ্যরত তালহা, হ্যরত যুবাইর, হ্যরত আয়েশা (রা.) ও মুয়াবিয়া হ্যরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের শান্তি প্রদানের দাবি জানান। খিলাফতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিস্থিত হওয়ার আশংকায় হ্যরত আলী (রা.) হত্যাকারীদের শান্তি প্রদানের ব্যাপারটি স্থগিত রেখে মারাত্ক ভুল করেন এবং পরিণামে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন।

হ্যরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুবিধা :

উষ্ট্রের যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতির জন্য প্রকৃতপক্ষে হ্যরত উসমান (রা.) এর হত্যার অপরাধীরাই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থার চাপে পড়ে অথবা ঘটনাক্রে হ্যরত আলী (রা.)-কে তাদের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্য কথায় তারা হ্যরত আলী (রা.)-এর প্রধান সমর্থক হয়। এতে মুয়াবিয়া হ্যরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে দুষ্কৃতিকারীদের প্রশংস্য ও আশ্রয়দানের অভিযোগ আনার সুযোগ পান। এ অপপ্রচার সাধারণ মানুষের মনে খলিফার প্রতি বিষয়ে তুলে এবং তারা খলিফার আন্তরিকতায় সন্দিহন হয়ে ওঠে। এটিও হ্যরত আলী (রা.)-এর ব্যর্থতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

হ্যরত তালহা ও হ্যরত জুবাইরের মৃত্যুতে হ্যরত আলী (রা.)-এর ক্ষতি

খিলাফতের উপর ঝীয় কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করার সময় খলিফা হ্যরত আলী (রা.) পাননি। কেননা হ্যরত আলী (রা.)-এর খিলাফত প্রাপ্তির চতুর্থ মাসে সংঘটিত উষ্ট্রের যুদ্ধে হ্যরত তালহা, হ্যরত জুবাইর ও হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর সম্মিলিত সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধে জয়লাভের ফল হ্যরত আলী (রা.)-এর কোনো লাভ হল না। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে দুষ্কৃতিকারীগণ কর্তৃক হ্যরত তালহা ও হ্যরত জুবাইরের হত্যার ফলে হ্যরত আলী (রা.) এর শক্তিহ্রাস পায়। অপরাদিকে হ্যরত আলী (রা.) উষ্ট্রের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগে মুয়াবিয়া যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। অধিকন্তু, হ্যরত আয়েশা (রা.) এর সাথে হ্যরত আলী (রা.) প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় মহানবি (স.)-এর ধর্মতার অনুসারীদের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে হ্যরত আলী (রা.) ব্যর্থ হন। এই পরিস্থিতিও মুয়াবিয়ার জন্য বিশেষ সুযোগের সৃষ্টি হয়েছিল।

হ্যরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) এর অদূরদর্শীতা :

হ্যরত আলী (রা.) দুমার মীমাংসায় তাঁর পক্ষে বয়োবৃদ্ধ ও সরলমনা হ্যরত আবু মুসা আল-আশআরীকে সালিস নিয়োগ করে মারাত্ক ভুল করেন। কারণ আবু মুসা (রা.) মুয়াবিয়ার ধূর্ত সালিস আমর ইবন আল-আসের সূচ্ছ দাবার চালের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। কাজেই চরম সমস্যাপূর্ণ ব্যাপারে এহেন সরলমনা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলতা হ্যরত আলী (রা.) এর পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।

কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা :

মদিনা হতে কুফায় রাজধানী পরিবর্তন করে হয়রত আলী (রা) মারাত্তক ভুল করেন। এর ফলে তিনি মক্কা-মদিনার প্রভাবশালী কুরাইশদের আস্থা হারান। কেননা কুফাবাসীরা কুরাইশ আভিজাত্যের পরিপন্থী ছিল। তাছাড়া তাদের কোনো চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল না। তারা ছিল অত্যাধিক চপলমতি ও আবেগপ্রবণ। গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে তিনি তাদের নিকট হতে আশানুরূপ সহায় ও সহানুভূতি লাভে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে মুয়াবিয়ার শক্তির উৎস সিরিয়ার জনগণ সকল অবস্থায় তাঁর পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ :

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ বিশেষ করে মিসর, বসরা, পারস্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় হয়রত আলী (রা) মারাত্তক সমস্যার সম্মুখীন হন। এ বিদ্রোহের সূযোগ নিয়ে মুয়াবিয়া মিসর দখল করে নিজের বিজয়ের পথকে সুপ্রশস্ত করেছিলেন।

হয়রত আলী (রা) এর শাহাদাত, ২৭ জানুয়ারি, ৬৬১ খ্রিঃ

বিদ্রোহী খারেজিগণ হয়রত আলী (রা), মুয়াবিয়া ও আমর ইবন আল-আসকে ইসলামের শাস্তি-শৃঙ্খলা বিনাশের কারণ বলে দায়ী করে। তাই তারা এ তিনজনকে একই দিনে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্র করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, কুফা, দামেস্ক ও ফুসতাতের মসজিদ হতে নামাজের ইমামতি শেষে ফেরার পথে তিনজন আততায়ী তাদের প্রাণ সংহার করবে। সৌভাগ্যক্রমে আমর নির্দিষ্ট দিনে মসজিদে অনুস্থিত ছিলেন। মুয়াবিয়া সামাজ্য আহত হলেও প্রাণে রক্ষা পেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আবদুর রহমান ইবন মুলজামের বিষাক্ত ছুরির অব্যর্থ আঘাতে হয়রাত আলী (রা) গুরুতররূপে আহত হন (২৪ জানুয়ারি, ৬৬১ খ্রিঃ)। ৬৬১ খ্রিঃ ২৭ জানুয়ারি হয়রত আলী (রা) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে ধর্মীয় সারল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত খুলাফায়ে রাশেদিনের পবিত্র খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হয়রত আলী (রা) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

আদর্শ চরিত্র :

ঐতিহাসিক মাসুদীর বর্ণনা মতে, মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা হয়রত আলী (রা) রাস্তিম বর্ণবিশিষ্ট, দীর্ঘশুণ্ঝ, ঘনত্বসহ প্রশস্ত নেত্রে ও উজ্জ্বল টাকবিশিষ্ট মধ্যম আকৃতির দেহের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের একনিষ্ঠ প্রেমিক, বিশুসে দৃঢ়, রণক্ষেত্রে সাহসী, ব্যক্তিগত আচরণে ন্যায়পরায়ণ এবং আলোচনায় সুবিজ্ঞ হয়রত আলী (রা) ইসলামী গুণাবলির মহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সকল যুদ্ধে নবির বিশৃঙ্খল সঙ্গী, পূর্ববর্তী খলিফাদের সহৃদ ও পরামর্শদাতা, রিক্তের বন্ধু, ধর্মের অনুসারী এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক।

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন :

মহানবি (স.) ও ইসলামের আদর্শসমূহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তালোবাসা হিসেবে হয়রত আলী (রা)-এর জীবন সরলতা ও সংযমে বিভূষিত ছিল। তিনি ছিলেন সরলতা ও আত্মাগের মূর্ত প্রতীক। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও তিনি এবং তাঁর ত্রী হয়রত ফাতেমা (রা) সহস্তে সংসারের কাজ করতেন। দরিদ্রতা ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি থাকা-থাওয়া, বেশভূষা ইত্যাদিতে মহানবি (স.) ও পূর্ববর্তী খলিফাদের পদাঞ্চক অনুসরণ করতেন। স্বচ্ছ, সরল, অনাড়ম্বর ও নিষ্কলুম জীবন যাপন করতে তিনি গর্ববোধ করতেন। কর্ণেল ওসবর্গ তাঁকে “সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মবিশিষ্ট মুসলমান” বলে অভিহিত করেছেন।

ইসলামের সেবা ৪

হ্যরত আলী (রা) মাত্র দশ বছর বয়সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। বালকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মহানবি (স.) তাঁর বীরতে মুগ্ধ হয়ে ‘আসাদুল্লাহ’ (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর সামরিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার কারণেই ইসলামি রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বহু নতুন পরিকল্পনা সংযোজিত হয়েছিল।

তাঁর পাত্তিয়া ৪

হ্যরত আলী (রা) অসাধারণ পাত্তিয়া, সৃতি শক্তি ও জ্ঞান-গরিমার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কুরআন, হাদিস, কাব্য দর্শন ও আইনশাস্ত্রে প্রগাঢ় বৃংগতি অর্জন করেছিলেন। কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবেও তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হাদিস বা সুনাহ সংরক্ষণেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁর লিখিত ‘দীওয়ানে আলী’ আরবি সাহিত্যের এক অঙ্গ সম্পদ। তাঁরই তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন। এ সমস্ত কারণে আল্লাহর রাসুল (স.) বলেন, “আমি জ্ঞানের নগরী এবং আলী এর দ্বারা সুরূপ।”

দূরদর্শিতা ও কঠোরতার অভাব ৪

হ্যরত আলী (রা) মহান্তব, দয়ালু, সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর চরিত্রের বহু গুণের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সতর্কতা ও সময়োপযোগী তৎপরতার অভাব দেখা যায়। সমবোতা এবং আপোসের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করতে চেয়ে তিনি মারাত্মক ভুল করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উইলিয়ম মুইর বলেন, “সমবোতা এবং দীর্ঘসূত্রতা তাঁর পতনের অনিবার্য কারণ হয়েছে।” বস্তু তাঁর সদাশয়তা ও উদারতার সুযোগ গ্রহণ করে স্বার্থবেষী মহল তাঁর চরম সর্বনাশ করে। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, “তাঁর চরিত্রে যদি উমরের কঠোরতা থাকত তবে তিনি দূর্বল আরবজাতিকে আরও কৃতকার্যতার সাথে শাসন করতে সমর্থ হতেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমাশীলতা ও উদারতাকে ভুল বুঝা হল এবং তাঁর সদাশয়তা ও সত্যপ্রিয়তাকে শক্রেণ্ণ নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করল।” ফলে তাঁকে খিলাফত ও নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হয়।

ইমাম হাসান (রা) ৬৬১ প্রিঃ

খিলিফা হ্যরত আলী (রা) এর ইন্তেকালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসান (রা) কুফাবাসিগণ কর্তৃক খিলিফা মনোনীত হন। মক্কা ও মদিনার অধিবাসীগণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেন। তিনি ছিলেন রাজনীতি ও সমরনীতিতে অনভিজ্ঞ। রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মচর্চায় তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, খিলাফতের চরম সংঘাতের দিনে তিনি মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের অনুপযোগী ছিলেন। ইমাম হাসানের (রা) ন্যায় সরল ও দুর্বল ব্যক্তিকে খিলিফা নিযুক্ত করা উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ইতোপূর্বে তিনি শুধু সিরিয়া ও মিসরের অধিপতি ছিলেন। এখন নিজেকে সমগ্র মুসলিম জাহানের একচেত্র খিলিফা বলে ঘোষণা করেন। ফলে আরব জাহানের দুটি প্রতিপন্থী খিলাফতের সূত্রপাত হল এবং ইমাম হাসানের (রা) সাথে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মুয়াবিয়া খিলাফতের এই অনিচ্ছয়তা দূরীকরণার্থে বিপুল সৈন্যসহ কুফা আক্রমণ করেন। ইমাম হাসান (রা) তাঁর ৪০,০০০ সৈন্যবাহিনীকে দুই ভাবে বিভক্ত করে মুয়াবিয়ার সিরিয়া বাহিনীর গতিরোধের জন্য সেনাপতি কায়েসের নেতৃত্বে ১২,০০০ সৈন্যসহ একটি দল প্রেরণ করেন এবং প্রধান সৈন্যদলসহ তিনি মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সেনাপতি কায়েসে প্রাণপণে সিরীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তাদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। এদিকে স্বভাব সুলভ কূটনীতিবিদ মুয়াবিয়া গুজব ছড়ালেন যে, কায়েস যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। এতে ইমাম হাসানের (রা) সৈন্য দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

ইমাম হাসান (রা) সৈন্যবাহিনীকে এ গুজবে বিশ্বাস না করে সমুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে নির্দেশ প্রদান করলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং লুটতরাজ শুরু করে। কুফাবাসীদের বিশ্বাসাতকতায় ইমাম হাসান বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে কুফা ত্যাগ করে পারস্যের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অবশেষে ইমাম হাসান (রা) মুয়াবিয়ার নিকট বশ্যতামূলক এক সম্প্রিপ্তি স্বাক্ষর করেন। সন্ধির শর্তানুসারে ইমাম হাসান (রা) মুয়াবিয়ার অনুকূলে খিলাফত ত্যাগ করতে এবং মুয়াবিয়া খুৎবায় হ্যরত আলী (রা) এর প্রতি অভিসম্প্রাত বর্ষণ বল্থ করতে সম্মত হন। সৈয়দ আমীর আলী উল্লেখ করেছেন যে, মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর হ্যরত আলী (রা)-এর দ্বিতীয় পুত্র হ্যরত হুসাইন (রা) খিলাফত লাভ করবেন- এবুপ একটি শর্তও মুয়াবিয়া মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক পি. কে. হিটি, উইলিয়াম, মুইর, তাবারী প্রমুখ বিজ্ঞ ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় এ শর্তের কোনো উল্লেখ নেই।

এরপর ইমাম হাসান (রা) সপরিবারে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে রাজকোষ হতে বৃত্তি ভোগ করতে থাকেন এবং রাজনীতি হতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন। অবশেষে ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের প্ররোচনায় সীয় স্ত্রী কর্তৃক বিষ প্রয়োগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শিয়া সম্প্রদায়

উৎপত্তি :

‘শিয়া’ শব্দটির অর্থ দল। ইতিহাসে হ্যরত আলী (রা) এর দল সাধারণত শিয়া নামে পরিচিত। শিয়া মাজহাব প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পরে ধর্মীয় মাযহাবে পরিণত হয়। খলিফা হিসাবে হ্যরত আবু বকর (রা) এর নির্বাচনের সময় হতে শিয়া আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়। মহানবি (স.) এর ওফাতের সময় তাঁর জামাতা হ্যরত আলী (রা) খলিফা হবেন বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দাবি উপেক্ষিত হলে আলীর সমর্থকগণ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। অতঃপর হ্যরত উমর (রা) ও হ্যরত উসমান (রা) যখন খলিফা পদ লাভ করেন, তখনও আলীর সমর্থকগণ তাঁকে খলিফা হিসেবে পাবার আশা পোষণ করেছিল। এভাবে আলীর (রা) সমর্থকগণ তাঁকে না জানিয়ে তাঁর দাবির স্বপক্ষে গোপন আন্দোলন শুরু করে।

সিফিফিনের যুদ্ধে হ্যরত আলী (রা) এর পরাজয় এবং পরবর্তীকালের খারিজীদের হাতে তাঁর মৃত্যু ইসলামে দলীয় বিরোধের ক্ষেত্রে আরও প্রসারিত করল এবং তাঁর সমর্থকদের যে দলটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে উঠেছিল, তাদের উদ্দেশ্যকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলল। মুয়াবিয়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলে এ দলটি ‘শিয়া’ নাম গ্রহণ করল। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা হ্যরত আলী (রা)-এর সমর্থকদের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত করল। কারবালার বিয়োগাত্মক ঘটনা শিয়াদের ইতিহাসে যুগান্তর সূচিটি করে। অধ্যাপক পি. কে. হিটির মতে, “হুসাইনের রক্ত শিয়া মাজহাবের বীজ বলে প্রমাণিত হয় এবং ১০ মুহররম তারিখে শিয়া মতবাদ জন্মালাভ করে।” এভাবে হ্যরত-হুসাইনের হত্যার ফলে ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে শিয়া মতবাদের জন্ম হয়।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে :

শিয়া মতবাদ পারস্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করে। উমাইয়া শাসনে অসুস্থিত হয়ে পারসিকগণ শিয়াদের উদ্দেশ্য সমর্থ করে। তারা এই মতবাদকে স্বীকৃতি দান করে। হ্যরত আলীর বংশের খিলাফতের অধিকার পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে তারা উমাইয়া বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। উমাইয়া বংশকে খিলাফতের অধিকার হতে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে শিয়া সম্প্রদায়

আব্বাসীয় প্রচারণায় যোগদান করে। আব্বাসীয় আমলে তাদের দাবি পূরণ না হলে তারা বিদ্রোহের চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আব্বাসীয়দের হাতে তাদের পরাজয়ের পর কিছু বিদ্রোহী উন্নত আক্রিকায় পলায়ন করে এবং ইমাম হুসাইনের অন্যতম বংশধর ইদ্রিসের নেতৃত্বে সেখানে একটি রাষ্ট্র গঠন করে।

শিয়া মতবাদ :

১. মহানবি (স.)-এর পর হয়রত আলী (রা) এর খিলাফতের স্বীকৃতি এবং আলী (রা) ও হয়রত ফাতিমার বংশধরদের মধ্যে পুরুষাধুনিক খিলাফতের অধিকার নিয়ে শিয়া মতবাদের সূচনা হয়। শিয়াদের মতে, ইমামত বা নেতৃত্বে হয়রত মুহাম্মদ (স.)- এর বংশধরদের বংশগত অধিকার এবং সে কারণে তা হয়রত আলী (রা) ও তাঁর পত্নী নবি-নন্দিনী হয়রত ফাতিমার বংশধরদের মধ্য সীমাবদ্ধ। ইমামতের মতবাদ শিয়াদের নিকট ইমানের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়।
২. হয়রত আলী (রা) এর ইমামতের সংগতি রক্ষার জন্য শিয়ারা প্রথম তিন খলিফা এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণকে খিলাফতের আবৈধ দাবিদার মনে করে।
৩. শিয়ারা কালিমায়ে তাইয়িব “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রসূলুল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল)-এর সঙ্গে ‘আলী খলিফাতুল্লাহ’ (আলী আল্লাহর প্রতিনিধি) কথাটি সংযোজন করে থাকে।”
৪. শিয়াদের মতে, ইমাম মুসলিম সমাজের একচ্ছত্র নেতা। তিনি আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাঁর নির্বাচনের ব্যাপারে মানুষের কোনো অধিকার নেই। কারণ মানুষের নির্বাচন কখনও কখনও ত্রুটিপূর্ণ হয়।
৫. শিয়ারা ধারণা পোষণ করে যে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ আল-মুনতাজার ‘মাহনী’ হয়ে সত্যিকার ইসলামের পুনরুদ্ধার, সমগ্র বিশ্বজয় ও কিয়ামতের পূর্ববর্তী সহস্রাদের সূচনা করার জন্য আবির্ভূত হবেন।
৬. শিয়াদের বিশ্বাস হয়রত আলী (রা) হয়রত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট হতে আধ্যাত্মিক শক্তির আলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর দেহে আল্লাহর পবিত্র গৌরবের ঝোশনী প্রতিফলিত হয়েছিল। শিয়াদের মতে ইমাম বা আধ্যাত্মিক নেতার মধ্যে অস্ত্রাত্তা ও নিষ্পাপত্তার দৃষ্টি গুণ যুগপৎ বিদ্যমান থাকে।

অনুবীক্ষনী

সৃজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

- ১। সাওরাইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নোমান সাহেবের মৃত্যুর পর ফারহান সাহেব চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ফারহান সাহেব চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়ে অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। এ সময় কিছু ভঙ্গপীর ও ইউনিয়নের কর দিতে অঙ্গীকারকারীগণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেবের অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। এ জন্য তাঁকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়
 - ক. ‘রিদ্দা’ শব্দের অর্থ কী?
 - খ. মজলিস উস-শূরা বলতে কী বুঝায়?
 - গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফারহান সাহেবের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন খলিফার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. উক্ত খলিফাকে ইসলামের আগকর্তা বলা যায় কী? মতামত দাও।

- ২। আল মদীনা নামক সমবায় সমিতির আওতা বেড়ে গেলে এটির সম্পদ-সম্পত্তি অনেকগুল বেড়ে যায়। ফলে পরিচালনা কর্তৃপক্ষ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। তাছাড়া সম্পদ-সম্পত্তি সংরক্ষণ ও লভ্যাংশ বিলি-বন্টনের জন্য একটি আলাদা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে একটি ক্যাশ কাউন্টার স্থাপন করে। এ কার্যালয় সকল প্রকার মুনাফা সংগ্রহ করে কোষাগারে জমা রাখে এবং সদস্যদের মধ্যে তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে দেয়।

ক. ‘সিদ্ধিক’ কোন খলিফার উপাধি?
খ. জিয়িয়া বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে হ্যারত উমরের (রাঃ) কোন নীতি অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে সমিতির সম্পদ-সম্পত্তি সংরক্ষণ ও বিলি-বন্টনে হ্যারত উমর (রাঃ) প্রতিষ্ঠিত দিওয়ান ও বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লক্ষণীয় উভিটি বিশ্লেষণ কর।

৩। জনাব হাসিব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরের বরখাস্ত করেন। হাবিল নামক গভর্নর ব্যতীত অন্যান্য গভর্নরগণ তাঁর নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখান। তাছাড়া হাবিল সাহেবের পূর্বেকার শাসকের সময়ে অনেক সরকারি সম্পত্তির মালিক ছিলেন। হাসিব সাহেব হাবিল সাহেবের সরকারি সম্পত্তি বাজেয়ান্ত করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ক. ‘সাইফুল্লাহ’ কার উপাধি?
খ. খারেজি সম্পদায় বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের সংঘর্ষের দ্বারা তোমার পাঠ্য পুস্তকের কোন সংঘর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত সংঘর্ষে খলিফার ব্যর্থতার ফলে ইসলামে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়- উক্তরের স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও।

ବ୍ୟାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପତ୍ର

- ১। খলিফা কারা?

 - (ক) হ্যরত আবুবকর (রা.)
 - (খ) মুসলিম উম্মাহর নেতা
 - (গ) প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা
 - (ঘ) পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি

২। ন্যায় পরায়ণতা > দৃঢ়চিত্ততা > ?
 ইবনে খালদুন নির্ধারিত খলিফার গুণাবলির মধ্যে প্রশ্ন বোধক (?) চিহ্নিত স্থানে বসবে-

 - (ক) গণতন্ত্রমনা
 - (খ) চরিত্রবান
 - (গ) কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানের অধিকারী
 - (ঘ) ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যজ্ঞের সুস্থিতা

৩। হ্যরত আবু বকর (রা.) কত স্থিষ্ঠানে খিলাফত লাভ করেন?
 (ক) ৫৮২

(খ) ৬১০

(গ) ৬৩২

(ঘ) ৬৪৪

হয়রত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইনতেকালের পর মুসলিমানদের এমন সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে যদি আল্লাহতায়ালা হয়রত আবুকর (রা) এর মাধ্যমে আমাদের উপর কর্মনা করতেন তাহলে আমরা ধূঃস হয়ে যেতাম।

উপরের অনুচ্ছেদ পড় এবং ৪-৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শ্রেণি কক্ষে শিক্ষক বললেন, হয়রত উমর (রা.) ইসলামের অন্যতম বিজেতা, তার সময়ে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। শাসন কার্য পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯-১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

- ৯। হ্যারত উমরের সামরিক বিজয় সমূহের অন্যতম ছিল

 - (ক) পারস্য বিজয়
 - (খ) জালুলার যুদ্ধ
 - (গ) কাদেসিয়ার যুদ্ধ
 - (ঘ) মাদায়েন বিজয়

১০। শাসনকার্যে উমরের কৃতিত্বের পরিচয় হচ্ছে

 - i. সাম্রাজ্যকে প্রদেশে বিভক্ত করা
 - ii. রাজস্ব ব্যবস্থার বৈপ্লাবিক পরিবর্তন
 - iii. অমসলিয়ের প্রতি বিদ্বেষ

କୋଣଟି ସଠିକ?

- ১০ (ক) i ও ii
 (গ) ii এবং iii

১১। যুন নূরাইন উপাধি দেয়া হয় কোন খ্লিফাকে?

- | | |
|----------------------|--------------------|
| (ক) আবুবকর (রা.) | (খ) হযরত উমর (রা.) |
| (গ) হযরত উসমান (রা.) | (ঘ) হযরত আলী (রা.) |

হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের প্রথমার্থ খুব শান্তিপূর্ণভাবে অতিক্রম করেন। দ্বিতীয়ার্থে তার বিরলদেশে অথবা নানা অভিযোগ উত্থাপন করে বিশ্বজুলা সৃষ্টি করা হয়।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২-১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১২। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের প্রথমার্থ বলতে কতো বছর সময়কালকে বুঝানো হয়েছে?

- | | |
|-------|--------|
| (ক) ৪ | (খ) ৫ |
| (গ) ৮ | (ঘ) ১২ |

১৩। হযরত উসমান (রা.)-এর বিরলদেশ যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হয় তা হচ্ছে

i. চারণভূমির ব্যক্তিগত ব্যবহার

ii. স্বজন প্রীতি

iii. জরবদন্তি

কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|----------------|
| (ক) i | (খ) iii |
| (গ) i এবং ii | (ঘ) ii এবং iii |

১৪। হযরত উসমান (রা.) কুরআন শরীফে অগ্নি সংযোগ করেছিলেন কেন?

- | |
|--------------------------------------|
| (ক) ইসলাম ধ্বংস করা |
| (খ) কুরআন শরীফ নিষিদ্ধ করা |
| (গ) কুরআনের ভূল পাদ্রুলিপি ধ্বংস করা |
| (ঘ) নিজের কৃতিত্ব দেখানো। |

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন

প্রথম পরিচেছে

ভারতীয় উপমহাদেশের পরিচিতি ও সামগ্রিক অবস্থা

ভারতীয় উপমহাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম উপমহাদেশ। বিশাল ও বিস্তৃত এই উপমহাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে মায়ানমার এবং পশ্চিমে ইরান ও আরব সাগর অবস্থিত। বহু জাতি, বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষি পৃথিবীর প্রায় পাঁচ তাপের এক তাগ লোক ভারতীয় উপমহাদেশে বাস করে। প্রাচীন কালে ভারত নামে এক হিন্দু রাজা এদেশ শাসন করতেন। সম্ভবত তারই নামানুসারে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা : বস্তুতপক্ষে মুসলিম বিজয়ের প্রাকালে ভারতে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। ফলে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। যেমন :

কাশীর : সপ্তম শতাব্দীতে কাশীরে কর্কট বংশীয় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা ললিতদিত্যে অত্যন্ত উচ্চভিলাসী নৃপতি ছিলেন। তিনি মাতানের বিখ্যাত সূর্যমনির নির্মাণ করে ধর্ম ও স্থাপত্য অনুরাগের পরিচয় দেন। কিন্তু নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্কট বংশ শক্তিহীন হয়ে পড়লে উৎপল বংশ কাশীরের শাসন ক্ষমতা লাভ করে।

কনৌজ : অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে যশোবর্মণ এ রাজ্যের রাজা ছিলেন। তার সময়ে কনৌজ রাজনৈতিক প্রতিপাদ্তি ও সামরিক মর্যাদায় রাস্তা হিসেবে উত্তর ভারতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

মালব : মালব প্রতিহার রাজপুত্র বংশ কর্তৃক শাসিত হয়। প্রথম নাগভট্টের অধীনে প্রতিহারগণ এতই প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল যে, আরবগণ যখন জুনায়দের নেতৃত্বে প্রতিহার রাজ্যের পশ্চিমাংশ আক্রমণ করে তখন তারা আরবদেরকে পরাজিত করে তাদের রাজ্যের সুরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

গুজরাট : গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর জনেক গুরজর প্রধান গুজরাটের ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গুরজর বংশ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করে।

বুদ্দেশ্বর : চান্দেলা বংশ নবম শতাব্দীতে বুদ্দেশ্বরখণ্ডে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

আজমির ও দিল্লি : মুসলিম অভিযানের প্রাকালে আজমির ও দিল্লিতে শক্তিশালী চৌহান বংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করত।

সিন্ধু : বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশ হর্ষবর্ঘনের রাজ্যভূক্ত ছিল। তবে আরব অভিযানের সময় চাচের পুত্র দাহির সিন্ধুর শাসনকর্তা ছিলেন। দাহিরের কুশাসনে তার রাজ্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং এর ফলে সেনাপতি মুহম্মদ-বিন-কাসিম সহজেই সিন্ধু বিজয় করতে সক্ষম হয়।

বাংলা ৪ রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় মারাঞ্জক গোলযোগ দেখা দিলে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলার জনসাধারণ একত্রিত হয়ে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে তাদের শাসন কর্তা মনোনীত করলে পাল রাজা বংশের শাসন শুরু হয়।

সামাজিক অবস্থা ৪ প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা সম্মোহনক ছিল না। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের ঐক্য ও সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করে। হিন্দু সমাজ মূলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি স্তরে বিভক্ত ছিল। হিন্দুগণও চার বষভূক্ত ছাড়া অপরাপর সকলকে আক্ষরিত ঘনে করত।

সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রবল প্রতাপ ছিল। ব্রাহ্মণগণ সাধারণত ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকতেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ-বিদ্যুৎ, বৈশ্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শুদ্রগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও সাধারণ কাজকর্ম করত। আঙ্গসাম্প্রদায়িক বিবাহের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। হিন্দুরা একাধিক বিবাহ করতে পারত কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল না। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর সহ মরণ বরণ করতে হত। এ ঘৃণ্য প্রথাই সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত ছিল। জনসাধারণের অধিকাংশ নিরামিয়তোজী ছিল।

অর্বনেতিক অবস্থা ৪ অচেল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল থেকে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে পরিচিত এবং জনসাধারণ মোটামুটি অভাবমুক্ত ছিল। দেশে শিল্প-বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। তৎকালে বাংলা কার্পাস বন্দু উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। কৃষিকাজই ছিল জনসাধারণের প্রধান পেশা। কৃষকেরা কঠোর পরিশ্রম করলেও অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণির লোকেরা বিলাসবহুল জীবন-যাপন করত। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণের জীবন দুঃখ-দুর্দশায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

ধর্মীয় অবস্থা ৪ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে প্রধানত তিনটি ধর্ম বিরাজমান ছিল-বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্ম। জৈনধর্ম তত জনপ্রিয় ছিল না এবং বৌদ্ধধর্ম লুক্ত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। হিন্দুধর্ম ছিল দেশের প্রধান ধর্ম। অধিকাংশ রাজাই ছিলেন হিন্দু এবং তাঁরা হিন্দুর্ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই করতেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৪ প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন সর্বেসবা। সকলক্ষেত্রে তাঁর মতামতই ছিল চূড়ান্ত। তিনি ন্যায় বিচারেরও উৎস ছিলেন। সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশ আবার কতগুলো জেলায় বিভক্ত ছিল। দেশের শাসন ব্যবস্থায় পল্লীগ্রাম ছিল সর্বনিম্ন ইউনিট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আববদের সিদ্ধ ও মূলতান অভিযান

৬৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর আমলে মুসলমানগণ ভারত অভিযানের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু করে। কিন্তু দূরাভিযানের বিপদ এবং দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবেচনা করে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) এবং উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার শাসনামলেও অভিযানের চেষ্টা করা হয়। সর্বশেষ বিখ্যাত উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালি-বিন-আবদুল মালিকের শাসনামলে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনকর্তা হাজার্জ বিন ইউসুফের ভাতুস্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ-বিন-কাসিমের নেতৃত্বে ভারতের সিদ্ধ ও মূলতান অঞ্চলে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিন্ধু অভিযানের কারণ

উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময় হাজার্জ-বিন-ইউসুফকে পূর্বাঞ্চলীয় গর্ভনর নিযুক্ত করা হয়। এ সময় কতিপয় আরব বিদ্রোহী সীমান্ত অতিক্রম করে সিন্ধু রাজা দাহিরের নিকট আশ্রয় লাভ করে। হাজার্জ বিদ্রোহীদের প্রত্যার্পণের দাবী জানালে রাজা দাহির তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাছাড়া উমাইয়াদের পারস্য অভিযানের সময় সিন্ধুর শাসনকর্তা পারস্যবাসীকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল।

পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা সিন্ধুদেশের অতি সন্নিকটে এসে পড়ে। ভারতীয় হিন্দু রাজাদের বৈরী মনোভাব ও সামরিক উস্কানীতে উমাইয়া খিলাফতের প্রতি হুমকি এবং খলিফা ওয়ালিদ ও গর্ভনর হাজার্জের রাজ্য জয়ের ইচ্ছাই মুসলমানদের সিন্ধু অভিযানে ইন্ধন যোগায়।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে আরব বণিকদের বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছিল। সিন্ধুর সামুদ্রিক বন্দর দেবলের নিকট জলদস্যুগণ কর্তৃক মুসলমানদের বাণিজ্যিক জাহাজ লুঠন হিল সিন্ধু অভিযানের প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ। কথিত আছে আরব বণিকদের পরিবার পরিজন ও উপটোকন নিয়ে আটটি জাহাজ সিংহল হতে আরবের পথে রওয়ানা হলে দেবল বন্দরের নিকট জলদস্যু কর্তৃক জাহাজগুলো লুঠিত ও পরিবার পরিজন বন্দী হবার খবর শুনে হাজার্জ মর্মাহত হয়ে দ্রব্য ও বন্দীদের ফেরত দেওয়ার এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে দাহিরকে পত্র পাঠান। কিন্তু রাজা দাহির তাতে অসম্মতি জানালে হাজার্জ ত্রুটি হয়ে খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে সিন্ধু বিজয়ের উদ্দেশ্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। প্রথমে ওবায়দুল্লাহ ও পরে বুদাইলের নেতৃত্বে পরপর দুটি অভিযান প্রেরণ করে ব্যর্থ হলে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ-বিন-কাসিমের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন।

মুহাম্মদ-বিন-কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু ও মুলতান অভিযান

হাজার্জের নির্দেশে মুহাম্মদ-বিন-কাসিম ৬০০০ সিরীয় ও ইরাকি যোদ্ধা, ৬০০০ উঝ্বারোহী এবং ৩০০০ রসদবাহী উষ্ট্র নিয়ে আরকনের মধ্য দিয়ে সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হয়ে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে দেবল দুর্গে এসে উপস্থিত হলেন। ইতোমধ্যে হাজার্জ-বিন-ইউসুফ জলপথে আজানিক বা আল-আরুম বা কনে নামক অন্তর্শস্ত্রসহ অপর একটি সেনাবাহিনী তার সাহায্যার্থে পাঠালেন। দেবল দুর্গে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে হিন্দুদের শোচনীয় পরাজয় ও দেবল মুসলমানদের হস্তগত হয়।

দেবল অধিকার করার পর মুহাম্মদ-বিন-কাসিম প্রথমে আধুনিক হায়দ্রাবাদের নিকটে অবস্থিত বৌদ্ধ সন্ধ্যাসীদের অধীনস্ত নিরুন্ন ও অপর ক্ষুদ্র শহর সিওয়ান এবং সিসাম অধিকার করেন। মুসলমান সেনাপতির এরপ অপ্রত্যাশিত বিজয়ে সিন্ধুরাজা দাহির সৈন্য-বাহিনী নিয়ে রাওয়ারে গমন করেন এবং তাদের পথরোধ করে দাঢ়ালেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে উভয় সৈন্যবাহিনীর ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলে দাহির বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাজা দাহির নিহত হলেন। রাজার মৃত্যুতে সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্রে হতে পালিয়ে গেল। পরবর্তীতে প্রায় বিনাযুদ্ধে সিন্ধুর রাজধানীসহ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর মহুম্মদ-বিন-কাসিম হিন্দুদের শক্তির শেষ উৎস মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হয়ে রাভা নদীর তীরে অবস্থিত সিকা (উচ) নামক দুর্গ অধিকার করলেন। মুলতানের হিন্দুরা প্রায় দুই মাস দুর্গটি রক্ষা করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত ও বিধ্বংস হল।

মুহম্মদ-বিন-কাসিমের রণনৈপুন্য এবং শাসন কৃতিত্ব ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস এক সর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। তিনি একাধারে কবি, দক্ষ সেনাপতি, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও সুশাসক ছিলেন। তিনি শত্রুর প্রতি কঠোর এবং মিত্রের প্রতি পরম দয়ালু ছিলেন। ৭১২ থেকে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিনি বছরের শাসনামলে তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মণদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তাদের ধর্মে তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি দেবলে একটি মসজিদ নির্মাণ ও প্রথম মুসলিম সেনানিবাস স্থাপন করেন।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সিন্ধু বিজয় নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই বিজয় আরবিয় মুসলমানদের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথকে প্রসারিত ও সুগম করে তুলেছিল। আরবদের প্রভাব সিন্ধুর বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্রও স্থাপিত হয়।

এই বিজয়ের ফলে আরববাসী সর্বপ্রথম এই দেশীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আসে। হিন্দু ও মুসলমান দুটি ভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফলে দেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সামাজিক জীবনে তারা একে অন্যের রাজনীতি অনেকাংশে প্রহণ করেন। আরব সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই সিন্ধু দেশে বসতি স্থাপন করে সিন্ধু রাজনীদের বিবাহ করে। এভাবে আর্য এবং সেমিটিক জাতির সংমিশ্রণে একটি নতুন জাতির উত্থন ঘটে। এ জাতিই ভারতে পরবর্তীকালে ইন্দো-আরবিয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

আরব বণিকদের সাথে ধর্মপ্রচারকগণ অনেক পূর্বকাল থেকে এদেশে আগমন করলেও সিন্ধু অভিযানের পরই তারা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের শাশ্বত বাণী ছড়িয়ে দেন। এই বিজয়ের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে যে সকল আউলিয়া ও পীর-দরবেশ এই দেশে ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে দিল্লির হ্যরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রা), আজমীরের খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রা), চট্টগ্রামের বায়োজিদ বোস্তামী (রা), বগুড়ার সৈয়দ মাহমুদ সারওয়ার (রা), সিলেটের হ্যরত শাহজালাল (রা), রংপুরের হ্যরত কারামত আলী (রা) প্রমুখের নাম সরিশেষে উল্লেখযোগ্য। এদের প্রচারিত সাম্য, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা ও উদারতা নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে এবং তারা দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। বস্তুতঃ এই ভারতীয়, আরবিয় ও পারসিক চিন্তাধারার সংযোগেই সুফী মতবাদ ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তৃত লাভ করে।

মুসলিম সংস্কৃতির উপর সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। হিন্দুধর্ম, দর্শন, আযুর্বেদশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, সংগীত, লোকগীতি, সাহিত্য, দাবা, স্থাপত্য, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে আরবিয়গণ ভারতীয়দের নিকট হতে প্রভৃত জ্ঞান লাভ করে। আরবের বহু শিক্ষার্থী এদেশে আগমন করে বিভিন্ন শাস্ত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় বহু গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুদিত হয়। আরবরা ভারতীয়দের কাছ হতেই গাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করে ছিলেন।

সুতরাং বলা যায় আরবিয় মুসলমানরা এদেশে সর্বপ্রথম ন্যায়নীতি ও উদারতার ভিত্তিতে শ্রেণিহীন এক নতুন সমাজ গঠনে ভারতবাসীকে উদ্বৃদ্ধ করেছিল। মুসলমানদের আগমনের ফলে এদেশে বর্ণভেদের কঠোরতা হাস পায় এবং নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা কুশাসনের ভীতি হতে উত্তরণের প্রেরণা লাভ করে। ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি ও স্বাস্থ্য আনয়ন করেছিল।

ত্রৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান মাহমুদ

গজনির সুলতান মাহমুদ (১৯৭-১০৩০) প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনে আরোহণ : গজনীর অধিপতি সবুক্তগনী কর্তৃক ১৭৭ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি গজনী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সবুক্তগনীর পুত্র মাহমুদ ১৭১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি যুদ্ধবিদ্যা, শাসন পদ্ধতি এবং রাজনীতিবিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর স্বীয় ভাতা ইসমাইলকে পরাজিত ও কারারূপ্য করে ১৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২৬ বছর বয়সে মাহমুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য : গজনির সুলতান মাহমুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারত অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রত্যেকটি অভিযানেই জয়লাভ করেন। কিন্তু কী কারণে ও উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদ বারবার ভারত অভিযান পরিচালনা করেন, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এখন আমরা সংক্ষেপে তাঁর ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য :

কতিপয় ঐতিহাসিক ধারণা যে, পৌত্রলিকতার ধ্বংস সাধন করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযান করেছিলেন। তাঁদের মতে, আবাসীয় খলিফা কাদির বিল্লাহ সুলতান মাহমুদের উপর ভারতে ইসলাম প্রচারের দায়িত্বার ন্যস্ত করেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই মাহমুদ বার বার ভারতে অভিযান চালান এবং এ উপমহাদেশে ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। তাঁদের যুক্তি হল, হিন্দুদের সুবিখ্যাত নগরকোট মন্দিরসহ অসংখ্য মন্দির তাঁর হস্তে বিদ্ধস্ত হয়। কতিপয় রাজাসহ ভারতের বহু সহস্র হিন্দুকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা উপরে উল্লিখিত মতকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ—

সুলতান মাহমুদ ধর্ম প্রচারক ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত বিজেতা। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও তিনি অন্যের উপর কখনও জোর করে তাঁর ধর্মসত্ত্ব চাপিয়ে দেন নি। তিনি একটি বিরাট হিন্দু সৈন্যদল প্রোত্সাহন করতেন। এই হিন্দু সৈন্যরা মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে যুদ্ধ করত। যদি সুলতান মাহমুদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য থাকত তাহলে স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে অন্তর্ধারণ হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হত না। ধর্ম প্রচারের জন্য রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন। সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলোর পিছনে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করার কোনো উদ্দেশ্যেই নিহিত ছিল না। তাহাড়া সুলতান মাহমুদ তিনি ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহিষ্ণু। গজনিতে তিনি হিন্দুদের বসবাসের জন্য একটি পৃথক কলেনী স্থাপন করেন এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও স্থানীয় সাহিত্য বিকাশের জন্য তথ্য একটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। তাই ধর্মীয় উদ্দেশ্য তাঁর ভারত অভিযানের পিছনে ছিল না।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য :

সুলতান মাহামুদ মধ্য-এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁকে স্বীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু অংশ এবং পাঞ্জাবের অন্তর্ভূক্তি অপরিহার্য ছিল। ঐসব অঞ্চলে অধিকার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতোপূর্বে তাঁর পিতা সবুক্তগীন ও জয়পালের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়। পিতা কর্তৃক সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধান না হওয়ায় সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাব ও মুলতানকে স্বীয় সাম্রাজ্যভূক্ত করে শক্তিশালী গজনি সাম্রাজ্য গঠন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর এ ব্যবস্থা বানাচাল করতে যে সব হিন্দু রাজা স্ক্রিয় ও তৎপর ছিলেন তাঁদেরকে এবং সম্বিধির শর্তভঙ্গকারী, বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুপক্ষকে সাহায্যদানকারী শাসকগণকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযান পরিচালনা করেন।

অর্থনৈতিক উচ্চেশ্য :

ভারতবর্ষ ছিল ধনসম্পদে সমৃদ্ধ একটি বিরল দেশ। গজনির শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, একটি বিরাট সেনাবাহিনী পোষণ ও তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করা এবং গজনিকে সমগ্র বিশ্বে একটি সমৃদ্ধশালী ও সুসজ্জিত নগরীতে পরিণত করার জন্য সুলতান মাহমুদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই ভারতবর্ষের অফুরন্ত ধন-সম্পদ তাকে প্রলুক্ষ করে। ভারতবর্ষ থেকে ধনরত্ন আহরণ করেই তাঁর এসব মহাপরিকল্পনা বাস্তবে রূপদান করতে চেয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ অভিযানে উত্তুল্য হন। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষের ন্যূনত্বদেরকে দুর্বল করে রেখেই সুলতান মাহমুদ মধ্য এশিয়াই একটি নির্বিঘ্ন ও নিষ্কান্তক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

সুলতান মাহমুদের প্রধান অভিযানসমূহ

সুলতান মাহমুদ ছিলেন উচ্চাকাঞ্জী ও উদ্যমী। বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহর নিকট হতে সীয় সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি আদায়ের পর তিনি ১০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম অভিযান পরিচালিত করে খায়বার গিরিপথে অবস্থিত ভারতের কতিপয় সীমান্ত নগরী এবং দুর্গ অধিকার করেন।

১. ভারতবর্ষে সুলতান মাহমুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম অভিযান পরিচালিত করে খায়বার গিরিপথে অবস্থিত ভারতের কতিপয় সীমান্ত নগরী এবং দুর্গ অধিকার করেন।
২. ১০০১ খ্রিস্টাব্দে ১০,০০০ সেনাবাহিনী নিয়ে সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। পেশোয়ারের নিকট উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত এবং অনুচরবর্গসহ বন্দী হন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে জয়পাল মুক্তিলাভ করলেও অপমানে ও ক্ষেত্রে পুত্র আনন্দ পালের উপর রাজ্যের শাসনভাব অর্পণ করে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।
৩. সুলতান মাহমুদ ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে ভীরার রাজ্য বিজয় ও ১০০৬ খ্রিস্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্তা আবুল ফাতাহ এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে জয় লাভ করেন।
৪. ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা আনন্দ পালের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। আনন্দপাল তাকে বাধা দেবার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করে অগ্রসর হন। উন্দ নামক স্থানে উভয়ের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মাহমুদ জয়ী হন এবং প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত হয়।

৫. ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কাংডা পাথরের নগর কোট দুর্গ দখল ও ১০১০ খ্রিস্টাব্দে মুলতানের বিদ্রোহী শাসনকর্তা দাউদকে পরাজিত করেন।
৬. ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আনন্দপালের পুত্র তিলোচন পালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাকে পরাজিত করে রাজধানী নন্দনা অধিকার করেন। একই বৎসর সুলতান মাহমুদ থানেশ্বরের বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করে জয়লাভ করেন।
৭. ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ হিন্দুস্থানী সাম্রাজ্যের রাজধানী কনৌজের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে কনৌজের ফটকের সম্মুখে উপনীত হন। কনৌজের প্রতিহারে রাজ্যপাল ভীত হয়ে বিনাশর্তে সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্ফীকার করেন। এতে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে কালিঙ্গের চান্দেলী রাজা গোল্ডার নেতৃত্বে রাজ্যপালকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। সুলতান মাহমুদ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে চান্দেলা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাকে পরাজিত করেন।
৮. ১০২১-২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র ও ১০২৩ খ্রিস্টাব্দে গোল্ডার দুর্গ অধিকার করেন।
৯. সোমনাথ বিজয় সুলতান মাহমুদের সাথ্যের বাইরে বলে পুরোহিতগণ আচ্ছাদন করলে সুলতান মাহমুদ এক বিরাট ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে দুই জানুয়ারি সোমনাথের দ্বারে এসে উপনীত হন। হিন্দু রাজন্যবর্গ তাঁর গতিরোধকল্পে সংঘবদ্ধ হয়ে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হন। কিন্তু মুসলিম সেনাবাহিনীর অমিত বিক্রম, সাহস, তেজস্বীতা, যুদ্ধস্পৃষ্ঠা ও রণকৌশলের নিকট হিন্দু সৈন্যগণ পরাজিত হয়। সুলতান মাহমুদ হিন্দুদের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অফুরন্ত-ধন-রত্ন হস্তগত করেন।
১০. সোমনাথ অভিযান হতে প্রত্যাবর্তন কালে মুসলিম সৈন্যগণ জাঠদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল বলে সুলতান মাহমুদ তাদের বিরুদ্ধে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্প্রদশ ও শেষ অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধে জাঠগণ পরাজিত হলে তাদের অধিকাংশকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল

সুলতান মাহমুদ তাঁর বিজয়অভিযানসমূহ দ্বারা উন্নত ভারতীয় রাজ্যগুলোর আর্থিক বুনিয়াদ ধ্বংস করেন এবং অগণিত ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য-বৈভূত লাভ করেন। তা দ্বারা স্বীয় গজনি সাম্রাজ্যকে স্মর্মস্থিতীল ও শৌরবান্বিত করে গড়ে তোলেন। সুলতানের যুদ্ধ ও শান্তিকালীন মহাপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ভারতের সম্পদ তাঁকে সহায়তা দান করায় তিনি দ্রুত সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

সুলতান মাহমুদের আক্রমনের ফলে মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে ঘোচায় অনেক পীর-দরবেশও ভারতে আসেন। এবং ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। ফলে ক্রমান্বয়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

সুলতান মাহমুদের অভিযানের ফলে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান এবং সমরোতা হওয়ার পথ সুগম হয় এবং উভয়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়। তিনি শুধুমাত্র পাঞ্চাবেই স্থায়ীভাবে স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখান হতে হিন্দু রাজাদের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা লক্ষ্য করার সুযোগ লাভ করে। এটা পরবর্তীকালে মুসলমানগণ কর্তৃক ভারত বিজয়ের পথকে সহজসাধ্য করে তোলে।

সুলতান মাহমুদের সাফল্যের কারণ

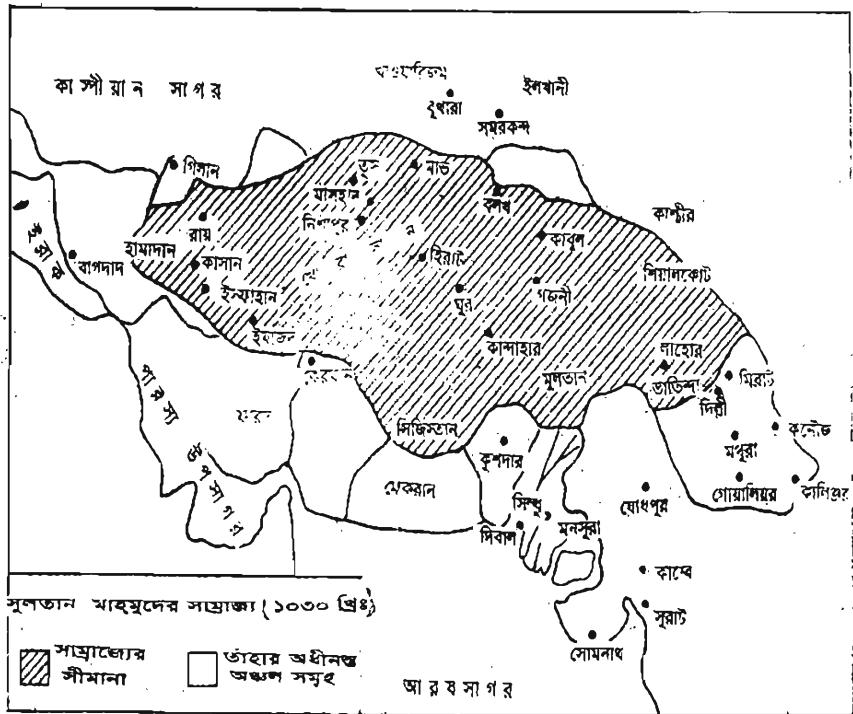
সুলতান মাহমুদ একজন সুদক্ষ সেনা নায়ক ও প্রখ্যাত বিজেতা ছিলেন। সমর কুশলতা ও সামরিক মেধায় সেই যুগে কোনো ন্যূনত্ব তার সমকক্ষ ছিলেন না। কঠোর অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার দ্বারা তিনি একটি সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। তাই হিন্দু বাহিনী মুসলমানদের অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অনেক্য অসাম্য ও অরাজকতা তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দেয়। যা মাহমুদের বিজয়ে সহায়ক হয়েছিল। তাছাড়া সকল যুদ্ধ সুলতান মাহমুদের স্বয়ং উপস্থিতি মুসলিম সৈন্যদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংঘার করত। ফলে তাদের বিজয়লাভ সহজতর হয়। একদিকে জেহাদের মর্মবাণী ও ধর্মীয় পুন্যলাভের প্রেরণা এবং অপরদিকে যুদ্ধলক্ষ দ্রব্য-সামগ্রী লাভের আকাঞ্চা মুসলিম সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে তুচ্ছ জ্ঞান করে নেতৃত্ব আদেশ পালনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল এবং শক্তির বিরুদ্ধে অজেয় করে তোলে।

সুলতান মাহমুদের চরিত্র

সুলতান মাহমুদ সাহসী, ধৈর্যশীল ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার চরিত্রে উচ্চাভিলাষ ও আত্মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শাসক হিসাবে তিনি প্রজাদের প্রতি দয়ালু ও সুবিচেক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রগাঢ় ধর্মনিষ্ঠ, আজ্ঞাপ্রত্যয়ী, অধ্যবসায়ী, কর্তব্যপরায়ন ও পর ধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। হিন্দুদেরকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে ধর্মকর্ম করার অনুমতি দান করেন এবং বসবাসের জন্য নগরীতে আলাদা এলাকার ব্যবস্থা করেন। মানব সমাজের এই মহান নেতা ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে গজনিতে পরলোক গমন করেন।

সুলতান মাহমুদের উত্তরাধিকারীগণ

সুলতান মাহমুদের যুদ্ধের পর তার দুই পুত্র মাসুদ এবং মুহাম্মদের মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যতী নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে মাসুদ জয়ী হয়ে আতা মুহাম্মদকে অঙ্ককার কারাগারে নিষেপ করেন। মাসুদ ছিলেন উদার ও সাহসী। তবে তিনি সেলজুক ও তুর্কি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নি এবং মার্ভের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। সৈন্যবাহিনী তার অঙ্ক ভাতা মুহাম্মদকে সিংহাসনে বসাল। পরে মুহাম্মদ তার পুত্র আহমেদকে শাসনভার অর্পণ করলে সে মাসুদকে কারাগারে হত্যা করে। এদিকে মাসুদের পুত্র মওদুদ ক্ষেপ্ত হয়ে মুহাম্মদের সমগ্র পরিবারের বিনাস সাধন করেন। নয় বছর রাজত্ব করার পর মওদুদ যুদ্ধে পতিত হলে কয়েকজন দুর্বল শাসক গজনীর সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। কিন্তু তারা কেউই সেলজুকদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নি। এই বংশের শেষ সুলতান ছিলেন খসরু মালিক। তিনি ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘূরীর নিকট পরাজিত হন।



ଚିତ୍ର : ସୁଲତାନ ମାହମୁଦେର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ।

ଗଜନୀ ବନ୍ଦଶେର ପତନେର କାରଣସମୂହ :

ପ୍ରଥମ : ଗଜନି ସଂଶେର ପରବର୍ତୀକାଳେ କୋଣ ଶାସକଙ୍କ ସୁତ୍ର ଶାସନବ୍ୟବଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବତ୍ର ଶାସନ ଓ ଶୃଷ୍ଟିଲାଭ ବଜାୟ ରାଖାର ଉଦ୍ୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ନି । କାହାଏଇ ଜନସମର୍ଥନେର ଅଭାବେ ଗଜନୀ ସଂଶେର ପତନ ଘଟେ ।

ବିଭିନ୍ନତ : ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ହତେ ଆହରିତ ଅଗଣିତ ଧନ-ରତ୍ନ ସୁଲତାନ ଯାହିୟିଦେର ଉତ୍ତରାଧିକାରିଗଣକେ ଆରାମଧିଯ ଓ ବିଳାସୀ କରେ ତୋଳେ । ଫୁଲେ ତାରା ଶ୍ଵର ଆକ୍ରମଣ ହତେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକେ ବର୍କା କରାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାରିଯେ ଫେଲେ ।

তৃতীয়বিন্দু: হত্যা, বড়বন্ধু, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিভিন্ন দলের মধ্যে পরম্পরার স্বার্থ সংঘাত সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দুর্বল করে। ফলে তাদের পতন ঘটে।

ମୁହିଜ୍‌ଡାଲିନ ମୁହାମ୍ମଦ ସୁରୀ ତାଁର ଭାରତ ଅଭିଯାନ : ପ୍ରସ୍ତର ଓ ହିତୀସ ତରାଇନେର ଯୁଦ୍ଧ :

আফগানিস্তানের অন্তর্গত হিরাত ও গজনির মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে ঘুর রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। দশম শতাব্দীতে এটি একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিন্তু ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে ঘুরবাজ মুহাম্মদ বিন সুরকীকে পরাজিত করে সুলতান মাহমুদ ঘুর রাজ্যটি অধিকার করেন। সুলতান মাহমুদের দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারিগণের সুযোগে ঘাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম যিনি ইতিহাসে শিহাবউদ্দিন মুহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত, তিনি ঘুর রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তৃতীয় পর্যায়ে অভিযান পরিচালনা করে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুহম্মদ ঘুরী

মুহম্মদ ঘুরীর আক্রমণকালে উত্তর-ভারতের অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা

মুহম্মদ ঘুরীর আক্রমণকালে ভারতবর্ষের রাজনীতি গভীর অঙ্ককারে নিমজ্জিত ছিল। সমগ্র ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পরস্পর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় সমগ্র ভারতে চরম বিশ্বজ্ঞলা বিরাজ করছিল। দেশের এ পরিস্থিতিতে মুহম্মদ ঘুরী অতিসহজেই ভারত জয় করে এ উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পাঞ্চাব : সমগ্র পাঞ্চাব গজনি সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। খসরু শাহ ওজ বা সেলজুক তুর্কিদের দ্বারা গজনি হতে বিতাড়িত হয়ে পাঞ্চাবে আশ্রয় প্রাপ্ত করলে তাঁর উত্তরাধিকারিয়া পাঞ্চাবে বসতি স্থাপন করেন। লাহোর তাঁদের রাজধানীতে পরিণত হয়। খসরু মালিক ছিলেন গজনি বংশের শেষ সুলতান। মুহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাঁর অযোগ্যতার জন্য গজনি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

মুলতান : কারামতী শিয়া আবুল ফতাহ দাউদকে পরাজিত করে সুলতান মাহমুদ মুলতান জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কারামতীরা এর স্বাধীনতা পুনরায় ফিরে পায়। মুহম্মদ ঘুরী যে সময় ভারত আক্রমণ করেন সে সময় মুলতানে কারামতী শিয়া সম্প্রদায় রাজত্ব করছিল।

সিঙ্গু : সিঙ্গু ছিল মুলতানের দক্ষিণে। সুলতান মাহমুদ সিঙ্গু জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সুমরা নামক স্থানীয় একটি গোত্র যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। কারামতীদের ন্যায় তারাও শিয়া মুসলমান ছিল।

রাজপুত বংশ : উত্তর-ভারতের অবশিষ্ট অংশে কতিপয় শক্তিশালী রাজপুত বংশ শাসন করছিল। এ শক্তিশালী রাজপুত বংশগুলোর মধ্যে দিল্লি ও আজমিরের চৌহান বংশ, কনৌজের গাহচৰাল বা রাঠোর বংশ, মালবের পারামার বংশ, গুজরাটের চালুক্য বা বাঘেলা বংশ, বুদ্দেলখণ্ডের চান্দেলা বংশ, চেন্দীর কলচুরী বংশ এবং বিহার ও বাংলার পাল ও সেন বংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

দিল্লি ও আজমির : দিল্লি ও আজমিরের চৌহান রাজ্য ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এ রাজ্যের বিখ্যাত রাজা ছিলেন পৃথীরাজ রায়। প্রতিবেদী রাজ্যগুলোর সাথে প্রায়ই তাঁর সংঘর্ষ হতো। তিনি মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজপুত রাজাদের নিয়ে একটি মিত্রসংঘ গঠন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

কনৌজ : কনৌজের গাহচৰাল বংশ এ সময় খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গোবিন্দ চাঁদ ছিলেন এ বংশের একজন খ্যাতনামা শাসক। তাঁর সময়ে কনৌজের রাজ্য সীমানা পাটনা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। গোবিন্দ চাঁদের পর বিজয় চাঁদ রাজা হন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করেন। জয়চাঁদ ছিলেন এ বংশের শেষ রাজা। তিনিও পরে মুহম্মদ ঘুরীর হস্তে পরাজয় বরণ করেন।

গুজরাট : মুহম্মদ ঘুরী যখন ভারতে অভিযান চালান তখন দ্বিতীয় তীম গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন।

বিহার ও বাংলা ৪ পূর্ব-ভারতে দুটি বিখ্যাত রাজপুত রাজ্য ছিল, একটি হল পাল এবং অপরটি সেন রাজ্য। এক সময় সমগ্র বঙ্গ ও বিহার পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারত হতে সামন্ত সেন বিহার ও বাংলায় এসে পালদের পরাজিত করে সেন বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের সময় লক্ষণ সেন বাংলায় রাজত্ব করছিলেন। গৌড় ছিল তার রাজধানী। মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের অনুমতিক্রমে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা অধিকার করেন।

সামাজিক অবস্থা

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতবর্ষে সামাজিক অনাচার, জাতিভেদ, হিংসা-বিদ্যে, কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। জাতিভেদ হিন্দু সমাজকে হিধাবিভক্তি করে নি, তাদের সামাজিক কাঠামোতে চরম আঘাত হানে। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এ চার শ্রেণি চারটি পৃথক পেশায় নিয়োজিত ছিল এবং তাদের মধ্যে কোনোরূপ ঐক্য ও সংহতি ছিল না, বরং উচ্চ বর্ণের নিপীড়নের ফলে নিম্ন শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হিন্দু সমাজে সামাজিক কুসংস্কার ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমন সামাজিক অবস্থায় মুহাম্মদ ঘুরীর ভারতবর্ষে অভিযান ছিল সময়োপযোগী ও আর্শীবাদস্বরূপ। যার ফলে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা তার জন্য সহজতর হয়েছিল।

মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ও ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন উচ্চভিলাষী সুলতান। তাই গজনীতে স্বীয় ক্ষমতার নিরাপত্তা বিধান করে তিনি ভারতে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তার ভারত অভিযানের পশ্চাতে কয়েকটি কারণ ছিল।

অভিযানের কারণসমূহ :

প্রথমতঃ চির বৈরী সেলজুক এবং গজনি রাজবংশের মধ্যে সংঘর্ষের সুযোগে আফগানের সাইবানী ঘুরী উপজাতীয় দল ক্রমশ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আধিপত্য বিস্তার করে। মুহাম্মদ ঘুরী গজনীতে স্বীয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষ অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মাহমুদের মতো তিনি অভিযানকারী ছিলেন না; কারণ তিনি বিজেতার মর্যাদা লাভ করেন। রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ সুলতান খসরু মালিক গজনি পরিত্যাগ করে লাহোর বসবাস করতে থাকেন এবং ফলে গজনী রাজ্য সংকুচিত হয়ে পাঞ্চাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। গজনিতে রাজবংশের উপস্থিতিতে ঘুরী বংশের নিরাপত্তা এবং প্রভৃতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে- এ কথা মনে করে মুহাম্মদ ঘুরী খসরু মালিকের বিরুদ্ধে অভিযান করেন।

তৃতীয়তঃ গজনি রাজ্যের মতো ঘুরী সুলতানগণ মধ্য-এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারে শুধু ব্যর্থই হন নি, বরং খাওয়ারিজম শাহের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধিতে শক্তিত হয়ে উঠেন। জ্যেষ্ঠ আতা গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদ রাজধানী ঘুরে সুদৃঢ়রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে উত্তরে খাওয়ারিজম শাহের সঙ্গে সংঘর্ষে লিঙ্গ হয়ে পড়েন। অপরাদিকে তাঁর প্রতিনিধি কনিষ্ঠা আতা মুইজউদ্দীন মুহাম্মদ গজনিকে প্রধান কেন্দ্রীকৃত ব্যবহার করে সোজা পূর্বদিকে গোমাল গিরিপথের মধ্য দিয়ে ভারতে অভিযান করে রাজ্য বিস্তার করেন।

মুহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানসমূহ

মুলতান ও উচ দখল : ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুলতানের বিরুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরীর প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়। এ রাজ্যটি তখন কারামতি শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। মুহম্মদ ঘুরী মুলতান অধিকার করে সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি সিঙ্গুর উচের দিকে অগ্রসর হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা দখল করে সীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

গুজরাট অভিযানে বিপর্যয় : ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ারা আক্রমণ করেন। কিন্তু আনহিলওয়ারা রাজা দ্বিতীয় ভৈম কর্তৃক তিনি পরাজিত হন।

পাঞ্চাব বিজয় : সিঙ্গু ও মুলতানের মধ্যে দিয়ে ভারত জয় করা অসম্ভব মনে করে তিনি পাঞ্চাব জয় করার সংকল্প করলেন। পাঞ্চাব ছিল ভারতের প্রবেশদ্বাৰ। ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী পেশওয়ার অধিকার করেন। অতঃপর তিনি পাঞ্চাবে অভিযান পরিচালনা করে ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে শিয়ালকোট অধিকার করেন। ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি গজনী বংশের শেষ সুলতান খসরু মালিককে পরাজিত ও বন্দি করলেন। এভাবে পাঞ্চাব দখল করে তিনি গজনী বংশের শাসনের অবসান ঘটান। পাঞ্চাব জয়ের ফলে মুহম্মদ ঘুরীর ভারত জয় আরো সহজতর হয়।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ (১১৯১ খ্রিঃ) : গজনি বংশের পতনের পর মুহম্মদ ঘুরী রাজপুতদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। মুহম্মদ ঘুরীর দ্রুত সাফল্যে দিল্লি ও আজমিরের চৌহানরাজ পৃথীরাজ অত্যন্ত শক্তিত হয়ে পড়েন। তিনি একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে ঘুরু রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বরের প্রায় ১৪ মাইল দূরে তরাইন নামক স্থানে উভয় বাহিনী মিলিত হল। বহু রাজপুত বীর তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। পৃথীরাজের বাহিনীতে ২০ হাজার অশ্বারোহী, ৩ হাজার রণহস্তী ও অসংখ্য পদাতিক বাহিনী ছিল। পৃথীরাজের ভ্রাতা ও সেনাধ্যক্ষ গোবিন্দ রায় মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে পর্যন্ত করেন। যুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরী তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হন এবং মুসলমানগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। এই পরাজয় ঘুরীকে ভারত জয়ে আরো ক্ষীণ করে তোলে।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, (১১৯২ খ্রিঃ) : ভারতবর্ষের রাজ্য বিস্তারের আশায় এবং পরাজয়ের প্লান মুছবার উদ্দেশ্যে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী ১,২০০,০০০ সুসজ্জিত ও সুশক্ষিত অশ্বারোহীসহ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তরাইনের রণক্ষেত্রে পুনরায় শিবির স্থাপন করেন। পূর্বের মতো এবারেও পৃথীরাজ রাজপুত রাজাদের সম্মিলিত ৩,০০,০০০ সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে দান করেন। তুমুল ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতে পৃথীরাজের ভ্রাতা গোবিন্দ রায় নিহত হন। পৃথীরাজ পলায়নকালে ধৃত হলে তাঁকে হত্যা করা হয়। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটলেও সুলতান মুহম্মদ ঘুরী অসীম বীরত্ব, উন্নতমানের যুদ্ধ-কৌশল এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার দ্বারা রাজপুত কনপেডারেসীকে নির্মূল করে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের শুরুত্ব : মুসলিম ভারতের ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তরাইনের বিজয় ভারতবর্ষে মুসলিম রাজনৈতিক আধিপত্যের ভিত্তি স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত, রাজপুত সামরিক শক্তির অজেয়তাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে। তৃতীয়ত, একটি মুসলিম বাহিনীর একতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, মিভাইকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, নচেৎ পরবর্তী পর্যায়ে ঘুরীর নির্দেশে হানসী, সামানা, মিরাট, কোইল ও দিল্লি থেকে সুদূর বাংলায় সাফল্যজনক সমরাভিযান করা সম্ভবপর হতো না। যুদ্ধ জয়ের ফলে উন্নত ভারত ঘূরু রাজ্যের অর্জন্তুক হয়।

কুতুবউদ্দীন আইবেক কর্তৃক মিরাট, কোইল ও দিল্লি অধিকার : সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে মুহম্মদ ঘুরী তাঁর বিশ্বাস অনুচর কুতুবউদ্দীন আইবেকের উপর অধিকৃত এলাকাসমূহের শাসনভাব ন্যস্ত করে গজনি প্রত্যাবর্তন করলেন। কুতুবউদ্দীন আইবেক ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ সেনানায়ক।

প্রভুর বিজিত সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান করে তিনি এর সীমানা আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি মিরাট, কোইল (আধুনিক আলীগড়) ও দিল্লি জয় করেন (১১৯৩-৯৪)। তাঁর নব অধিকৃত এলাকা হতে লাহোরে অনেক দূরে অবস্থিত থাকায় তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে দিল্লিকে নির্বাচিত করেন।

কনৌজের জয়চান্দের বিরুদ্ধে অভিযান : পরবর্তীতে পৃথিবীরাজের প্রধান শত্রু এবং উত্তর-ভারতের প্রভাবশালী রাজা কনৌজের জয়চান্দকে দমনের জন্য ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘূরী পুনরায় ভারতে আগমন করেন। প্রভুর সাহায্যের জন্য কুতুবউদ্দীন তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। চান্দওয়ারের যুদ্ধক্ষেত্রে এ মিলিত শক্তির হাতে রাজা জয়চান্দ পরাজিত হন। অতঃপর মুসলিম সৈন্যবাহিনী আরও অহসর হয়ে বারানসী দখল করে।

গোয়ালিয়র ও আনহিলওয়ারা বিজয় : অপরদিকে মুহম্মদ ঘূরী গজনি ফিরে গেলেও তাঁর সুযোগ্য প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন আইবেক বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় ভীমদেবকে পরাজিত করে গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ারা অধিকার করেন।

কালিঞ্জর জয় : কুতুবউদ্দীন আইবেক ১২০২ খ্রিস্টাব্দে বুদ্দেলখণ্ডের চান্দেল্যরাজ পরমার্দী দেবের রাজধানী কালিঞ্জর আক্রমণ করেন। মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম দিকে মারাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুললেও চান্দেল্যরাজ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। ফলে কালিঞ্জর দূর্গ মুসলমানদের হস্তগত হল। এর পর মাহোবা এবং কালপিও মুসলমানদের পদান্ত হল। এভাবে কুতুবউদ্দীন একের পর এক উত্তর-ভারতের সকল শুরুত্পূর্ণ রাজ্য মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কুতুবউদ্দীন আইবেক যখন উত্তর-ভারত তাঁর প্রভুর আয়ত্নায়ীমে আনতে চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সে সময়ে ইথিতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী পূর্বভারতের বিহার ও বাংলা অধিকার করে মুসলমানদের রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ করেন।

মুহম্মদ ঘূরীর মৃত্যু : ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ঘূরী প্রকৃত অর্থে দিল্লি, গজনি ও ঘূর রাজ্যের সুলতানের মর্যাদা লাভ করলেন। অপরদিকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে খাওয়ারিজম শাহের নিকট পরাজিত হলে তাঁর সামরিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; গজনী এবং মুলতানে তাঁর প্রবেশে বিন্ন সৃষ্টি করা হয়; ইত্যবসরে পাঞ্চাবে দুর্ধর্ষ খোকার উপজাতি অরাজকতা শুরু করে। কুতুবউদ্দীনের সহায়তায় মুহম্মদ ঘূরী খোকারদের বিদ্রোহ দমন করেন কিন্তু লাহোর হতে গজনি প্রত্যাবর্তানের পর খোকার বংশীয় একজন আততায়ীর হাতে তিনি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

মুহম্মদ ঘূরীর চরিত্র

সমসাময়িক শাসকদের মধ্যে সুলতান মুহম্মদ ঘূরী ছিলেন নিঃসন্দেহে অনুপম চরিত্রের অধিকারী একজন মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শাসক। তাঁর দুরদশী রাগনৈপুন্য, নির্ভীকতা, ধার্যিকতা, বিদ্যোৎসাহীতা ও প্রজাবাঞ্ছল্যের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফিরিশতা তাঁকে একজন খোদাভীরু, সত্যনিষ্ঠা ও প্রজারঞ্জক শাসক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি পরধর্মে ছিলেন সহিষ্ণু এবং ধর্মীয় গোড়ামি তার মধ্যে ছিল না। হিন্দুদের প্রতি তিনি উদারতার দ্রষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর সেনাদলে অনেক হিন্দু ছিল। তিনি জ্যেষ্ঠ আতার প্রতি যে সততা ও বিশৃঙ্খলা প্রদর্শন করেছেন তা তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। তিনি বিজাতীদের প্রতি কঠোর ছিলেন। বিজিত এলাকায় লুঁঠনের দিকেও তার আগ্রহ ছিলো না। তিনি ছিলেন দয়ালু, দাতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অনুচরদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল পিতৃবৎ। ক্ষমা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ।

মুহম্মদ ঘূরীর সাফল্যের কারণ

ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ ঘূরী সাফল্য লাভ করেন। তাঁর সামরিক বিজয়ের মূলে প্রধান কারণসমূহ ছিল-

প্রথমত : সমর কুশলী, অসীম বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদশী মুহম্মদ ঘূরী পর্বত সঙ্কল ঘূরী রাজ্যের দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের নিয়ে একটি সংঘবন্ধ সামরিক বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীতে কোনো বিভেদ না থাকায় তারা একটি শক্তিশালী সামরিক শক্তিতে পরিনত হয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত : তুলনামূলকভাবে হিন্দু বাহিনী সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে মুসলিম বাহিনী অপেক্ষা দুর্বল ছিল। মুহম্মদ ঘূরীর নেতৃত্বে সামরিক বিজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল উন্নতমানের যুদ্ধ-কৌশল, সৈন্য পরিচালনায় অগুর্ব দক্ষতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও নেতৃত্বের প্রতি সৈন্যদের দৃঢ় বিশ্বাস।

তৃতীয়ত : মুহম্মদ ঘূরীর ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনী ও উন্নতমানের অন্তর্শন্ত্র থাকায় পৃথীরাজের দুর্ধর্ষ বাহিনীকে পরামুক্ত করা সম্ভবপর হয়।

ঘূরী বংশের পতন : সুলতান মুহম্মদ ঘূরী ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন নিঃস্বাতান অবস্থায়। এ কারণে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিল না এবং তিনি কাউকে মনোনীত ও করেন নি। এর ফলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ভাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ। তিনি অযোগ্য ও দুর্বল শাসক ছিলেন। এর ফলে তাঁর পক্ষে বিশাল ঘূরী সাম্রাজ্য, যা ভারতবর্ষে বিস্তারিত ছিল, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্তরাজ্যের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন; যেমন- গজনিতে তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ, সিঙ্গুতে নাসিরউদ্দিন কুবাচা এবং ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের কুতুবউদ্দীন আইবেক। এর ফলে শক্তিশালী অমাত্যদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই সুযোগে খাওয়ারিজমের শাহ ঘূর সাম্রাজ্য দখল করলে ঘূরী বংশের পতন হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ কুতুবউদ্দীন আইবেক (১২০৬-১০ খ্রিষ্টাব্দ)

ক্রীতদাস হিসেবে কুতুবউদ্দীনকে অতি বাল্যকালে নিশাপুরের কাজি ফখরউদ্দীন আবদুল আজীজ কুফী ক্রয় করেন এবং তার সন্তানদের সাথে প্রশাসনিক এবং সামরিক শিক্ষা দান করেন। পিতার মৃত্যুর পর কাজির সন্তানেরা তাঁকে একজন বণিকের নিকট বিক্রয় করে এবং কুতুবউদ্দীন গজনিতে আন্তী হলে মুইজউদ্দীন তাঁকে ক্রয় করেন। স্থীয় মেধা এবং অধ্যবসায়ের বলে তিনি অতি অল্প সময়ে মুইজউদ্দীন মুহম্মদ ঘূরীর অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অবিষ্ঠিত হন। ক্রমে তিনি আমীর আকুব বা আন্তাবলের প্রধান নিযুক্ত হন। মুহম্মদ ঘূরীর ভারত অভিযানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এর পুরস্কার স্বরূপ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর সুলতান গজনীতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি ভারতের অধিকৃত অঞ্চলের দায়িত্বার লাভ করেন। ঘূরীর প্রতিনিধি ও শাসনকর্তা হিসাবে কুতুবউদ্দীন প্রথমত বিজিত অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন দ্বারা স্থায়ী প্রভৃতু কায়েম এবং বিজয়কে সুদূরপ্রসারিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখেন। মুহম্মদ ঘূরীর অর্পিত শুরুদায়িত্ব কুতুবউদ্দীন বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেন। ১১৯৩-৯৪ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবউদ্দীন মিরাট, হানসী, দিল্লি, রণথম্ভোর, কোইল অধিকার করেন এবং ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘূরীর সাথে যুগ্ম অভিযানে কনোজ দখল করেন। ১১৯৬-১২০২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বারানসী, কালিঞ্জর, গুজরাট, কনোজ, মাহোবা প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যা সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে।

এভাবে উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি প্রভুর বিশ্বাসের মর্যাদা বিশেষভাবে রক্ষা করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে মুহম্মদ ঘূরী তাঁকে ভারতের বিজিত অঞ্চলের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে “মালিক” খেতাবে ভূষিত করেন।

দিল্লির স্বাধীন সুলতান হিসেবে কুতুবউদ্দীন আইবেক

মুহম্মদ ঘূরী ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করলে তদীয় ভাতুশ্পুত্র গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ ঘূরীর সিংহাসন লাভ করেন। তিনি কুতুবউদ্দীন আইবেকের সুলতান উপাধি প্রদান এবং দাসত্বমোচন লিপি (খাত-ই-আজাদী) সহ রাষ্ট্রীয় চাদোয়া ও অন্যান্য রাজকীয় বিশিষ্ট চিহ্নসমূহ প্রদান করেন। এভাবে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কুতুবউদ্দীনই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা শাসক।

কুতুবউদ্দীন আইবেকের স্বল্পকালীন রাজত্বকাল মুহাম্মদ ঘূরীর বিশিষ্ট অনুচর তাজউদ্দীন ইয়ালদুজের মোকাবিলা এবং খাওয়ারিজমের শাহের মত শক্তিশালী বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় অতিবাহিত হয়। গজনির অধিপতি তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ সর্পগরায়ণ হয়ে কুতুবউদ্দীনের শাসনাধীন ভারতের সমগ্র বিজিত অঞ্চলের কর্তৃত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি নিলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় কুতুবউদ্দীন এক যুদ্ধে তাজউদ্দীন ইয়ালদুজকে পরাজিত করে গজনি অধিকার করে নেন। কিন্তু তার গজনি অধিকার স্থায়ী হয় নি। কারণ, সৈনিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গজনির অধিবাসীরা তাজউদ্দীনকে গজনীর আধিপত্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে তিনি তাদের সহায়তায় কুতুবউদ্দীনকে গজনি ত্যাগে বাধ্য করেন। ফলে গজনির মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে ভারত উপমহাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ভারত উপমহাদেশে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলিম রাজ্য গড়ে উঠে। অবশ্য বাংলার শাসনকর্তা বখতিয়ার খলজী এবং মুলতান ও উচের অধিপতি নাসিরউদ্দীন কুবাচা ইতোপূর্বে কুতুবউদ্দীন আইবেকের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেছিলেন। এমতাবস্থায় কুতুবউদ্দীন নিজেকে দিল্লির সুলতান হিসেবে ঘোষণা করলে স্বাধীন সালতানাতের সূচনা হয়।

কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত তিনি তার শ্রমলক্ষ ফল বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে লাহোরে চৌগান (চৌগান আধুনিক পোলো খেলার মতো এক জাতীয় খেলা)। মধ্যযুগের গোড়ারদিকে ইহা ভারত ও পারস্য খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল। খেলার সময় অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে তিনি শুরুতরভাবে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। লাহোরে আনারকলির নিকটে এই মহান বীরকে সমাহিত করা হয়।

বাংলায় অভিযান ও লক্ষণ সেনের প্রায়ান : ইথিতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বিহারকে কেন্দ্রস্থল হিসাবে ব্যবহার করে পূর্বদিকে সেনরাজ্যে আক্রমণ করেন। তিনি ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় হিন্দু সেন বংশের সর্বশেষ নৃপতি লক্ষণ সেনের রাজধানী নদীয়ায় আগমন করেন। কথিত আছে যে, অশ্ব বিক্রেতার ছন্দবেশে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে তিনি আকস্মিকভাবে নদীয়া আক্রমণ করে রাজপ্রাসাদের রক্ষাদের হত্যা করেন এবং মুসলিম সেনাপতির আগমনে মধ্যাহ্নভোজে ব্যক্ত রাজা প্রসাদের পশ্চাত দিকের দরজা দিয়ে প্রাণভয়ে নদীপথে বর্তমান ঢাকার দিকে বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইথিতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী একটি বিশাল সেনা বাহিনীর অধিভাগে ছিলেন এবং মূল সৈন্যদের আগমনের পূর্বেই তিনি কতিপয় অশ্বারোহীর সাহায্যে দুর্বল রাজাকে বিতাড়িত করে বিনা যুদ্ধে নদীয়া জয় করেন। বলা বাহ্যিক বিহার এবং বাংলা জয় কুতুবউদ্দীনের নির্দেশেই সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে তিনি উত্তর দিকে অভিযান পরিচালনা করে লক্ষণাবতী অথবা গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন। বিজয়োন্নাদে বখতিয়ার খলজী গৌড় থেকে দেবকোট এবং সেখান থেকে তিব্বতে অভিযান করেন। বিশৃঙ্খল দশ হাজার সৈন্যসহ তার এ অভিযান ব্যর্থ হয় এবং প্রত্যাবর্তনকালে অসংখ্য সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দেবকোটে আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর সেনানায়কত্বে বাংলা এবং বিহার ঘূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পাল ও সেন বংশের অবসানে ভারতবর্ষের পূর্বাধারে সর্বপ্রথম মুসলিম রাজনৈতিক প্রাধান্য কার্যম হয়। যার ফলে দীর্ঘকাল এ অঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য বিরাজমান ছিল।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

- ১। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ যখন স্পেন বিজয় করেন তখন স্পেনের সমাজ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সমাজ মূলত শাসক ও শাসিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। শাসক শ্রেণির মধ্যে ছিল রাজা, অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণির যাজক গোষ্ঠী এবং শোষিত শ্রেণির মধ্যে ছিল বর্গাদার, ভূমিদাস, জীবিতদাস ও ইহুদীগণ। শাসক শ্রেণিকে কোন কর দিতে হতো না কিন্তু শাসিত শ্রেণি করতারে জর্জরিত ছিল। উপরন্তু নিম্নবিভিন্নের যাজক শ্রেণি উচ্চবিভিন্নের যাজক শ্রেণি দ্বারা নিগৃহীত হতো। স্পেনের এই সামাজিক বৈষম্য মুসলিমানদের স্পেন বিজয়ে উৎসাহিত করেছিল এবং এই বিজয় স্পেনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সুরূরপ্তারী ফল রেখেছিল।
- ক. সিঙ্গু প্রদেশ বর্তমান কোনু দেশে অবস্থিত?
 খ. ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভারতবর্ষ নামকরণ সম্পর্কে লিখ।
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্পেনীয়দের সাথে প্রাক মুসলিম ভারতের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য বর্ণনা কর।
 ঘ. তুমি কি মনে কর, মুসলিম বিজয়ের ফলে স্পেনের ন্যায় তৎকালীন ভারতেও কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।
- ২। সপ্তদশবর্ষী সেনাপতি ইয়াছীন দুর্বার গতিতে মধ্যপুর রাজ্যে অভিযান চালিয়ে রাজা বিজয় সিংহকে পরাজিত করে তার রাজধানী দখল করে নেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই রাজার মৃত্যু হয়। এরপর সেনাপতি ইয়াছীন আরও কিছু নতুন নতুন অঞ্চল দখল করে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- ক. মুসলিমানরা সিঙ্গু বিজয় করে কত খ্রিস্টাদে?
 খ. হাজাজ বিন ইউসুফ কেন সিঙ্গু অভিযান করেছিলেন তার প্রধান কারণটি উল্লেখ কর।
 গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত সেনাপতির সঙ্গে কোন মুসলিম সেনাপতির কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ইতিহাসের আলোকে উক্ত মুসলিম সেনাপতির কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর।
- ৩। চীনের এক প্রতাপশালী রাজা তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের দুর্বলতার সুযোগে একের পর এক রাজাকে পরাজিত করে বিজিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অর্থ স্বীয় রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে খরচ করেন। কিন্তু অনেক রাজ্য জয় করলেও তিনি একটি ছাড়া আর কোন রাজ্যকেই নিজ রাজ্যভুক্ত করেননি।
- ক. গজনবী বৎশ প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিস্টাদে?
 খ. সোমনাথ মন্দিরের উপর চীকা লিখ।
 গ. উদ্দীপকের রাজার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসের কোন সুলতানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ইতিহাসের আলোকে উক্ত সুলতানের যুদ্ধাভিযানসমূহের উদ্দেশ্য কি ছিল? ব্যাখ্যা কর।
- ৪। আফ্রিকা অঞ্চলের একজন রাজা তার সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করার জন্য এবং সেখানে নিজ ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু প্রথমবার সেই রাজ্যগুলোর সম্মিলিত বাহিনীকে তিনি পরাজিত করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু পরের বছরই তিনি তাদেরকে পরাজিত করে সেখানে নিজ ধর্ম ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।
- ক. বাংলায় সেন বৎশের শেষ রাজা কে ছিলেন?
 খ. ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর সহজ বঙ্গ জয়ের কারণটি ব্যাখ্যা কর।

- গ. উদ্বিগ্নকে উন্নিখিত রাজাৰ সঙ্গে ইসলামেৰ ইতিহাসেৰ ঘূৰী বংশেৰ একজন শাসকেৰ কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যেৰ মিল খুজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কৰ। (যুদ্ধ জয়েৰ অদম্য আগ্রহ)
- ঘ. ইতিহাসেৰ আলোকে দ্বিতীয় যুদ্ধেৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আচীন কালে উভয় ভারতীয় রাজ্য হিসেবে পরিচিত-

ক) সিঙ্গু	খ) মুলতান
গ) কাশ্মীর	ঘ) কৌনজ
২. আচীন হিন্দু সমাজে এক্য ও সংহতিৰ পথে প্রধানত আদ্বাত হাবে-

ক) সাম্প্রদায়িকতা	খ) জাতিভেদ পথা
গ) ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা	ঘ) সতীদাহ পথা

নিচেৰ অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩-৫ নং প্রশ্নেৰ উভয় দাও :

বহু পূর্ব থেকেই ভাৱেৰ সঙ্গে আৱৰ বণিকদেৱ একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। সে সময় আৱৰ বণিকদেৱ সঙ্গে ধৰ্মপ্ৰচাৰক গণেৰ আগমন ঘটলেও ইসলামেৰ কাজ ব্যাপকভাৱে পৌছায় সিঙ্গু বিজয়েৰ পৰ। সিঙ্গু বিজয়েৰ ফলাফল রাজনৈতিক ক্ষেত্ৰে ততটা গুৰুত্বপূৰ্ণ না হলেও মুসলিম শিক্ষা সংস্কৃতিৰ বিকাশে এৱ ফলাফল ছিল সুদূৰপুস্তাৱী।

৩. সিঙ্গু অভিযান পৱনৰ্ত্তীকালে ভাৱতে ধৰ্ম প্ৰচাৱে আগত আউলিয়া ছিলেন-
 - i) হ্যৱত শাহজালাল (ৱঃ)
 - ii) হ্যৱত আদম শহীদ (ৱঃ)
 - iii) সৈয়দ মাহমুদ সারওয়াৱ (ৱঃ)

কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-------------------|
| ক) i ও ii | খ) ii এবং iii |
| গ) i এবং iii | ঘ) i , ii এবং iii |
- ৪। মুসলমানদেৱ আগমনেৰ ফলে আচীন কালে ভাৱতে প্রধানত হাস পায়-

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ক) বৰ্ণবাদেৱ কঠোৱাতা | খ) সাম্প্রদায়িকতা |
| গ) বিবাৰ বিবাহ পথা | ঘ) সামাজিক কুসংস্কাৱ |

- ৫। আচীনকালে সিঙ্গু বিজয়েৰ ফলে ভাৱতীয় সমাজে মুসলিম শিক্ষা সংস্কৃতিৰ দ্বাৱা কিভাৱে প্ৰভাৱিত হয়?
- ক) সাম্য ও মৈত্ৰীৰ আদৰ্শে উন্নৰ্হ হয়ে
 - খ) সংস্কৃতিৰ আদান প্ৰদানে
 - গ) বিবাৰ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে
 - ঘ) আৰ্য ও ও সেমিটিক জাতিৰ সংমিশ্ৰণে

৬। নিচেৰ সাৱণীৰ মুসলিম শাসকগণেৰ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন সাৱিটি সঠিক?

ক.	মুহম্মদ ঘূৰী	সোমনাথ মন্দিৰ	গজনি
খ.	সুলতান মাহমুদ	দেবল বন্দৰ	চৌগান
গ.	কুতুব উলীবন আইবেক	আমিৰ আকুব	মালিক
ঘ.	মুয়াবিয়া	দেবল বন্দৰ	উমাইয়া

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলাম

পূর্বকথা : আল্লাহর প্রেরিত বিভিন্ন ধর্মগুল্মের মধ্যে মানব সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে বিক্ষিণ্ণ আলোচনা রয়েছে তা সামঞ্জস্যবিহীন নয়। বিভিন্ন ধর্মগুল্মের মধ্যকার আলোচনায় আমরা জানতে পারি যে মানবজাতির আদি পুরুষ হ্যরত আদম (আ.)। তিনি বেহেশত হতে ভারত উপমহাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত সিংহলে অবতরণ করে এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের দিকে অঞ্চল হয়ে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি আরব উপ-দ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। পবর্তীকালে তাঁরই বংশধরদের দ্বারা পৃথিবীতে মানবজাতি ও বিভিন্ন সভ্যতার বিস্তার ও প্রসার লাভ করে। তাই একথা স্বীকৃত যে হ্যরত আদম (আ.) ছিলেন প্রথম মানুষ ও আল্লাহর মনোনীত প্রথম নবি। মহা গ্রন্থ কুরআনের বর্ণনায় জানা যায়, মানব সভ্যতার প্রতি শরে আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট যুগ ও অঞ্চলের উপযোগী নবি পাঠাতেন। নবিগণ মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ককে ভিত্তি করে বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে তোলেন। এভাবে গঠিত সভ্যতায় দুটি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারা গড়ে উঠে নবিগণের শিক্ষা ও প্রচারের ভিত্তিতে, যাকে আমরা তৌহিদবাদ বলে থাকি। আর দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে নবিগণের শিক্ষা ও প্রচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক ধারা। তাকে কুফর বা শিরকবাদ বলা হয়।

সভ্যতা সৃষ্টির এই ধারায় হাজার বছর ব্যাপী মানবজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে বসতি স্থাপন করে। এক্ষেত্রে লক্ষণিক নবির প্রচেষ্টা ও সাধনায় মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে হাজার হাজার বছরের নানাবিধি কার্যধারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাহাড়া ব্যবসা -বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নানাবিধি উন্নতি সাধিত হয়। এ অবস্থায় সারা বিশ্বে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশে একজন মহান সংগঠকের প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ তায়ালা শেষ নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কে প্রেরণ করে সেই প্রয়োজনও পূর্ণ করে দেন। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) সমগ্র বিশ্ববাসীকে দান করলেন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ জীবন বিধান হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ইসলাম। আরবের তদনীন্তন পৌত্রলিক সাম্রাজ্যে তিনি ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিলেন।

নানা প্রতিকূলতার সাগর পাঢ়ি দিয়ে শেষ নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এগিয়ে চললেন। একেশ্বরবাদের প্রতি তাঁর আহবানে সাড়া দেবার লোকের অভাব হলো না। সর্বপ্রথম তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন তাঁর সহধর্মী হ্যরত খাদীজা (রা.), পিতৃব্যপুত্র কিশোর হ্যরত আলী (রা.), তাঁর গোলাম ও পালকপুত্র হ্যরত জায়েদ (রা.) এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। এভাবে ইসলামি কাফেলার শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে শেষ নবি (স.) এর দাওয়াত গ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকলো দিনের পর দিন।

ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন

মানবতার শেষ নবি (স.) নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মক্কা ও মদিনায় একটি নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করলেন। পরবর্তিতে একদল নিবেদিত ধ্রাণ ইসলাম প্রচারকই সুফি, আউলিয়া ও পৃত চরিত্রের মুসলিম ব্যবসায়ীর আদর্শ ও নিষ্ঠা সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে।

প্রাচীন বাংলার সীমানা

বিশাল অঞ্চলব্যাপী প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ আজকে আমরা বাংলা বলতে যেসব এলাকাকে বুঝি প্রাচীন যুগে এসব এলাকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এসব ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল একাধিক স্বাধীন রাজ্য। আবার বিভিন্ন সময়ে এদের নামের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা গেছে। তবে মোটামুটি ভাবে প্রাচীন বাংলার

সীমানা ছিল উভয়ের হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো-খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণি এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ। এ চতুর্সীমানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকাটিই সমতলভূমি। যার বৃহত্তম অংশই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটির দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন নদ-নদী বাংলার সর্বত্র জালের মতো বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

নামকরণ

বাংলার নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানামত রয়েছে। বাংলার নামকরণ সম্পর্কে আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরী গ্রন্থে বলেছেন : এ দেশের জমিতে উচু উচু আল বেঁধে বন্যার পানি থেকে জমি রক্ষা করত। তাই সময়ের ব্যবধানে ‘আল শব্দটিই দেশের নামের সাথে যুক্ত হলে বঙ্গ +আল= বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হয়।

প্রাক-ইসলামি যুগে বাংলাদেশ

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত সত্য, সুন্দর, সৃষ্টি ও কুসংস্কারযুক্ত জীবনবিধান ও সমাজ ব্যবস্থার শেষ শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান। তাঁর দায়িত্ব ছিল সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে অন্ধকার, অজ্ঞানতা ও পঞ্চকিলতা থেকে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে আসা। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর পরবর্তীকালে তাঁর সুশিক্ষিত সাহাবিবৃন্দ ইসলামের সত্য জীবনবিধান ও সমাজ ব্যবস্থার বাণী নিয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত আরবরা তাদের বাণিজ্য বহর নিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতো। তাছাড়া ঐতিহাসিকগণের মতামতের ভিত্তিতে জানা যায় যে, আরব বশিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে চিনদেশে যাতায়াত করত। কাজেই বলা যায় বাংলার উপকূলে তাঁদের আনাগোনা হতোই।

প্রাক-ইসলামি বাংলার বিভিন্ন অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা :

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় অনার্য অধিবাসীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে আসছিল। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষের দিকে নদৱারাজ বংশের পতনের পর শক্তিশালী মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র বাংলার বিভিন্ন অংশে আর্যদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। তাই দেখা যায় সূর্যোর্ধকালব্যাপী বাংলার বিভিন্ন অংশে আর্য ও হিন্দু শক্তির আধিপত্য বিরাজিত ছিল। এসময় কতিপয় রাজার হিংসা ও দমন নীতির কারণে বাংলার রাজনৈতিক অরাজকতা চরমে পৌছে। সমগ্র বাংলার অনৈক্য ও আত্মকলহ দেখা দেয়। এ অরাজকতার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তৎকালীন বাংলার নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ ভূলে গিয়ে নিজেদের মধ্য থেকে গোপাল নামক একজনকে রাজা নির্বাচন করলে ৭৫০ অন্দে পাল রাজবংশের গোড়াপতন ঘটে। এ বৎশ প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করে।

একাদশ শতকের শেষভাগে পাল রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন বিজয় সেন নামক এক শক্তিশালী সামন্ত রাজা সমগ্র বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করলে সেন বংশের শাসন শুরু হয়। অতঃপর বখতিয়ার খলজীর লক্ষণাবর্তী অধিকারের দ্বারা বাংলার সাধারণ মানুষের উপর যে রাজনৈতিক নির্যাতন চলছিল তার অবসান হয়।

ধর্মীয় অবস্থা :

বাংলার যে সকল ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচলিত ছিল তা হলো:

(ক) আর্যধর্ম : আর্যরা তৌহিদবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। তারা অগ্নি, ইন্দ্র, বারুন, পবন প্রভৃতির পূজা করত। সাধারণত হোম, যজ্ঞ ও বলিদানের মাধ্যমে তাদের এ সব পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন হতো।

(খ) ব্রাহ্মণ্যবাদ : ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা কার্য সম্পাদন করতেন। ধর্ম কর্ম অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের এ প্রাধান্যের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে আর্যধর্ম ব্রাহ্মণধর্মে পরিণিত হয়। এভাবে সমাজে বর্ণশ্রমের উক্তব হয়। সৃষ্ট হয় ধর্মীয় শ্রেণি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের।

(গ) জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম : ধর্মীয় নানাবিধি বিশ্বজগতের উপর ভিত্তি করে ভারতে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উক্তব হয়। জৈনদের কোনো লিখিত ধর্মগ্রন্থ ছিল না। তাদের ধর্মগ্রন্থের একমাত্র উৎস ছিল মহাবীর। এ ধর্মের শিক্ষাসমূহ বিকৃতির বিভিন্ন পর্যায় অভিক্রম করে ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের অংশে পরিণত হয় এবং জৈন ধর্মও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক হলেন গৌতম বৃন্দ। এ ধর্ম জাতিভেদকে প্রশংসন দেয়নি। এ ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে অহিংস, দয়া, দান, সংঘট্য, সংযম, সত্যভাষণ, সৎকার্যসাধন, স্মষ্টাতে আত্মসমর্পন অভূতি মানুষের মুক্তি লাভের প্রধান উপায়। বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসীদের মতে যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলী দিয়ে ধর্মপালন করা যায় না। তবে বিকৃতি ও ষড়যন্ত্রের অসংখ্য আক্রমনে বৌদ্ধ ধর্মের আসল চেহারা অতলে তলিয়ে গেছে। এমনকি বহু সাধনার পর সুন্দরের বাণী নিয়ে যিনি আসলেন সেই গৌতম বৃন্দকেও তাঁর অনুসারীরা ভাস্ত ভাবে উপস্থাপন করেন।

অষ্টম শতকে বাংলায় পালরাজাগণের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ প্রভাব অব্যাহত থাকে। তবে পরবর্তীতে হিন্দু ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম দূর্বল হয়ে পড়ে।

(ঘ) হিন্দু ধর্ম : দ্বাদশ শতকের শেষভাগে সেন বংশের প্রভাবে বাংলায় হিন্দু ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বিষ্ণু ও শিবের পূজা ছাড়াও অন্যান্য দেব দেবীর পূজা তখন বাংলায় প্রসার লাভ করে। এক সময় সেনরাজগণ বাংলায় মূর্তি পূজার প্রচলন করেন। ধর্মের নামে সতীদাহর ন্যায় গর্হিত প্রথার প্রচলন বাংলায় দেখা যায়। হিন্দু যাজকরা জাতিভেদে ও বর্ণশ্রম প্রথাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা

ষষ্ঠ শতক হতে বাংলায় বর্ণবিন্যস্তিক সমাজব্যবস্থা পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা সমাজের শীর্ষে স্থান লাভ করে। ধর্মীয় কার্যাদি যেমন পূজানুষ্ঠান, ব্রতানুশীলন যাগ-যজ্ঞের পৌনঃগুণিক আচরণাদি অভূতি ব্রাহ্মণদের দ্বারাই সম্পন্ন হতো। অপরদিকে নিম্নশ্রেণিতে চলত নিদারন অভাব, দারিদ্র্য, স্কুর্ধা, পীড়ন, শোষণ যন্ত্রনা ও মৃত্যু। বাংলায় বিভিন্ন বর্ণবিন্যস্ত হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর ও ক্ষatriয়, বৈশ্য ও শুদ্র ইত্যাদি বর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ণগতভাবে কিছুই ছিলনা। সকলেই শুন্দের পর্যায়ে গন্য হতো।

তদানীন্তন বাংলায় সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সামাজিক কদাচারের জন্যও অনেকাংশে দায়ী। যেমন- বিবাহ ব্যাপারে নিম্নবর্ণের লোক কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করতে পারত না। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের যেকোনো রমনীকে বিবাহ করতে পারতেন। তবে এ স্ত্রীর মর্যাদা কখনই 'ব্রাহ্মণ'র সমান বলে গণ্য হতনা।

এভাবে বাংলার সমাজ দ্রুত ধ্বন্দ্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একদিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেহগত বিলাস অন্যদিকে সাহিত্য-কাব্য-কবিতার মধ্যেও যৌন কাম-বাসনার মদিরতা বাংলার সমাজকে অস্ত্বসার শূন্য করে দিয়েছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আর্থিক প্রাচুর্য : খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই বাংলা একটি কৃষিপ্রধান দেশ। নদী-বিধৌত পলি মাটির দেশ হ্বার কারণেই প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। এদেশের বেশিরভাগ লোক গ্রামে বাস করত।

তবে কৃষিপ্রধান দেশ হলেও প্রাচীনকাল থেকে বস্ত্রশিল্পের জন্য বাংলা প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। বাংলার সুস্ফুল মসলিন বিদেশের বাজারে সুনাম অর্জন করেছিল। তাছাড়া কাঠশিল্প ও হস্তশিল্পের কাজেও উন্নতি লাভ করেছিল। সে সময় শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও সাধিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের সাথে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

নবুয়ত লাভের পর হয়রত মুহম্মদ (স) ২৩ বছর ধরে সত্য ধর্ম প্রচার করে তোহিদবাদের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গঠন করে যান। তাঁর ওফাতের পর তাঁর সুশক্ষিত সাহাবিগণ, সাহাবিগণের কাছ থেকে সত্যের আলোকে উদ্বীপ্ত তাবেয়ীগণ, তাবেয়ীগণের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত তাবয়-তাবেয়ীগণ এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের বিভিন্ন দল ইসলামের সত্যবাণী নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে।

বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার : ইসলামের আগমণের পূর্ব হতেই আরবরা ব্যবসা-বণিজ্যে পারদর্শী ছিল। ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এক একজন ব্যবসায়ী এক্ষেত্রে ধর্মপ্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এভাবে মুসলিম বণিকদের সাহায্যে প্রথম যুগেই ইসলামের সত্যবাণী প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।

উপরন্ত, আরবদেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপের চাবিকাঠি ছিল আরবদের হাতে। তাছাড়া ভারতের উপকূলীয় বণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল আরবদের।

প্রাচীন কাল থেকে আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব লক্ষণীয়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামী লোকদের মুখের আদল অনেকেই আরবদের মতো মনে করে।

বঙ্গত বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমণের মাধ্যমেই এদেশে ইসলামের সূত্রপাত হয়। তাছাড়া অনেক বণিক এদেশের বহু বিধর্মী রমনীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তাদের সাথে বিবাহ বনানে আবদ্ধ হন। এভাবে বহুস্থানীয় মহিলা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

স্থল পথে ইসলামের আগমন

স্থলপথে প্রধানত সিঙ্গুর পথে ইসলাম সমগ্র হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় খলিফা হয়রত উমর (রা.) এর আমল হতেই বিভিন্ন মুসলিম সেনাপতি বারবার সিঙ্গু সিমাতে অভিযান প্রেরণ করেন। এসব অভিযানে মুসলমানরা কখনো সাফল্য আবার কখনো ব্যর্থতার সম্মুখিন হয়। অবশেষে ৭১২ খ্রিঃ মুহম্মদ ইবনে কাসিম সমগ্র সিঙ্গু জয় করে ভারতে ইসলাম প্রবেশের পথ সুগম করেন। তাই বলা যায় হিজরি প্রথম শতকেই ইসলাম ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়

প্রথম যুগে যে সকল একনিষ্ঠ ইসলাম প্রচারক বাংলায় আগমন করেছিলেন হয়রত শাহ সুলতান বলখী (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি প্রথমে ঢাকা জেলার হরিয়াম নগরে ও পরে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে ইসলাম প্রচার করেন। তবে কথিত আছে সুলতান বলখী সমুদ্র পথে বাংলায় আগমন করে চট্টগ্রামের সন্ধীপে অবতরণ করেন এবং সেখানে অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেন।

বর্তমান নেত্রকোণা জেলার অর্ণগত মদনপুর গ্রামে হয়রত শাহ মোঃ সুলতান রহমীর মাজার রয়েছে। এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পর তিনি নিজের বহু আলোকিক কার্যের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। কথিত আছে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে একবার সাক্ষাত করেছেন সে-ই ইসলাম প্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ কিংবদন্তির নায়ক হয়রত বাবা আদম শহীদ (রা.) বাংলায় আগমনকারী প্রথম যুগের মুজাহিদ

হয়রত মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ (রা) দলবলসহ শাহাজাদপুর এসে ইসলাম প্রচার করেন। হয়রত জালালুদ্দিন তাবরিকী (রা) ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরপরই গোড় অঞ্চলে এসে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। যতদূর জানা যায়, পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পুরৈই হয়রত শাহ নিয়ামতুল্লাহ (রা) ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে হয়রত শাহ মাখদুম (রা) সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয়। প্রাচীন সূফী দরবেশের মধ্যে খ্রিস্টিয় নবম শতকে পারস্যের হয়রত বায়েজীদ বোন্তামী (রা) চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাছাড়া বহুসংখ্যক সুফি ও অলী দরবেশের আগমনের কারণেই সম্ভবত চট্টগ্রামকে ‘বার আউলিয়ার দেশ’ বলা হয়।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়

অয়োদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ হতে চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ অবধি সময়সীমা ছিল বাংলায় ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়। প্রথম পর্যায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়েও সুফি ও দরবেশগণের দ্বারা বাংলায় ইসলাম প্রচার অব্যাহত থাকে। তবে দ্বিতীয় পর্যায় ইসলাম প্রচারে মুসলিম রাজশাস্ত্র সহায়তা প্রদান করে।

দ্বিতীয় পর্যায় ইসলাম প্রচারের আলোচনায় সর্বপ্রথম হয়রত শাহ তুর্কান শেখের কথা বলা হয়। উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলায় তিনি নিজের কেন্দ্র স্থাপন করে ইসলাম প্রচার অব্যাহত রাখেন।

অয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে হয়রত মাওলানা তকীউদ্দীন (রা) বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। হয়রত শায়খ শরফুন্দীন আবু তাওয়ামাহ (রা) সোনারগাঁও আগমন করে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও সাধারণভাবে শিক্ষা সম্প্রসারনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য তিনি সোনারগাঁওয়ে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন।

উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারের সাথে যে মুজাহিদের নাম অঙ্গীভাবে জড়িত তিনি হচ্ছেন হয়রত উলুগ-ই-আজম খাজাজী (রা)। তিনি লাখনৌতির সুলতান রূক্মুন্দীনের অধীনে একজন সেনাপতি ছিলেন। সুলতানের নির্দেশে তিনি বহুস্থানে অভিযান চালিয়ে ইসলামের বিজয় প্রতাক্ত উত্তীর্ণ করেন।

বাংলার দক্ষিণাংশে বিশেষ করে চরিশ পরগনা ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সাথে যে দুজন মহান সাধক মুজাহিদের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত তারা হচ্ছেন সাইয়েদ আবাস আলী মক্কী (রা) ও তাঁর ভগী রওশন আরা (রা)। বর্তমান চরিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমায় মুসলমানদের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা তাঁদের ঐকানিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফল বলা যেতে পারে।

নদী প্রধান এ বাংলাদেশে হয়রত শাহ বদর (রা) বা বদর পীরের প্রভাব যে কতো বেশি তা বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার নদীপথে ভ্রমণ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে আজো বাংলার মাঝি মাল্লারা নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদর পীরের নাম উচ্চারণ করে থাকে।

পূর্ববঙ্গে ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে হয়রত শাহ জালাল মুজাররাদীর (রা) এর অবদান অতুলনীয়। সমকালীন পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছেন; তাঁর হাতে এদেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।

বরেন্দ্র অঞ্চলে যে সব ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন তাদের অধিকাংশই দিনাজপুর জেলায় তাদের কর্মশক্তি নিয়োগ করেন। তাই দিনাজপুর জেলায় বহু আলেম ও দরবেশের আস্তানা ও মাজার দেখা যায়। এ আলেম ও দরবেশদের মধ্যে হয়রত সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন শাহ নেকর্দান (রা) অন্যতম ছিলেন।

চতুর্দশ শতকে বাংলার আর এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হচ্ছেন হয়রত শায়খ আলী সিরাজুন্দীন (রা)। তৎকালীন বাংলার কেন্দ্রীয় গোড় ও পান্তুয়ায় বসে তিনি ইসলাম প্রচার অভিযান চালিয়ে যান।

নোয়াখালী জেলায় ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে সাইয়েদ হাফেজ মাওলানা আহমদ তানুরী (রা) সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। তিনি এ অঞ্চলের প্রথম যুগের ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম।

বাংলায় ইসলাম প্রচারে রাজশক্তির ভূমিকা

ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে বাংলায় মুসলমানদের বিজয় অভিযান শুরু হয়। পরবর্তী দুশো থেকে আড়াইশো বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলা মুসলিম শাসকদের অধীনে চলে আসে। এ সময় মুসলিম বিজেতা ও শাসকগণ বিভিন্ন মুদ্র-বিশ্বে লিপ্ত থাকলেও ইসলাম প্রচারে তাদের ভূমিকা কম ছিল না। ইসলাম প্রচারকদের অভিবিতপূর্ব সাফল্যই বখতিয়ার খলজি কে বজা বিজয়ে উত্তুন্ধ করে। তিনি বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় প্রেরণার উৎস ছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তিনি বহু মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মান করেন। তুঃরিল খান বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য এক সময় তিনি আলেম ও দরবেশগণকে ৫ মণ ঝর্ণ দান করেছিলেন। তাছাড়া তৎকালীন বাংলার শামসুন্দিন ফিরোজ শাহ, ফখরুন্দীন মুবারক শাহ, শামসুন্দিন ইলিয়াস শাহ, সেকান্দার শাহ, গিয়াসুন্দীন আয়ম শাহ প্রমুখ শাসকগনের সাথে ইসলাম প্রচারক আলেম ও দরবেশগণের সু-সম্পর্ক ছিল। যা ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়েছিল।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়

পঞ্চদশ শতক হতে মুসলিম রাজশক্তি বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলে এ সময়ের ইসলাম প্রচারকদের পথ ছিল তুলনামূলকভাবে সুগম। তৃতীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম ছিলেন শাহ নূর কুতুবুল আলম (রা.)। তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসুন্দীন আয়ম শাহের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁর কাছে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য বাংলায় ও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ইসলামী জ্ঞান পিপাসু সমবেত হন। যশোরে ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইসলামের ভাবধারার প্রচলন ও ইসলামি সমাজ বিধি প্রবর্তনে হ্যরত খান জাহান আলীর নাম সর্বাঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি নিজে ইসলাম প্রচার করার সাথে সাথে তাঁর শিয়-শাগারিদগণকেও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সংগঠন ক্ষমতা, জনসেবা ও অক্ত্রিম চরিত্র মাধ্যমে মুদ্র-বিমোহিত হয়ে এতদঞ্চলের অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তাছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে হ্যরত খালাস খান (রা.), উত্তর বক্ষে হ্যরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রা.), বগুড়ায় বাবা আদম (রা.), ঢাকার সোনারগাঁওয়ে শাহ মাল্লাহ (রা.), ঢাকা অঞ্চলে শাহ জালাল (রা.) ও শাহ আলী (রা.), পাবনা অঞ্চলে শাহ আফজাল মাহমুদ (রা.) ও গাজী শায়খ মুহম্মদ বাহাদুর (রা.), রাজশাহী অঞ্চলে শাহ মুয়াজ্জাম দানীশ (রা.), টাঙ্গাইল অঞ্চলে শাহ আদম কাশ্মুরী (রা.) ও শাহ জামাল (রা.), চট্টগ্রাম অঞ্চলে শাহপীর (রা.) ও কাজী মুওয়ারাজিল (রা.) সহ অন্যান্য আরও বহু সুফি সাধক বাংলায় ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রেখে গেছেন।

অনুশীলনী

সূজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

- ১। প্রাচীন মিসরের প্রতিটি গ্রাম ছিল অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেননা নদী বিধৌত পলিমাটির দেশ হ্বার কারণে মিসরে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মিসরীয়রা বহু ধর্ম ও দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিল। তারা নানা ধরনের পূজা-পার্বন পালন করত। মিসরের প্রতিটি গোত্র ভিন্ন ধর্ম পালন করত।
 - ক. পাল বৎশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন।
 - খ. বাংলা নামকরণ কীভাবে হয়েছিল?
 - গ. উদ্দীপকের প্রাচীন মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার যে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাচীন মিসরের ধর্মীয় অবস্থার সাথে প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থার সাদৃশ্য আছে কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত দাও।

- ২। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে এদেশে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা বহু মিশনারী প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে আরব বণিকদের ধর্ম প্রচারের কৌশল ছিল ইসলামের মর্মবাণী প্রচার।

ক. ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে?

খ. স্থলপথে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন কীভাবে হয়েছিল?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের সঙ্গে আরব বণিকদের ইসলাম ধর্ম প্রচারের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে আরব বণিকদের ভূমিকা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

ବ୍ୟାକ ନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ



তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনই সর্বোত্তম আদর্শ

-আল কুরআন

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মান্দাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত